বিবাহিতের
ব্রহ্মচর্য্য
অ
ভি
ক্ষ
ওঁ
বলহীনেন লভ্যঃ
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

ওঁ

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

অষ্টম সংস্করণ

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার, জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে লভিবে ভারত লুপ্তমান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ, শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূল্য ৬·০০ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র
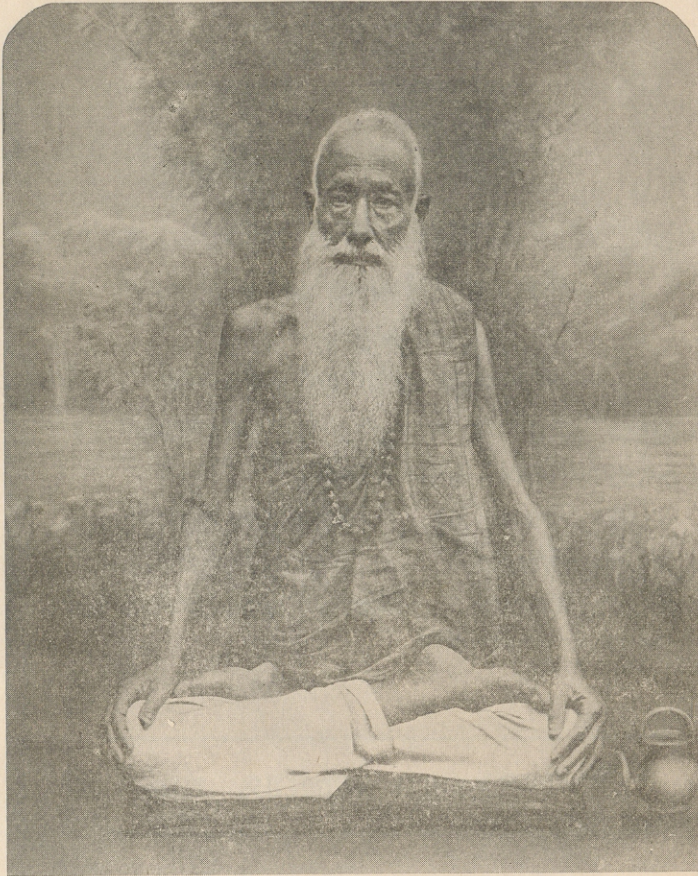
নিত্যধামগত গৃহস্থ যোগী

৺হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

উৎসর্গ

যাঁহার ন্যায় তপস্বী, পূতচরিত, পরহিতব্রত মহাপুরুষের
পুরুষানুক্রমিক সাধনায় পুষ্ট গৌরবময় সুপবিত্র বংশে
জন্মগ্রহণ না করিলে আমি বর্ত্তমান সৌভাগ্যান্বিত
আনন্দময় জীবন লাভ করিতে অসমর্থ হইতাম,
যাঁহার জীবনের অতুলনীয় পরার্থপরতা,
ভগবদ্ভক্তি ও অসাম্প্রদায়িকতা আমার
সমগ্র জীবনের ভিত্তিমুল সুদৃঢ়
করিয়াছে,
পরমহংস শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ যাঁহাকে
"কলিযুগের বশিষ্ঠ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন,
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যাঁহাকে পিতৃতুল্য
জ্ঞান করিতেন,
রাজর্ষি জনকতুল্য ব্রহ্মজ্ঞ ও
ভক্তরাজ প্রহ্লাদতুল্য প্রেমিক,
সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহাত্মা
পরম-পূজনীয় পিতামহদেব
শ্রীযুক্ত হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়
মহাশয়ের শ্রীচরণারবিন্দে ভক্তিভরে
উৎসর্গীকৃত হইল।

ইতি—
প্রণত
গ্রন্থকার

দোলপূর্ণিমা
১৩৩৩

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আকুমার ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারক সন্ন্যাসী। অকালবীর্য্যক্ষয়রূপ যে বংশনাশক মহাপাপ অসৎসংসর্গের দুর্য্যোগে বালক ও কিশোরদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে গোপনে জাতীয় মৃত্যু আহরণ করিতেছে, তাহার সমূল প্রতীকারই স্বামীজীর জীবনের ব্রত। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অকৃতদার যুবকদের মধ্যে সংযম, সদাচার ও সৎসঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠার্থ প্রাণপণ যত্ন পাইয়া আসিতেছেন। ফলে দেশব্যাপী এক বিরাট ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন দিনের পর দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া জাতীয় জীবনকে শোভাদীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। দেশের যুবক সম্প্রদায়ও তাহাদেরই জন্য উৎসর্গীকৃত-জীবন এই পরমবান্ধব সন্ন্যাসী-মহাত্মার বহু-বৎসর-ব্যাপী সুকঠোর শ্রমের ফলে জানিয়াছে যে, অসংযম-দাবানলে দগ্ধপ্রায় জীবনকেও উন্নতির পথে পরিচালনা করা আকাশ-কুসুম নহে ; তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, কামের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম হইয়া যাহারা জীবনকে দুর্ব্বহ ও মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছে, ভগবানের অফুরন্ত কৃপা তাহাদেরও জন্য বর্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যেই সকল যুবক কুমার অবস্থায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের অমৃত-ময়ী উপদেশ-বাণীতে সঞ্জীবিত হইয়া জীবন-গঠনে যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সম্প্রতি গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিবাহিত জীবনকে সংযত ও পবিত্র রাখিতে চেষ্টিত আছেন। ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না যে, শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপাশ্রয় পাইবার পর বাংলা, বিহার ও আসামে অসংখ্য দম্পতি সম্পূর্ণরূপে

পবিত্রতা রক্ষা করিয়া সম্ভোগ-লিপ্সা-হীন মধুময় দাম্পত্য জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদেরই হিতকল্পনায় পূজনীয় গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু যাঁহারা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে জীবন-গঠনের প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারাও বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিবে।

বাংলা ১৩৩৪ সালের চৈত্রমাসে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। পুস্তক ছয় মাসে নিঃশেষিত হয়। দীর্ঘকাল পুস্তক অপ্রকাশিত থাকে। কারণ, তখন মানভূমের অন্তর্গত পুপুন্কী-আশ্রম-নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যস্ততাহেতু গ্রন্থ মুদ্রণে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৩৪০ বাংলা মাঘ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং আট মাস সময়ের মধ্যে পুস্তক নিঃশেষিত হয়। ১৩৪১ এর ফাল্গুন মাসে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক বৎসর মধ্যেই পুস্তক নিঃশেষিত হয় ; কিন্তু আর্থিক কারণে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা যায় নাই। সম্প্রতি এই চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের হস্তে দিতে পারিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিতেছি।

বঙ্গদেশে অত্যধিক সংখ্যক পুস্তকের ভাগ্যলিপিতে পুনঃসংস্কার দেখা যায় না। সুতরাং এই পুস্তকের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই জনপ্রিয়তার কারণ কি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত আলোচনা হইতে প্রকাশ পাইবে। দ্বিতীয় সংস্করণের সমালোচনাকালে এই সম্বন্ধে

(১) ভারতের সর্ব্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **"আনন্দবাজার পত্রিকা"** বলিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান সময়ে যৌন সাহিত্যে নানা গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। কিন্তু প্রায়শঃই সেগুলি সৎসাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাতে অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় নাই—দম্পতি-জীবনকে উন্নত করিয়া নরনারীকে সাধনার পথে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। যৌন-রহস্য অবলম্বন করিয়া লেখক মনুষ্য-জীবনের সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক নিজে ব্রহ্মচারী এবং সাধন-মার্গের পথিক। আধুনিক চিন্তার ধারার সহিত তিনি পরিচিত। তাঁহার মতামতগুলি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত। বিবাহিত-জীবন যথাযথ প্রতিপালিত হইলে বংশের উন্নতি ও জাতীয় কল্যাণ যে সাধিত হইবে—এই গ্রন্থে সেই বাণী তিনি প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

(২) বাংলার শাস্ত্র-বিশ্বাসী হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালিনী পত্রিকা **"দৈনিক বসুমতী"** বলিয়াছেন,—

"ভাবের স্বচ্ছতায়, আলোচনার সরসতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও কল্যাণবুদ্ধির প্রাচুর্য্যে এই গ্রন্থখানা অপূর্ব্ব। অতুলনীয় কৃতিত্ব সহকারে গ্রন্থকার সমগ্র জাতিকে শাস্ত্রসঙ্গত সংযমের পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবাহিত ও বিবাহার্থী নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে এই গ্রন্থে প্রভূত মনোবল ও উৎসাহ লাভ করিবেন। ভোগসর্ব্বস্ব সমাজে সংযমের প্রতিষ্ঠা-সাধনে এই গ্রন্থ প্রচুর সহায়তা দিবে।"

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" শব্দদ্বয় "সোণার পাথর-বাটী" বা "কাঁঠালের আমসত্ত্বে"র ন্যায় একটা নিরর্থক কথা। অনেকের বিশ্বাস, বিবাহিত জীবন শুধু ইন্দ্রিয়-সুখ-লিপ্সার পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, ইহার অপর কোনও মহ র উদ্দেশ্য নাই বা থাকিতে পারে না। পূজনীয় গ্রন্থকার নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, বিবাহ করিয়া সংযম-সাধনা অসম্ভবও নহে, অস্বাভাবিকও নহে এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে অসংযমাসক্ত ইন্দ্রিয়-সুখলুব্ধ কামান্ধ নরনারীরাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংযম-চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারেন, তাহার সহজতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে বর্ণিত বিচার ও উপদেশসমূহ যে কাল্পনিক বাক্য-বিলাস নহে, সত্য সত্যই যে ইহার দ্বারা চেষ্টাবান্ ব্যক্তি বাস্তব জীবনে লাভবান্ হইতে পারেন, তাহারও প্রমাণ আমরা বহু পত্র-লেখকের পত্র হইতে পাইয়াছি। নিম্নে কয়েকখানা পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইতেছে। পত্র-লেখকদের আপত্তি আছে জানিয়া নাম ও ধাম প্রকাশ করা হইল না।

(১) জনৈক পাঠক কাছাড় জিলা হইতে লিখিয়াছেন,—

* এই গ্রন্থ আমার অমাচ্ছন্ন জীবনে আশার কিরণ ঢালিয়া দিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় ব্যক্তিই একমাত্র স্ত্রী-সান্নিধ্যে থাকিয়া সংযম রক্ষা করিতে সমর্থ, অপরে ইহা কখনো সম্ভব নহে, আমার এই ধারণা ছিল। তাই সংযত হইতে চাহিয়াও সংযম রক্ষা করিতে পারি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠের পরে সহধর্ম্মিণীকে গ্রন্থের প্রত্যেকটা পাতা পড়িয়া বুঝাইলাম, তাঁহাকে আমার মতাবলম্বিনী করিতে চেষ্টা পাইলাম, পুণ্যে, উৎসাহ ও পাপে বাধা দিবার জন্য তাঁহাকে বারংবার দৃঢ় হইতে বলিলাম। দুইচারিবার তথাপি পদস্খলিত হইতে হইল। কিন্তু এই গ্রন্থের কৃপায় বিগত এক বৎসর কাল আমরা সস্ত্রীক

একত্রে বাস করিয়াও পূর্ণরূপে সংযম রক্ষা করিতে পারিতেছি। আমার মত নারকীয় কীট যখন সফল হইয়াছে, তখন অপর লোকে কেন পারিবে না?"

(২) সংযুক্তপ্রদেশ (U, P,) হইতে জনৈক পাঠক লিখিতেছেন,—

"বহুসন্তানপরিবৃত সংসারের দায় হইতে বাঁচিবার জন্য চেষ্টা কম করি নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জন্মশাসনের যত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সব পরীক্ষা করিয়াছি এবং সবই নিষ্ফল হইয়াছে। * * * আপনার গ্রন্থ পড়িয়া মনে হইল, ভগবানকে সস্ত্রীক ডাকিয়া দেখিই না, কি ফল হয়। দেখিলাম, সস্ত্রীক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই সংযম লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা। বিদেশী জন্ম-নিরোধের কৃত্রিম আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে প্রাচীন ভারতের ঋষি-প্রণীত পন্থার শ্রেষ্ঠতা আস্বাদন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি।"

(৩) স্বাধীন ত্রিপুরা হইতে জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন।

"এই গ্রন্থে বর্ণিত উপদেশানুযায়ী আমরা স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যহ এক সঙ্গে এক সময়ে ভগবদুপাসনায় বসিয়া থাকি। দুই তিন মাসেই চিত্তে যে পবিত্রতা অনুভব করিতেছি, তাহাতে দৃঢ় ধারণা হয় যে, আমৃত্যু সংযমী থাকাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে।"

(৪) রংপুর জেলার কোনও স্থান হইতে জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ পাঠে আমাদের উভয়েরই সৎপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে। পালন করিতে পারি আর না পারি, উপদেশসমূহ আমার ও আমার স্ত্রীর অন্তরের উপরে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছে। আমার পুত্র দুইটী জন্ম-গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানা পাইলে তাহারা দুজনেই কিছু বেশী স্বাভাবিক সম্পদ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে পারিত।"

বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মিসমাজে শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দের এক অসামান্য কৌলীন্য আছে। ইহার কারণ এই যে, নবজাগ্রত ভারতবর্ষের কর্ম্ম-সাধনার ইতিহাসে তিনি এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আদর্শ অভিক্ষার। এতকাল সকল স্বদেশকর্ম্মী দেশবাসীর দুয়ারে দুয়ারে

চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন,—তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রুদ্রকণ্ঠে বজ্রনাদে কর্ম্মসাধকের এই আত্মাবমাননার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ব্যক্তির জীবনে দৈবের অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু জাতির ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবে পুরুষকার।" ঘোর গর্জ্জনে তিনি বিঘোষিত করিলেন'—"অভ্যুদয়কামী ভারতবর্ষ! সর্ব্বাগ্রে তুমি ব্যক্তি-জীবনে এবং সঙ্ঘ-সাধনায় ভিক্ষাবৃত্তিকে বর্জ্জন কর, চাঁদার খাতা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেল, ভিক্ষার ঝুলি চুল্লীর আগুনে নিক্ষেপ কর।" আদর্শ-মুগ্ধ শিষ্যদের কাণে তিনি শুনাইলেন,—"পরমুখাপেক্ষিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, পর-প্রদত্ত পায়সান্নের দ্বারা শরীরের চর্ব্বি না বাড়াইয়া নিজভুজবীর্য্যলব্ধ ক্ষুদের কণার উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাংশ অকাতর চিত্তে দরিদ্র-নারায়ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া নিকৃষ্ট অবশিষ্টাংশ দ্বারা কোন-ক্রমে তনু-রক্ষা করিতে হইবে।" এই সকল কথা মুখে বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়া কথাগুলিকে কার্য্যেও পরিণত করিয়াছেন। কত অভিশপ্ত তরুণের চিত্তে তিনি আশার কিরণ ঢালিয়াছেন, কত অলসকে তিনি কর্ম্ম-জীবনে দীক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু কেহ এজন্য তাঁহাকে একবারের জন্যও কখনও ভিক্ষা করিতে দেখে নাই,—যাহা করিতে দেখিয়াছে, তাহার নাম অনশন এবং পরিশ্রম। ধনীর ধনের কল্পনা ছাড়িয়া নিজের বাহুবলকে তিনি প্রত্যেকটী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের দ্বারা তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মুষ্টিভিক্ষা না তুলিয়া মাসে মাসে অসংখ্য রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করা যাইতে পারে, কদন্নক্লিষ্ট ও অর্দ্ধাহারশীর্ণ কর্ম্মীরাও জনসাধারণের মধ্য হইতে চাঁদা না তুলিয়া সৎসঙ্কল্প-সুদৃঢ় বজ্রবাহুর পীড়নে প্রস্তর-কঠোর আরণ্য-

ভূমিকে আয়কর আবাদে পরিণত করিতে পারে, বিনা বেতনে বালকগণকে বিদ্যা দান করিতে পারে, আশ্রমের ব্যয়ে শত সহস্র ফলকর বৃক্ষের চারা উৎপাদন করিয়া অকাতরে তাহা গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে বিতরণ এবং গৃহে গৃহে রোপণ করিতে পারে, জেলা-বোর্ড, লোকেল-বোর্ড বা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীতই গ্রামে গ্রামে রাস্তা-ঘাট ও কূপাদি নির্ম্মাণ সম্ভব করিতে পারে।

"পুপুন্কী অযাচক আশ্রম" তাঁহার এই অভিক্ষা-সাধনার একটী সিদ্ধপীঠ। আজ এই আশ্রম ছোটনাগপুর বিভাগের মধ্যে একটী বিখ্যাত স্থানে পরিণত হইয়াছে, কোনও কোনও বিদ্যালয়-পাঠ্য ভূগোল গ্রন্থে পর্য্যন্ত ইহার কথা মুদ্রিত হইয়াছে। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস যাঁহারা অবগত হইতে কৌতূহল বোধ করিবেন, তাঁহারা আমাদের প্রকাশিত "অযাচক সন্ন্যাসীর স্বাবলম্বন সাধনা" নামক বহু প্রশংসিত পুস্তক পাঠে অনুরুদ্ধ হইতেছেন।

এই আশ্রমের উদ্দেশ্য— জনসমাজের ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করা। আশ্রম 'অযাচক' বলিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করেন এবং যখন যেটুকু আনুকূল্য ভগবদিচ্ছায় বিহিত হয়, তখন সেইটুকুর প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার করেন।

চতুর্থ সংস্করণ অত্যন্ত দ্রুত মুদ্রণ করিতে হইতেছে বলিয়া মুদ্রাকর-প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। পাঠক-পাঠিকারা এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি— আশ্বিন, ১৩৫২

বিনীত

পুপুন্কী অযাচক আশ্রম

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থখানার পঞ্চম সংস্করণ যে ইহার চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণের প্রায় দশ বৎসর পরে মুদ্রিত হইতেছে, তাহার কারণ এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার অভাব নহে। দুই বৎসর কালের মধ্যেই চতুর্থ সংস্করণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু অযাচক আশ্রম 'অযাচক' বলিয়াই ইহার নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যাবলী পূর্ব্বাপর সমান ভাবে বজায় রাখিয়াও সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত পুস্তকাবলির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল কোনও গ্রাহককেই আমরা এক খণ্ড পুস্তকও দিতে পারি নাই। অনেকে পুরাতন একখানা বহির জন্যও কত কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র-ব্যবহার করিয়াছেন। সম্প্রতি অযাচক আশ্রমের নিজস্ব মুদ্রণালয় হইয়াছে, সুতরাং আশা করি, ইহার পরে কোনও সংস্করণেই পুনর্মুদ্রণে তেমন বেগ পাইতে হইবে না।

সম্ভবতঃ বাংলা ১৩৩২ সালে বৈশাখ মাসে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ময়মনসিংহে অতীব গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হন। জীবনের আশা কেহ করে নাই। যখন পীড়া অতিশয় সাংঘাতিক পর্য্যায়ে গিয়া পড়িল, তখন তাঁহার কতিপয় প্রিয় শিষ্য তাঁহার চরণ দর্শনের জন্য ত্রিপুরা জেলা হইতে ময়মনসিংহ আগমন করেন। এই সকল শিষ্যেরা কেহ স্কুলের, কেহ কলেজের তরুণ ছাত্র মাত্র। ইহাদের অনেকের নিকটেই মনে মনে গ্রন্থকারের অনেক প্রত্যাশা। গ্রন্থকার তখন যে জীবন যাপন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার শিষ্যগণের অনেকের মনে কঠোরব্রত সন্ন্যাসের

ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। রুগ্ন-শয্যায় পড়িয়া গ্রন্থকার অনুভব করিলেন যে, যদি এই সময়েই তাঁহার দেহ-পতন ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণকারী শিষ্যগণ বিবাহিত-জীবন-যাপনকারী জন-সাধারণের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি পোষণ করিতে পারেন। যাঁহাকে শিষ্যগণ বৎসরের পর বৎসর স্ত্রীমুখ-দর্শনে বিরত দেখিয়াছে, যিনি পুকুরে স্নান করিতে গেলে কুলবধূরা তপো-ভয়ে শূন্য কলসী ঘাটে ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছে, যিনি পল্লীপথে ভ্রমণে বাহির হইলে ভীতি, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও আতঙ্কবশতঃ পথচারিণী মহিলারা দূরে সরিয়া পথকে স্ত্রী-বর্জ্জিত করিয়া দিয়াছে, তেমন তেজস্বী পুরুষের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ নারীজাতির প্রতি বিদ্বেষমূলক এক ধর্ম্মমত প্রচার শুরু করিয়া দিলে তাহাতে অদ্ভুতত্ব কি থাকিবে? আবাল্য-ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠ তরুণ তাপস এই একটা কথা ত' ইহার আগে কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই! তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন, কি প্রতীকার হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন যে, বিবাহিত-জীবনকে যে তিনি কখনো ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তাহার লিখিত দলিল না রাখিয়া তিনি মরিবেন না।

মাসের পর মাস ভুগিয়া গ্রন্থকারের শরীর কঙ্কাল-সার হইয়াছে। প্রত্যহ একসের দেড় সের করিয়া রক্তবমন করিয়া করিয়া শয্যাতলে সমগ্র দেহ লগ্ন হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য নাই। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ-পরমহংসদেব লিখিতে শুরু করিলেন "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য।" একখানা থ্রি-পিস কাঠের সঙ্গে ক্লিপ যুক্ত করিয়া কাগজ রাখা হইল। কখনও দুই চারি লাইন, কখনও দশ বিশ লাইন লেখা লিখিয়া গ্রন্থকার লেখনী ছাড়িয়া দিতেন। ছয় মাস ধরিয়া কিছু কিছু করিয়া লিখিবার পরে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল এবং কি আশ্চর্য্য,

এই গ্রন্থ-রচনা শেষ করিয়া যেদিন গ্রন্থকার সর্ব্বশেষ পাতায় লিখিলেন "সমাপ্ত", সে দিন হইতে তাঁহার দুই বৎসর-ব্যাপী নিদারুণ রক্তক্ষয় রোগ প্রশমিত হইতে লাগিল।

মূল গ্রন্থ পেন্সিলে লেখা হইয়াছিল। মুদ্রণ হইতে সামান্য দেরীই হইল। মুদ্রণকালে মূল পাণ্ডুলিপির সহিত কয়েকটী অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ ও বিষয় সংযোজিত হইল। প্রতি সংস্করণেই সময়োচিত সামান্য সংশোধন বা সংযোজন ঘটিয়াছে। পর পর ইহার যে চারিটি সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ পাঠকদের পাঠাকাঙ্ক্ষা। অযাচক আশ্রম হইতে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, পূর্ব্বসংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পরে পুনর্মুদ্রণের জন্য একমাত্র "সংযম সাধনা" ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থের জন্য "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে"র ন্যায় এত অধিক-সংখ্যক আগ্রহপূর্ণ পত্র আমরা পাই নাই। অকারণে এই গ্রন্থ জনপ্রিয় হয় নাই।

পূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অবিবাহিত তরুণ শিষ্যেরা ক্রমে বয়স্থ এবং বিবাহিত হইতে লাগিলেন। এই গ্রন্থ তাঁহাদের মনে বল-সঞ্চার করিতে লাগিল। সংযত বিবাহিত জীবন যে নবপৌরুষ-প্রবুদ্ধ এক ভবিষ্যৎ মহাজাতির আত্মপ্রকাশের ভূমিকা মাত্র, এই বিশ্বাস স্বকীয় শিষ্য-মণ্ডলীর বাহিরেও শত শত যুবকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। দাম্পত্য জীবনে সংযম-সাধনার এক অভিনব প্রচেষ্টা দেশবাসীদের মধ্যে একটী আশাস্থল সম্প্রদায়ের ভিতরে ক্রমশঃ ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য যৌন-বিলাস এক দিকে যেই দেশবাসীর মর্ম্ম-কোরক কীটভুক্ত করিতেছে, সেই দেশবাসীদেরই মধ্যে এমন একদল দম্পতীর সৃষ্টি হইল, যাঁহারা অনায়াসে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পূর্ণ সংযমের মধ্য দিয়া দাম্পত্য জীবন

পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেইজন্যই বলিতে হয় যে, "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" একখানা সাহিত্য-কর্ম্মই নহে, ইহা ভারতীয় নবজাগৃতির অনুশীলন-ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন।

ক্ষুদ্র একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে করি। বিগত ১৩৫৯ বাংলা সনের ১২ই আষাঢ়, রথদ্বিতীয়া তিথিতে পূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সর্ব্বজীবের কুশল কামনায় তপঃসাধনে নিরত হইবার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ দুই বৎসর কালের সঙ্কল্পে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। দুই বৎসর পার হইবার পরেও তিনি আরও কয়েক মাস মৌন ধারণ করিয়া থাকেন এবং বিগত ১৩৬১ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ এক অবিস্মরণীয় উৎসব-সমাবেশে দশ সহস্র ভক্তকে লইয়া হরিওঁ-কীর্ত্তন করিয়া তিনি ডিব্রুগড়ে মৌনোদ্‌যাপন করেন। মৌনভঙ্গ-দিবসে তিনি যে ভাষণ দেন, তাহাতে অন্যান্য অনেক প্রাণপ্রদ উপদেশের সহিত তিনি এই কথাও বলিয়াছিলেন,—"আমার মৌন-কালে আমার অন্তরের চিন্তা-তরঙ্গের সহিত নিজেদের চিন্তা ও আচরণের অবিচ্ছেদ যোগ রাখিবার জন্য নিখিল জগতের হিত-কামনায় তোমরা সমবেত উপাসনার অসংখ্য অনুষ্ঠান করিয়াছ। হরিওঁ-কীর্ত্তনের প্রবল বন্যায় নানা স্থান পরিপ্লাবিত করিয়াছ, কত কত নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছ, দরিদ্রকে অন্ন দিয়াছ, জ্ঞানার্থীকে গ্রন্থদান করিয়াছ।—প্রীত হইয়াছি। কিন্তু সকলের চাইতে অধিক প্রীতি দিয়াছ সেই সকল সুধন্য পুত্র-কন্যাগণ, যাহারা আমার মৌন-কালে আমার বিশুদ্ধ জীবহিতেচ্ছার সহিত নিজেদের সম্যক্ সংযোগ অব্যাহত রাখিবার জন্য বিবাহিত জীবনের দেশ-প্রচলিত সুখসন্ধান পরিহার করিয়া সংযম-ব্রত পালন করিয়াছ। আমি একথা

বলিতে আত্ম-প্রসাদে অভিভূত হইয়া যাইতেছি যে, স্বল্পকাল বা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এইভাবে দাম্পত্য সংযম যাহারা পালন করিয়াছ, তাহাদের সংখ্যা সহস্রের অধিক। কোনও সংবাদপত্রে তোমাদের এই সাধনার জয়-জয়কার ঘোষিত হইবে না, কিন্তু তোমাদের দিব্য সাধনার ফলভাক্ হইবে সমগ্র স্বদেশ এবং সমগ্র জগৎ।"

চিন্তা এক মহতী শক্তি। সচ্চিন্তা দেশের সৎশক্তি। অসচ্চিন্তা দেশের অসৎ-শক্তি। সচ্চিন্তাকে দেশ-মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচার করিতে পারিলে একদা তাহার সুপ্রভাব দেশ ও জাতিকে মহদ্বিপাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অসচ্চিন্তাকে দেশ-মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইতে দিলে একদা সহসা তাহার কুপ্রভাব-তাড়নে দেশ ও জাতির সুমহৎ অনিষ্ট হইয়া যায়। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠিত "অযাচক আশ্রম" বাংলা ১৩৩৪ সালে মানভূমের অন্তর্গত পুপুন্‌কীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার লেখনী সহস্র সহস্র সদ্ভাবমূলক প্রচার-পত্র মুদ্রণ ও বিতরণ করিয়া সচ্চিন্তার প্রসার-চেষ্টায় নিরত। সেই চেষ্টা এত দিনে দেশ ও জাতির বুকে নানা দিকে নানা ফলফুলে সুশোভিত হইতেছে। "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" বহুমুখিনী সেই চেষ্টারই একটী উচ্ছ্বসিত উদ্বেল তরঙ্গ।

পঞ্চম সংস্করণে গ্রন্থের যৎসামান্য কলেবর-বৃদ্ধি হইল। দ্রুত মুদ্রণের জন্য অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। এই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি—

১লা শ্রাবণ, ১৩৬২

অযাচক আশ্রম
ডি৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

মঙ্গলময়ের কৃপায় "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" ষষ্ঠ সংস্করণে গ্রন্থের কিঞ্চিৎ কলেবর-বৃদ্ধি ঘটিল এবং চারি হাজার বহি মুদ্রিত হইল।

এই গ্রন্থ বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ প্রভাব সহকারে নিজ কার্য্য করিয়াছে। তৎসম্পর্কে কয়েকজন পাঠকের লিখিত পত্রাংশ উদ্ধারই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

ডিব্রুগড় হইতে জনৈকা বিবাহিতা পাঠিকা লিখিয়াছেন,—

"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" আমাদের দুইজনের জীবনে নূতন ভাবের স্পন্দন সৃষ্টি করিয়াছে। 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা' ছায়াছবিতে প্রথমাংশে যে দম্পতীর পবিত্র জীবন-যাপনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা সহজ, সরল, সত্য মানুষ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। নিজেরা বারংবার স্খলিতব্রত হইয়াও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, পরিণামে দাম্পত্য জীবনের ব্রহ্মচর্য্য সাধারণভাবেই সহজ। কাল যাহা অসম্ভব মনে হইত, আজ দেখিতেছি তাহা কেবল সহজ নয়, স্বাভাবিকও। আমরা "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থের পূজ্যপাদ প্রণেতার শ্রীচরণে শত কোটি বার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

করিমগঞ্জ হইতে জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"আমাকে যুদ্ধ করিয়া সংযম রক্ষা করিতে হইতেছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আজ বিনা যুদ্ধেই আমার সীমান্ত শান্ত ও সুরক্ষিত। 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য' অলীক কল্পনা নহে।"

দক্ষিণ-কলিকাতার জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"প্রায় বিংশ বর্ষ যাবৎ 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য' গ্রন্থখানার কোনও না কোনও সংস্করণের পৃষ্ঠাগুলি চোখে পড়িয়াছে। উপদেশগুলিকে জীবনে ফুটাইতে চেষ্টা করি নাই। চিত্রা চিত্রগৃহে 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা' ছবি দেখিয়া বিশ্বাস হইল, তবে ত' কেহ কেহ ইহার উপদেশ নিশ্চয়ই অনুসরণ করিয়াছেন! আমিও যত্ন লইলাম। ভগবান্ সৎচেষ্টায় সহায় হন।

আমি আনন্দসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মচর্য্যের অমৃতময় ফলাস্বাদনে আমি আজ অপার তৃপ্তি সম্ভোগ করিতেছি।"

ময়মনসিংহ-নিবাসী জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যানুরোধে বৎসরাধিক কাল পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতে হইয়াছিল। পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞাপন দেখিলাম, কলিকাতার চিত্রগৃহে 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা' ছায়াছবি প্রদর্শিত হইতেছে। ছবিতে কি দেখিব, কোনও ধারণাই ছিল না। কিন্তু প্রথম দিক দিয়াই দেখিলাম, দুইটী স্বামি-স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য-পালনের চিত্র। মুগ্ধ হইলাম, মনের ভিতরে ব্যাকুল চিন্তা চলিতে লাগিল। জীবনে বহুবার বিফল হইয়াছি, এইরূপ বিফলতা হয়ত আর সকলেরও হইয়াছে। ছায়াচিত্রে সকলতার দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কি সত্য? একুশ দিন পরে করিমগঞ্জ গেলাম। দেখিলাম, সেখানেও ভগবান টকীজ সিনেমাগৃহে 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা' চলিতেছে। সেদিন সেখানে ছবির চতুর্বিংশ দিবস। আবার টিকিট কাটিলাম। আবার সেই চিত্র দেখিলাম। মনে এবার কেন জানি প্রত্যয় আসিল। কার্য্যব্যপদেশে পুনঃ কলিকাতায় আসিলাম। কয়েক মাস পরে বন্ধুস্ত্রীতে তৃতীয়বার ছবিটি দেখিলাম। অন্তর সৎসঙ্কল্পে ভরিয়া গেল। মহাপুরুষের চরণ স্মরণ করিয়া দেশে আসিলাম, স্বামী ও স্ত্রীতে ব্রতপালন আরম্ভ করিলাম। প্রতি পদে 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য' গ্রন্থখানা অন্তরে বলবিধান করিতে লাগিল। আজ আমি সরল চিত্তে এই কথা বলিতে পারি যে, সংযমের বলে আজ আমার জীবন অনেকটা স্বাভাবিক হইয়াছে,— এতদিন কাম-তাড়িত দুর্ব্বল জীবন অস্বাভাবিকতার পাষাণভার বহিয়া বেড়াইতেছিল। আজ আমার প্রাণে আনন্দ, দেহে বল, চিত্তে তৃপ্তি। আমি ধন্য যে, আমি 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে' বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম।"

অণ্ডাল হইতে জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"রিপুর তাড়নায় নিজের দুর্ব্বলতাকে মনুষ্য-স্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু বিবেক এভাবে প্রতারিত হইতে সম্মত হয় নাই। পতিপত্নী মিলিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-পালনের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, এক দিন বা এক সপ্তাহের সঙ্কল্পই অন্তরে অশেষ বলবিধান করিতেছে। 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য' গ্রন্থখানা আমার জীবনের দিগ্‌দর্শনকারী কম্পাস স্বরূপ হইয়াছে।"

প্রকাশকের পক্ষ হইতে এই গ্রন্থ সম্পর্কে আর কিছু না বলিলেও চলিবে আশা করি। ইতি—৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৮

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১

বিনীত—কর্ম্মাধ্যক্ষ,—
অযাচক আশ্রম

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন

চিন্তার স্থবিরতা, নূতন নূতন প্রয়োজনের দাবী, দ্রুত সমস্যা মিটাইবার অক্ষমতা এবং স্বাধীনতোত্তর যুগের মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দারুণ অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" মহাগ্রন্থ সসম্মানে নিজ পথে চলিয়াছে। ১৩৭৫ ১লা আষাঢ় ইহার সপ্তম সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৮২র আষাঢ় মাসে ইহার অষ্টম সংস্করণ পুনরায় পাঁচ হাজার মুদ্রণ আরম্ভ হইল। ক্ষীয়মাণ, ধ্বংসোন্মুখ, আত্মহননরত দুর্ব্বল জাতিকে আচার্য্য স্বরূপানন্দের অভিনব উপদেশ মৃতসঞ্জীবনী সুধা বিতরণ করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে। কিমধিকমিতি— ১লা আষাঢ়, ১৩৮২।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

উপহার

প্রেম বিনা জীবনের
সব অন্ধকার,
চিত্তশুদ্ধি বিনা প্রেম
ধরে মিথ্যাচার,
সাধন বিহীন শুদ্ধি
বৃথা পণ্ড শ্রম,
না হয় সাধন
বিনা ইন্দ্রিয়-সংযম।
—স্বরূপানন্দ—

শ্রী ____________________
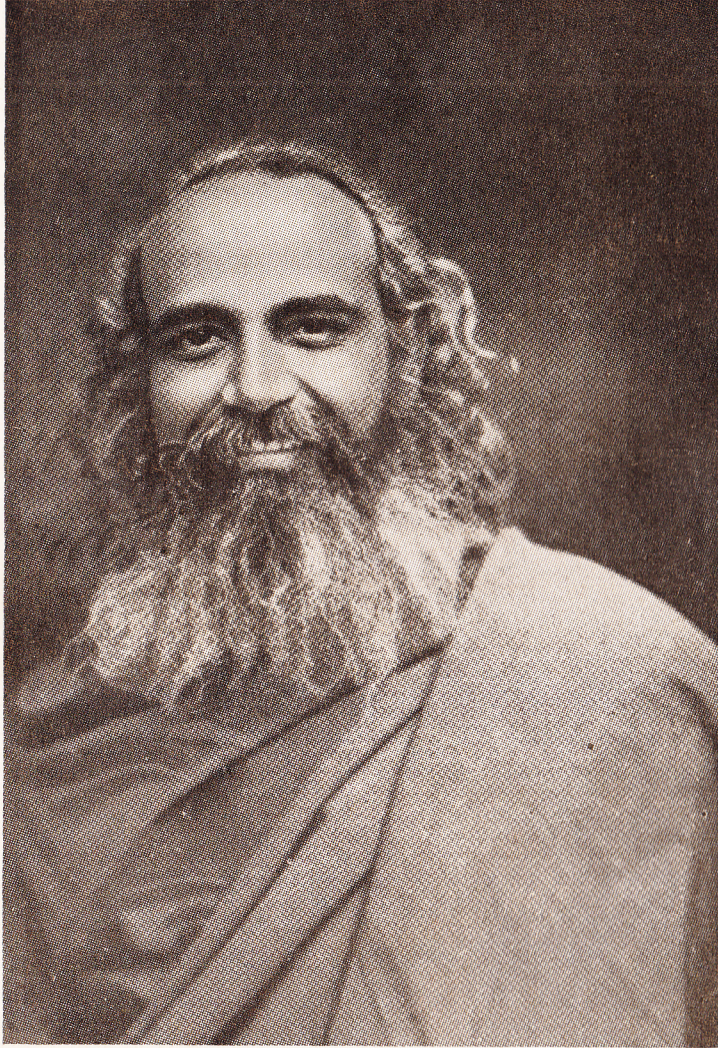
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

—:*:—

উপক্রমণিকা

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পক্ষে সর্ব্বথা মৈথুন-ত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার অযথা-মৈথুন-ত্যাগই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য। চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বীরা নিবৃত্তিপন্থী সাধক, বিবাহিত ব্যক্তিরা প্রবৃত্তিপন্থী সাধক।

গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহত্যাগীর ব্রহ্মচর্য্য

উভয়েরই ব্রহ্মচর্য্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু উভয়ের ব্রহ্মচর্য্যে পার্থক্য আছে। গৃহত্যাগীর ব্রহ্মচর্য্যে সর্ব্বপ্রকার মৈথুন-ই সর্ব্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। গৃহীর ব্রহ্মচর্য্যে মৈথুন নিষিদ্ধ নহে কিন্তু মৈথুনের এই অনুমতির চতুর্দ্দিকে নিষেধের বহু কণ্টক-বেষ্টনী রচিত হইয়াছে। এই সকল নিষেধ গৃহীকে মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা বিবাহিত ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা হইবে না। বলা প্রয়োজন, দারান্তর গ্রহণে অনিচ্ছুক চরিত্রবান বিপত্নীক ও পুনর্ব্বিবাহে অনিচ্ছুকা সুচরিতা বিধবাকে এস্থলে আমরা গৃহত্যাগীর পংক্তিভুক্ত করিতেছি।

সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য একাকী সাধ্য। কিন্তু গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য যুগলে সাধ্য। যখন যেরূপ আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রতিপালন আবশ্যক, বিশ্বসংসারের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার্থ তখনই সেইরূপ আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠার অনুশীলন করিতে পারেন। কিন্তু

একটী যুগলে সাধ্য, অপরটী একাকী সাধ্য

গৃহীকে সংসার পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না, স্বামীর পক্ষে পত্নীকে এবং পত্নীর পক্ষে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষণের চেষ্টা ধর্ম্মসঙ্গতও হইবে না। বিশেষতঃ সন্ন্যাসী ও গৃহীর কল্যাণ-লাভের এবং কল্যাণ-বিতরণের প্রণালীগত পার্থক্য রহিয়াছে। এই জন্যই গৃহীর পক্ষে

সন্ন্যাসী ও সংসারীর কল্যাণ-লাভ ও বিতরণের পার্থক্য

গৃহত্যাগীর ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর আদর্শ গ্রহণ করা যেমন নিরর্থক, সন্ন্যাসীর পক্ষেও তেমন সংসারসেবীর ব্রহ্মচর্য্যের সীমাবদ্ধ আদর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়াস ব্রত-নাশক। যদি বাহিরের দিক হইতেই সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্যকে দেখিতে চাহি, তাহা হইলেও এই এক বিরাট প্রভেদ দৃষ্টি-গোচর হয় যে, ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট তপঃশক্তি দ্বারা সন্ন্যাসী যখন প্রত্যক্ষভাবেই সমগ্র দেশ, জাতি বা সমাজের উপর এমন কি সমগ্র জগতের উপর কল্যাণ-প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট দেহক্ষয়ের দ্বারা সিংহ-বীর্য্য সন্তান উৎপাদন করিয়া গৃহী তখন প্রত্যক্ষভাবে শুধু একটি পরিবারেরই কল্যাণ বাড়াইতেছেন এবং দেশ, জাতি বা সমাজের ও জগতের কল্যাণ অপেক্ষাকৃত পরোক্ষভাবেই সাধন করিতেছেন।

সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্যে মুখ্য লক্ষ্য জগৎ, গৃহীর ব্রহ্মচর্য্যে মুখ্য লক্ষ্য পরিবার

সন্ন্যাসীর জীবন-সাধনায় জগৎ মুখ্য, সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী গৌণ; গৃহীর জীবন-সাধনায় নিজ পরিবার মুখ্য, জগৎ-সমাজ কথঞ্চিৎ গৌণ। তাই সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব বিশ্বজগৎকে লাভবান করিয়া গৃহে গৃহে সম্পদ বাড়ায়, আর গৃহীর ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব নিজ নিজ গৃহকে সমৃদ্ধ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার ব্যাস ও পরিধিকে বিস্তারিত করে এবং এই ভাবেই জগৎকে লাভবান করে। যেখানে সন্ন্যাসীর মনটী-ই শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে বিস্তৃত হইতেছে এবং শত

শত দেহের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে, সেখানে গৃহীর দেহটি-ই পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে প্রসারিত হইতেছে এবং পরাক্রান্ত সদৃশ মনসমূহকে ধারণ করিবার জন্য আধার নির্ম্মাণ করিতেছে। একের জীবন-ভঙ্গীর সহিত অপরে তাহার জীবন-ভঙ্গীর পার্থক্যটুকু ষোল আনা বজায় রাখিয়াই পরস্পরের সহযোগিতায় জগতের মঙ্গলকে জাগ্রত করিতেছে। সন্ন্যাসী জগৎকে কল্যাণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া এবং সকল আকাঙ্ক্ষার পরমপরিতৃপ্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত; পরন্তু, যেমন বংশধর বা বংশধারিণী সহজে কল্যাণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে, আদর্শ-ধারণে সমর্থ হইবে এবং পরম পরিতৃপ্তির পথে নির্ভুল পাদসঞ্চারে চলিতে চেষ্টা করিবে, এমন সন্তান-সন্ততির আগমনের পরে গৃহী নিশ্চিন্ত। জগৎকে শিক্ষা দিবার যোগ্যতা

উভয়ের ব্রহ্মচর্য্যই উদ্দেশ্যতঃ সহযোগিতামূলক

সঞ্চয়ের জন্য সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য; আর, জগৎকে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য করিবার জন্য গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য। শিক্ষা-দানের যোগ্যতা-সঞ্চয় সন্ন্যাসীর একক চেষ্টার অপেক্ষা রাখে, কিন্তু শিক্ষাগ্রহণক্ষম সন্তানের জনন-কার্য্য একমাত্র পিতা বা একমাত্র মাতার দ্বারা হইতে পারে না, ইহাতে দম্পতীর পরস্পরের শুভেচ্ছা-প্রণোদিত পরিপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক সাহচর্য্য আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত পালনের প্রয়োজনে স্বামী ও পত্নী পরস্পরের মধ্যে শত যোজন দূরত্ব রক্ষা করিবেন এবং মানসিক অনু-শীলনের দিক দিয়া একে অন্যের একেবারে অপরিচিত থাকিবেন, এমন ব্রহ্মচর্য্য বিবাহিত জীবনে তাহার মূল উদ্দেশ্যকে খণ্ডিত করে। এই জন্যই গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য কখনই একাকী সাধ্য নহে; যুগলে সাধ্য।

যেরূপ শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্য-সম্পন্ন যুবক-যুবতীর বৈবাহিক মিলনে দাম্পত্য-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য-পালন সহজে সম্ভবপর, বর্ত্তমান

যুগে সহস্র সহস্র বিবাহে দুই একটী স্থলেও তেমন যুবক-যুবতীর মিলন হইতেছে কিনা, তাহা অতিশয় সন্দেহ-সঙ্কুল কথা। এই যে যোগ্য এবং যোগ্যার মিলন হইতেছে না, ইহা হইতেই বর্ত্তমান কালে পারিবারিক জীবনের প্রায় সকল দুঃখ, দুর্গতি ও দুর্দ্দশার উদ্ভব হইতেছে। যেদিন পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র কিশোর ও কিশোরীদের জন্য একই আদর্শে পরিচালিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠিত না হইবে এবং আশ্রম হইতে দেহ, মন ও আত্মার বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া তারপরে বরকন্যা সংসার-আশ্রমে প্রবেশ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল দুর্দ্দশা ও দুর্গতির সমূল প্রতিকার অসম্ভব। দেশজোড়া স্কুল-কলেজ খুলিয়া বি-এ, এম-এ'র হাট আমরা বসাইতে পারি, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবল আন্দোলন চালাইয়া অন্তঃপুরাবদ্ধা নারীদিগকে পথে-ঘাটে স্বতন্ত্রভাবে চলিবার অধিকার দিতে পারি, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত বালক এবং বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্য সাধনার মধ্য দিয়া একটী সর্ব্বজয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া উভয়ের রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্যকে সেই আদর্শের অনুযায়ী ভাবে গঠন করা না যাইবে, ততদিন গৃহি-জীবন কিছুতেই সুখের হইবে না, ততদিন বিবাহিত জীবনে কিছুতেই শান্তি আসিবে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থাসমূহ এখনও দেশমধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠে নাই। বিদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেইগুলির পরিচালকদের এবং স্বদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন সম্বন্ধে অন্ধতামূলক উপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসমূহের প্রতিষ্ঠার প্রবল অন্তরায়স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তথাপি, যাঁহারা এই কর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, অস্থিবিক্রয় করিয়া হইলেও তাঁহারা

যোগ্য-যোগ্যার অমিলই পারিবারিক দুর্গতির মূল

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সমূহ

ইহা করিয়া তবে ছাড়িবেন। এদিকে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের গগনে সর্ব্বজনীনভাবে ব্রহ্মচর্য্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর উদিত না হইতেছে, তাবৎ-কাল অসম-রুচি, অসম-প্রকৃতি ও অসম-সামর্থ্য দম্পতীদিগকেও সংযম-সাধনা ও পারস্পরিক সহায়তার মধ্য দিয়া জীবন পরিচালনা করিতে যত্ন পাইতে হইবে! সকলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিতে সমর্থ না হইতে পারে, কিন্তু অকপটতার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের এই চেষ্টা সন্তান-সন্ততির কুমার-কুমারী-জীবনের অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় এবং বিবাহিত জীবনে বিধানানুযায়ী শিষ্টসম্মত সংযম-রক্ষায় সাহায্য করিবে। বর্ত্তমান বিবাহিত মানব-মানবীরা যাহাতে সংসারের সুখ হইতে বিষটুকু বিনষ্ট করিয়া অমৃতটুকু গ্রহণ করিতে পারেন। এবং সন্তান-সন্ততির জীবন হইতে বিষসঞ্জননের সম্ভাবনা হ্রাস করিয়া অমৃত-সঞ্জননের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দিতে পারেন, তজ্জন্য বিবাহিত দম্পতীদের কল্যাণকল্পে কতিপয় বিষয় এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শত শত কথা ভাবিবার, বুঝিবার এবং বলিবার রহিয়াছে। হে চিন্তাশীল এবং সাধনপরায়ণ ভাগ্যবান মানব-মানবীবৃন্দ! তোমরা আজ ধ্যানলব্ধ প্রশান্ত প্রজ্ঞার বলে সেই সকল অকথিত বিষয়ের অনুধাবনা করিয়া জীবনকে কল্যাণবন্ত করিয়া লও। কোনও গ্রন্থকারই তোমাদের সকল প্রয়োজনীয় কথা বা সকল সমস্যার সমাধান একটী মাত্র গ্রন্থের মধ্য দিয়া বিতরণ করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ গ্রন্থকার যদি গৃহী না হন, তাহা হইলে এই অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। তথাপি ভবিষ্যৎ ভারতের কল্যাণময় নবাবির্ভাবের সহিত নিখিল জগৎ ও সমগ্র মানব-জাতির কুশল অঙ্গাঙ্গি-

আশ্রম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কি কর্ত্তব্য এবং তাহার সুফল

ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়া সংসার-আশ্রমে অলব্ধপ্রবেশ অকৃতদার সন্ন্যাসী তোমাদের মঙ্গলের জন্য নিজের অনধিগম্য জগতেও ধ্যানযোগে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বার্থসংস্রবহীন চিত্তাভিনিবেশের ফলে রহস্যময় সেই জগতের যে স্থান সম্পর্কে যাহা অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাহা তোমাদিগকে অকাতরে পরিবেশন করিতেছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

তোমাদের প্রতিদিনকার অনুশীলনে যেখানে কেবল ক্লেদ-পঙ্ক-দুর্গন্ধই পাইয়াছ, একটী সুনির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছন্ন মনোভঙ্গীর প্রভাবাধীন হইয়া তাহাতে মনঃসন্নিবেশ করিলে বিষ হইতেও অমৃত উঠিতে পারে। এই ভরসায়ই সন্ন্যাসীর লেখনী সেই জীবন সম্পর্কে শ্রমস্বীকার করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছে। কারণ, সংযমানুকূল গ্রন্থপাঠ তোমাদের রুচিকে সংযমাভিমুখিনী করিতে পারে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাতে সংযম প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ভোগ-লালসার প্রসুপ্ত লেশটুকুকে পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার ক্ষমতা তোমাদেরই নিকটে রহিয়াছে। যেই কামুকতা জন্মান্ধ ভোগোন্মত্ততায় তোমার জীবনকে লইয়া নাগর-দোলা খেলিয়াছে, তোমাকে চঞ্চল হইতে চঞ্চলতর, নশ্বর হইতে নশ্বরতর এবং ভঙ্গুর হইতে ভঙ্গুরতর করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনার সামর্থ্য লাভ করিয়া তুমি যেন মিথ্যা জগতের মিথ্যা আচরণকেও সত্য জগতের পূর্ণ সত্যরূপে তোমার জীবনে প্রকটিত করিয়া তুলিতে পার, এমন মহাশক্তি লইয়াই তুমি মানব-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। মানবদেহ ধারণ তোমার পক্ষে প্রকৃতির একটা অন্ধ খেয়াল মাত্র নহে।

———

বিবাহের অভিব্যক্তি

অভিধানে যতগুলি শব্দের তালিকা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ভাগ্যেই এমন একটা সময় গিয়াছে, যখন সেই শব্দের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। আবার প্রত্যেক শব্দেরই সময় হইতে সময়ান্তরে অর্থের রূপান্তর হইয়া আসিতেছে। "বিবাহ" শব্দটীও সেই ভাগ্যটীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। অর্থাৎ এমন একটা সময় ছিল, যখন "বিবাহ" নামে কোনও শব্দ আদৌ প্রচলিত ছিল না। আবার, "বিবাহ" শব্দটীর প্রচলনের পরেও বিভিন্ন সময়ে ইহার অর্থ বিভিন্নরূপ হইয়াছে। আগামী যুগেও নানা সময়ে ইহার অর্থ দিনের পর দিন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

বিবাহের অর্থ

যে সময়ে 'বিবাহ' বা তদ্বোধক কোনও শব্দের প্রচলন ছিল না, সেই যুগে মানব-মানবীর যৌনসম্মিলন-ব্যাপারটা পশুপক্ষীদের সম্মিলনের ন্যায়ই নিতান্ত সাধারণ এবং সর্ব্বপ্রকার বিধি-নিষেধ-বর্জ্জিত ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ মানব যেমন জানিতে পারে না যে, সে প্রাণায়ামই করিতেছে, ঠিক তেমনি মিথুনীভূতভাবে সম্মিলিত হইয়াও মানব-মানবী জানিত না যে, তাহারা অপত্যোৎপাদনই করিতেছে। সন্তানের জন্মের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা মানব-জাতির সম্ভবতঃ সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়াই ছিল। যৌন-সম্মিলন তখন স্থূললিপ্সা-তৃপ্তির উপায় ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং এই তৃপ্তি খুঁজিতে যাইয়া মানব-মানবী রক্ত-মাংসের কোনও প্রকার নৈকট্যকেই অলঙ্ঘনীয় মনে

বিবাহের আদিম রূপ

করিত না, জন্মগত কোনও প্রকার সম্পর্কেরই বিচার রাখিত না। সুখের তৃষ্ণা যাহাকে যাহার সন্নিকট করিত, সে তাহারই সংসর্গ করিত, একই পুরুষ বা নারী রতিসুখ-প্রণোদিত হইয়া যে কোনও নারী বা পুরুষের কিম্বা বহু নারীর বা বহু পুরুষের সংসর্গ অবাধে বা অকুণ্ঠিত চিত্তে করিত। সমাজ তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই নারী বা পুরুষ কাহারও পক্ষেই দৈহিক একপরায়ণতা আবশ্যকীয় বলিয়া অনুভূত হইত না। ইহার পরে বিবাহ নামে কোনও প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলেও পুরুষ-বিশেষের সহিত নারী-বিশেষের দীর্ঘতর ঘনিষ্ঠতা ও একত্রাবস্থান ধীরে ধীরে সমাজ-সিদ্ধরূপে স্বীকৃত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় "বিধি"রূপে বিবাহ একটী অনুষ্ঠানে আসিয়া পরিণত হইয়াছে, নারীমাত্রেই বিবাহিতা হইয়া পুরুষ-বিশেষকে পতিরূপে স্বীকার করিতেছে কিন্তু তাহার যৌন স্বাধীনতা ইহার দরুণ লুপ্ত হয় নাই। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১২২ অধ্যায়ে কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ পাণ্ডু যাহা বলিয়াছেন বলিয়া বৈশম্পায়ন-মুখে শ্রীমন্ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বর্ণনা করিতেছেন, তাহা এই যুগেরই কথা। যথা,—"পূর্ব্বকালে নারী-সকল স্বাধীনা ছিল। যাহাকে ইচ্ছা হইত, তাহারই সহিত তাহারা সম্মিলিত হইতে পারিত, তাহাতে স্বামী বা অন্য কাহারও আজ্ঞার অপেক্ষা করিত না। অবিবাহিতাবস্থায়ও তাহারা পুরুষ-সংসর্গ করিত, তাহাতেও কোনও দোষ হইত না, কারণ তখন ধর্ম্ম ঐ প্রকারই ছিল। এক্ষণে পশুপক্ষীরা সেই প্রাচীন ধর্ম্মের অনুগমন করে, তজ্জন্য কেহ কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না। উত্তরকুরুদিগের মধ্যে ঐ ধর্ম্ম অদ্যাপি প্রচলিত আছে।"—কিন্তু অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত এই লোক-ধর্ম্ম যে চিরকাল অনুসৃত হইতে পারে না, তাহার কারণ মানব-মনের বিকাশের গতি ও

প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এইজন্যই মহাতপস্বী শ্বেতকেতুর কণ্ঠে ইহার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল।

যতদিন মানুষ নিজ জন্মের কারণকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে নাই, ততদিন যদিও কোন সামাজিক ভাবের উন্মেষ হইয়াই থাকে, তবে তাহা পশুপক্ষীর সমাজ অপেক্ষা বড় উন্নত শ্রেণীর ছিল না। কিন্তু যখন মানুষের জ্ঞানের প্রসার হইল, মানবী যখন প্রসূত সন্তানের জনককে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইল এবং বীর্য্যাধানকারক মানব যখন নিজেকে সন্তান-জননের কারণ বলিয়া মনে করিতে শিখিল, তখন হইতে সমাজের বন্ধন-রজ্জু প্রকৃতি-মাতার অদৃশ্য হস্তে পাকান হইতে লাগিল।

সমাজ-জীবনের প্রথম রজ্জু

প্রথমতঃ জননীকে সকলের জন্মের কেন্দ্র জানিয়া বহুপিতৃজাত সন্তানেরা এইরূপ মাতৃগত সমাজ গড়িয়া তুলিল। পরবর্ত্তী কালে জনককে সকলের জন্মের কেন্দ্র জানিয়া বহুমাতৃজাত সন্তানগণের আর একরূপ পিতৃগত সমাজ গড়িয়া উঠিল। নারীর উপরে পুরুষের অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মাতৃগত সমাজের প্রসার-পদ্ধতি পিতৃগত সমাজের প্রসার-পদ্ধতির কাছে পরাভব স্বীকার করিল এবং একটী মাত্র পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই বহু নারীর সন্তান-সন্ততিরা পরস্পর মিলিয়া সমাজকে গঠিত, শাসিত ও সম্প্রসারিত করিতে লাগিল।

ভারতীয় আর্য্যসমাজে মহামনা শ্বেতকেতু সমদর্শিতা-প্রেরিত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সীমানির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। "শ্বেতকেতু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অদ্য হইতে যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা-সদৃশ পাতক হইবে। অপিচ, এই ভূমণ্ডলে যে পুরুষ কৌমার-ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে

শ্বেতকেতুর অপক্ষপাত সীমা নির্দ্দেশ

অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবে। [মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২ অঃ]।

তাঁহার অনুশাসনের মর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে ধীরে ধীরে মাতৃগত ও পিতৃগত উভয়বিধ সমাজধারা শুষ্ক হইয়া একমাতা ও একপিতার সাম্যমূলক সম্মিলনে উদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ সমাজধারা প্রবাহিত হইত। কিন্তু শ্বেতকেতুর সীমা নির্দ্দেশের ফলে নারীর একপরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পুরুষের বহুপরায়ণতা নিবারিত হইল না। কারণ, পুরুষেরা শ্বেতকেতুর নির্দ্দেশ মানিল না। দীর্ঘতমা প্রভৃতি একদেশদর্শী পক্ষপাতী ঋষিরা পুরুষের আচরণ নিয়মিত করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া মাত্র নারীর বহুপরায়ণতাই রোধ করিলেন। "একদা দীর্ঘতমা ভার্য্যাকে অসন্তুষ্ট দেখিয়া কহিলেন যে, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? ভার্য্যা প্রদ্বেষী কহিলেন,—স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলা যায় এবং পালন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকে। হে মহাতপ! আমি চিরকাল তোমার জন্মান্ধতা-প্রযুক্ত তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া শ্রমাতুরা হইয়াছি, এক্ষণে আর ভরণ করিতে পারিব না।— তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি পূর্ব্বের ন্যায় আর ভরণপোষণ করিতে সমর্থা নহি। দীর্ঘতমা কহিলেন,—আমি অদ্য হইতে এইরূপ লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলাম যে, নারী যাবজ্জীবন একমাত্র পতিপরায়ণা হইবে। সেই একমাত্র স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, নারী অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। যদ্যপি কোন নারী অন্য পতিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই নারী পতিতা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

দীর্ঘতমার পক্ষপাত-মূলক সীমানির্দ্দেশ

[মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪ অধ্যায়]।

ইহাতে কিছু সুফল হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু নরনারীর উভয়ের দায়িত্বের ও অধিকারের সমতা না থাকিলে যে বিশৃঙ্খলা জন্মে, তোষাখানার সিংহদুয়ার বন্ধ রাখিয়া পিছদুয়ার খুলিয়া রাখিলে রাজকোষের যে অনর্থক অপচয় হয়, একজনকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়া আর একজনকে অন্ধকারায় রুদ্ধ করিলে যে বিষম দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক অধোগতি ঘটে, তাহাদেরই দুঃখদ তাড়না বর্ত্তমান যুগের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য করিল। ইহার ফলে এবং অন্যান্য কয়েকটী কারণে পুরুষের বহুবিবাহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে। সত্য, কিন্তু আদর্শ হিসাবে পুরুষের একপরায়ণতা আজও অনেকটা কল্পনারই বস্তু হইয়া রহিয়াছে। আর্থিক অভাব বা পারিবারিক অশান্তির আশঙ্কা না থাকিলে আজও অনেকেই একাধিক বিবাহ করিতে লজ্জাবোধ করে না বা বহুবিবাহের জন্য নিজেদিগকে ধিক্কার-যোগ্য মনে করে না। * আচরণের দিক দিয়া বহুবিবাহ কমিয়াছে কিন্তু মনের ইচ্ছার দিক দিয়া ইহা অপাংক্তেয় হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুবিচার-চেষ্টা

সামাজিক জীবনে পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিকথাটুকু মনে রাখিলেই সহজে বুঝা যাইবে যে, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় "বিবাহ" কথাটার কিরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। যতদিন নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য-সম্বন্ধীয় কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই,

* এই পুস্তক বাহান্ন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে হিন্দু-সমাজে বহুবিবাহের প্রায় লোপ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তদুপরি সম্প্রতি হিন্দুর বহুবিবাহ-নিরোধক আইনও হইয়াছে। গ্রন্থকার।

ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ-“বন্ধনের”ও সৃষ্টি হয় নাই। কারণ, সন্তান-জননের জন্য বিবাহ অপরিহার্য্য নহে, বিবাহ ব্যতীতই মানবের জন্মধারা আদিকাল হইতে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু যখন হইতে প্রসূত সন্তান জনক-জননীকে পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্বসমূহ স্মরণ করাইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই বিবাহটী একটী বন্ধনে দাঁড়াইল। বন্ধন যখন সৃষ্টি হইল, তখনও প্রথম সময়েই এই বন্ধন অতি সুদৃঢ় ছিল না। ধীরে ধীরে মানব-মনের ভাবোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবলতর এবং বিবাহের বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। ভবিষ্যৎ কালেও আদর্শ মানবমানবীগণের মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান দিনের পর দিন আরও সূক্ষ্ম এবং বিবাহবন্ধন আরও সুগভীর হইতে থাকিবে। সেই সময়ে বিবাহিতের জীবন ভগবৎ-সাধনার জীবন হইবে এবং নরনারীর দৈহিক মিলন অঙ্গলিপ্সার মুখ না চাহিয়া আত্মিক কল্যাণের মুখ চাহিয়া চলিবে, সন্তান-জননের মধ্যেও এই মিলন ব্রহ্মচর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

ভাবী যুগে
বিবাহিত জীবন

কোনও রমণী একমাত্র পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের সহিত যৌন-ব্যবহার করিবেন না বলিয়া যেদিন স্বীকৃত হইল, সেই দিনকে নারীর পরাধীনতা শুরু হইবার যুগ বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, যৌন একনিষ্ঠা পরিণামে নারীর কিরূপ হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে। কোনও পুরুষই একটী মাত্র পত্নী ব্যতীত অন্যকে শয্যাসঙ্গিনী করিতে পারিবেন না বলিয়া যে নীতি পুরুষের জন্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাকে নারী ও পুরুষের সমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলিয়া অভিনন্দন দেওয়া এইয়াছে।

কিন্তু আজও কেহ ভাবিয়া দেখ নাই যে, ইহার তাৎপর্য্য একমাত্র নারীর প্রতি অবিচারের প্রতীকারই নহে অথবা নারী-পুরুষের সাম্যপ্রতিষ্ঠাই নহে, ইহার তাৎপর্য্য এতদপেক্ষাও অনেক পরিমাণে গভীরতর।

দাম্পত্য
একনিষ্ঠার
বিদেহী তাৎপর্য্য

শরীরের অঙ্গমাত্রেরই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা-গ্রহণের যোগ্যতা রহিয়াছে। এই সকল ভঙ্গিমার প্রত্যেকটাই যোগের এক একটা মুদ্রা। মুদ্রা-সকল কেবলই শরীরের অঙ্গ-বিশেষের এক একটা ভঙ্গিমা নহে, ইহারা তাহারও অতিরিক্ত কিছু। এক একটা মুদ্রা এক একটা ভাবের দ্যোতক এবং সাধক। এক একটা ভাব আবার প্রথম দৃষ্টিতে যাহা, গভীরতর অনুশীলনে তাহা অপেক্ষা অনেক আশ্চর্য্যতর এবং গভীরতর অনুভূতিতে বিস্ময়কর রূপে অভিনব। এক একটা মুদ্রার অনুশীলনের দ্বারা শুধু শারীর ভঙ্গিমা-বিশেষের সহায়তাতেই মনের মধ্যে এক একটা বিশেষ ভাবের উদয় হয় এবং চিত্ত-মধ্যে এক একটা নবতর রসের আস্বাদন হয়। করাঙ্গুলি, পদাঙ্গুলি, বক্ষ, উদর, নাসিকা, নয়ন, ললাট, চর্ম্ম, কর্ণ, গ্রীবা, ওষ্ঠ, কপোল, দন্ত, রসনা, ভ্রূ-যুগ ও কণ্ঠ প্রভৃতি শারীরিক প্রতিটী প্রত্যঙ্গের দ্বারা নানাবিধ মুদ্রানুশীলন করা সম্ভব। এই সকল মুদ্রার সহায়তায় নানাবিধ মনোভাবের জাগৃতি ঘটে এবং ভাবের প্রগাঢ়তা অনুসারে নানাবিধ চিত্তসুখ অনুভূত হইয়া থাকে। যেখানে দুইটী ব্যক্তিতে মিলিত হইলে তবে একটী মুদ্রার অনুশীলন সম্ভবপর হয়, যথা সহবাস, সেখানে এই অনুশীলনের মধ্যে এক-নিষ্ঠার আবশ্যকতা অত্যধিক। কেননা, তাহা না হইলে মুদ্রা কেবল একটা শারীর ক্রিয়াই থাকিয়া যায়, ইহার কোনও আধ্যাত্মিক সার্থকতা জন্মে না। নরনারীর দৈহিক মিলনও ত একটা

মুদ্রা

মুদ্রাই। এই মুদ্রায় যেমন নির্দ্দিষ্ট শারীর ভঙ্গিমা আছে, তেমন ইহা দুইটী আত্মার মধ্যে একটা মিলনেরও ইঙ্গিত করে। এই মুদ্রার অনুশীলনে বৈয়ক্তিক একনিষ্ঠা না থাকিলে নিত্য নূতন রকমের দেহসুখ উপলব্ধ হইলেও হইতে পারে কিন্তু এই মুদ্রার অন্তর্নিহিত যে

সহবাস বা দাম্পত্য মুদ্রা

আত্মিক মিলনের ইঙ্গিত, তাহা উপলব্ধিলভ্যও হয় না, বুদ্ধিগ্রাহ্যও হয় না। দেহ যে দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহা কি দেহসুখটুকুরই জন্য ? ইহা কি আত্মার সহিত আত্মাকে মিলাইবার আমন্ত্রণ নহে ? যে মুদ্রার সার্থকতা আত্মিক মিলনের ভাবকে জাগ্রত, প্রগাঢ় ও আস্বাদিত করাইবার মধ্যে, নিত্য নূতন অনুশীলন-সঙ্গীর সহিত যৌন ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির ফলে তাহা জাগে না, ঘনীভূত হয় না এবং আস্বাদন আসে না। কিন্তু যেখানে একই দাম্পত্য মুদ্রা একই সহযোগী বা সহযোগিনীর সহায়তায় বারংবার অনুশীলিত হইতেছে, সেখানে দেহের অশোভন বিহ্বলতা আস্তে আস্তে উভয়ের আত্মিক নৈকট্যের নিকটে হীনপ্রভ হইয়া একান্ত গৌণ ব্যাপারে পরিণত হইয়া যায়। দেহ দিয়া যেখানে কেবল দেহকে সন্নিহিতরূপে পাওয়া যাইতেছিল, সেখানে দেহের সান্নিধ্য আত্মারও সান্নিধ্য সৃজন করে, দেহের নৈকট্য দেহের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার নৈকট্য বিধান করে। যৌন-সংসর্গের একনিষ্ঠা এইভাবে পরম-যোগের সহায়ক হইতে পারে। সুতরাং এই কারণেও "নারীর এক পতি"

সহবাসে একনিষ্ঠা

ও "পুরুষের এক পত্নী" বিধান-হিসাবে বিপুল অভিনন্দন পাইবার যোগ্য।

অবশ্য, ইহা বিবাহের এক অভিনব ব্যাখ্যা। কিন্তু বিবাহের ক্রমোন্নতির পথে ইহাই বিবাহের প্রত্যাসন্ন ভাবী যুগ।

বিবাহিত জীবনের এই সংযম-সুরভিত অকৈতব-প্রেম-মধুময় সুখ-বিলসিত সুন্দর আলেখ্য আজ পাশ্চাত্য-মদিরা-মুগ্ধ ইহসর্ব্বস্ব ক্ষণস্থায়ী তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষিতাদের সমাজে

ভাবী যুগের সূচনা

নিছক কল্পনার বস্তু বা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া গণিত হইলেও পল্লীমায়ের চরণ-সেবায় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ নীরবে উৎসর্গ করিয়া ফল স্বরূপে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই অবগত রহিয়াছি যে, সেই মঙ্গলময় মহান্ দিনের শুভসূচনা বহু যুবকের ও বহু যুবতীর জীবনের উপরে প্রকট বিগ্রহ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—ভারতীয় দম্পতীর ভাবী দিব্য জীবন আজই নিজের পরিচয় নিজে নিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

এ কথা ভাবিবার আজ আর প্রয়োজন নাই যে, বিবাহিত জীবনকে দিব্য ভাবে বিভাবিত করিয়া লৌকিক জীবনেই অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া চলা অসম্ভব। এ কথা বিশ্বাস করিবার আজ কোনও আবশ্যকতা নাই যে, মুষ্টিমেয় দুই চারি

দম্পতীরই দিব্য জীবন লাভ-সম্ভাবনা

জনেই নিজেদের ব্যক্তিগত নিগূঢ় জীবনে অসাধারণ হইয়া চলিতে সক্ষম, জন-সাধারণের তাহাতে অধিকার নাই বা যোগ্যতা নাই। সর্ব্বজীবে পরমেশ্বর অকল্পনীয় শক্তির স্ফুরণ ঘটাইতে সমর্থ। পৃথিবীর প্রত্যেক দম্পতীর জীবনই অসাধারণ জীবনে পরিণত হইতে পারে। প্রয়োজন শুধু একাগ্র সাধনার। স্বামী এবং পত্নী একত্র হইয়া যখন কোনও অসাধারণ সঙ্কল্প গ্রহণ করে, তখন পরমেশ্বর তাঁহার জীবসৃজনী শক্তিকে সংগ্রহ করিয়া মহতীতর শক্তির লীলা প্রকাশের জন্য এই দুইটী দুর্ল্লভ মানব-তনুকে গ্রহণ করেন।

—*—

বিবাহের অর্থ

"বিবাহ" কথাটী প্রচলিত হইবার প্রথম যুগে সকল দেশেই নরনারীর সাময়িক প্রয়োজনে পতি-পত্নী-ভাবে একত্র অবস্থানকেই "বিবাহ" বলিয়া গণ্য করা হইত। পরবর্ত্তী যুগে নরনারীর পতি-পত্নী-ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থানকেই বিবাহ বলা হইত। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নরনারীর পতি-পত্নী-ভাবে একত্র অবস্থানকে "বিবাহ" বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু আদর্শযুগে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া মিলিত হইলেই "বিবাহ" হইবে না, ধর্ম্মার্থে মিলিত হইবে; নরনারীর মিলনেই শুধু চলিবে না, এই মিলনের দ্বারা পুরুষের পুরুষত্বকে সার্থক এবং নারীর নারীত্বকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে; একত্র অবস্থানকেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা হইবে না, একের সাহচর্য্যের দ্বারা অপরের জীবনকে উন্নত এবং একের আত্মা দ্বারা অপরের আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে। বিবাহের এই অপূর্ব্বসুন্দর আলেখ্য ভারতীয় সিদ্ধতাপসগণের মধ্যে অনেকে দর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ মানব-সন্তানগণকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছেন। এই আদর্শের সন্ধান পৃথিবীর আর কোনও দেশ সম্ভবতঃ তেমন ভাবে পান নাই। অপরাপর জাতিরা ভারতীয় আর্য্য-জাতির তুলনায় বয়সে ছোট এবং আধ্যাত্মিক সাধনার পুরুষানুক্রমিকতায় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বলিয়া বিবাহকে নানা বিকৃত প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছেন। ভারতীয় গৃহীও যে সর্ব্বজনীনভাবে এই আদর্শের

পূর্ণতা লাভার্থ ধর্ম্মার্থে মিলিত হইবে

সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু নানা কারণে এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিবার অনুকূল অবস্থা তাহার পক্ষে সুলভ্য হইবে। সুতরাং হে ভারতীয় যুবক-যুবতীগণ, তোমরা আজ বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিদিগকে পৃথিবীকে আদর্শদানের যোগ্য করিয়া তোল। তোমাদের হাতে আজ ভারতের তথা জগতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যতৌল দুলিতেছে। তোমাদেরই বিবাহিত জীবনের পবিত্রতার উপরে অনাগত মহাকর্ম্মী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমী অতিমানুষদের আবির্ভাব নির্ভর করিতেছে। তোমাদিগকে আজ আত্মবিস্মৃত হইলে চলিবে না। দেহের এবং মনের একটী মাত্র স্পন্দন এবং বিন্দুমাত্র সামর্থ্যকেও ব্যর্থ হইতে না দিয়া পরমপুরুষকার-প্রভাবে আত্মার কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য এবং জগতের কল্যাণের জন্য, তোমরা তপঃপরায়ণ হও, সংযমনিষ্ঠ হও। অমানিশাচ্ছন্ন অমঙ্গলময় অন্ধ-কারা-কক্ষে আজ ভারতের অন্তরাত্মা অভ্যুদয় লাভের আকুল আবেদনে আকাশ-বাতাস মথিত করিতে চাহিতেছে,—চালাকীতে নহে, চাতুরীতে নহে, মিথ্যাশ্রয়ে নহে, কঠোর তপশ্চর্য্যায়, কঠোর আত্মদানে, কঠোর স্বার্থোৎসর্গেই তাঁর অধঃপতিত দারুণ দৈন্য-দশাগ্রস্ত দুর্গত জীবনের নবারুণোদয় ঘটিবে,—তোমাদের বিবাহ, তোমাদের দাম্পত্য-জীবন, তোমাদের গার্হস্থ্য-লীলা তাহারই সহায়ক হউক, তাহারই বাহন হউক।

—*—

বিবাহের অর্থ

"বিবাহ" কথাটী প্রচলিত হইবার প্রথম যুগে সকল দেশেই নরনারীর সাময়িক প্রয়োজনে পতি-পত্নী-ভাবে একত্র অবস্থানকেই "বিবাহ" বলিয়া গণ্য করা হইত। পরবর্ত্তী যুগে নরনারীর পতি-পত্নী-ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থানকেই বিবাহ বলা হইত। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নরনারীর পতি-পত্নী-ভাবে একত্র অবস্থানকে "বিবাহ" বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু আদর্শযুগে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া মিলিত হইলেই "বিবাহ" হইবে না, ধর্ম্মার্থে মিলিত হইবে; নরনারীর মিলনেই শুধু চলিবে না, এই মিলনের দ্বারা পুরুষের পুরুষত্বকে সার্থক এবং নারীর নারীত্বকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে; একত্র অবস্থানকেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা হইবে না, একের সাহচর্য্যের দ্বারা অপরের জীবনকে উন্নত এবং একের আত্মা দ্বারা অপরের আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে। বিবাহের এই অপূর্ব্বসুন্দর আলেখ্য ভারতীয় সিদ্ধতাপসগণের মধ্যে অনেকে দর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ মানব-সন্তানগণকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছেন। এই আদর্শের সন্ধান পৃথিবীর আর কোনও দেশ সম্ভবতঃ তেমন ভাবে পান নাই। অপরাপর জাতিরা ভারতীয় আর্য্য-জাতির তুলনায় বয়সে ছোট এবং আধ্যাত্মিক সাধনার পুরুষানুক্রমিকতায় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বলিয়া বিবাহকে নানা বিকৃত প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছেন। ভারতীয় গৃহীও যে সর্ব্বজনীনভাবে এই আদর্শের

পূর্ণতা লাভার্থ ধর্ম্মার্থে মিলিত হইবে

সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু নানা কারণে এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিবার অনুকূল অবস্থা তাহার পক্ষে সুলভ্য হইবে। সুতরাং হে ভারতীয় যুবক-যুবতীগণ, তোমরা আজ বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিদিগকে পৃথিবীকে আদর্শদানের যোগ্য করিয়া তোল। তোমাদের হাতে আজ ভারতের তথা জগতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যতৌল দুলিতেছে। তোমাদেরই বিবাহিত জীবনের পবিত্রতার উপরে অনাগত মহাকর্ম্মী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমী অতিমানুষদের আবির্ভাব নির্ভর করিতেছে। তোমাদিগকে আজ আত্মবিস্মৃত হইলে চলিবে না। দেহের এবং মনের একটী মাত্র স্পন্দন এবং বিন্দুমাত্র সামর্থ্যকেও ব্যর্থ হইতে না দিয়া পরমপুরুষকার-প্রভাবে আত্মার কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য এবং জগতের কল্যাণের জন্য, তোমরা তপঃপরায়ণ হও, সংযমনিষ্ঠ হও। অমানিশাচ্ছন্ন অমঙ্গলময় অন্ধ-কারা-কক্ষে আজ ভারতের অন্তরাত্মা অভ্যুদয় লাভের আকুল আবেদনে আকাশ-বাতাস মথিত করিতে চাহিতেছে,—চালাকীতে নহে, চাতুরীতে নহে, মিথ্যাশ্রয়ে নহে, কঠোর তপশ্চর্য্যায়, কঠোর আত্মদানে, কঠোর স্বার্থোৎসর্গেই তাঁর অধঃপতিত দারুণ দৈন্য-দশাগ্রস্ত দুর্গত জীবনের নবারুণোদয় ঘটিবে,—তোমাদের বিবাহ, তোমাদের দাম্পত্য-জীবন, তোমাদের গার্হস্থ্য-লীলা তাহারই সহায়ক হউক, তাহারই বাহন হউক।

—*—

বিবাহের উদ্দেশ্য-বিচার

মানবসমাজে বিবাহের যতগুলি উদ্দেশ্য প্রচলিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটীকে নির্দ্দেশ করা যায়। যথা :—

(১) ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি,
(২) ইন্দ্রিয়-দমন,
(৩) সন্তান-জনন,
(৪) জীবন-সংগ্রামের দুঃখকষ্টের লঘুতাসাধন,
(৫) ভগবৎ-সাধনা,
(৬) পরিপূর্ণ আত্মিক মিলন।

বিবাহের এই ছয়টী উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী কথা আলোচনা করিতেছি।

[১] ইন্দ্রিয়-সুখ যেখানে বিবাহের উদ্দেশ্য, সেখানে বিবাহকারীরা পশুপক্ষীরই স্থলাভিষিক্ত। কারণ, দেহ-সুখ-লিপ্সুর বিচার-বুদ্ধি কখনও অনুধাবনা করিয়া দেখে না যে, ইন্দ্রিয়-সুখই সুখের চরম কিনা এবং এই ইন্দ্রিয়-সুখে পরিতৃপ্তি লাভ কখনও সম্ভব কি না।

ইন্দ্রিয়-সুখই কি সুখের চরম?

ইন্দ্রিয়-সুখই যে সুখের চরম নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, এই জগতে শত শত মানব ইন্দ্রিয়-সুখকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সুখের আস্বাদন না পাইলে কি করিয়া তাঁহারা দেহসুখের দুর্নিবার আকর্ষণকে দমন করিতে পারিলেন? একটা সাম্রাজ্য না পাইলে রাজ্যকে কে

উপেক্ষা করিতে পারে? সন্দেশ না পাইয়া বাতাসাখানিকে কে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়? এ জগতে যত জন বিবাহিত জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ভোগসুখের ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণাকে আহার্য্য এবং পানীয় না জোগাইয়া উপবাসের পর উপবাসে হত্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলেই যে-কোনও মুহূর্ত্তে বিবাহিত হইতে বা অসংযম-প্রবাহে ঝাঁপ দিতে পারিতেন। অসংযমীর পক্ষে সংযমের পথে চলিতে বাধার অন্ত না থাকিলেও, সংযমী যদি অসংযত জীবন যাপন করিতে চাহে, তবে ত' তাহার পথে কাঁটা দিবার কেহই নাই। তথাপি বুদ্ধ, চৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহতেরা রমণী-সুখে নিজেদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন কেন? বুদ্ধদেব নারীপ্রেমের মাধুর্য্য বুঝিয়াছিলেন, গোপার গর্ভে সন্তানও উৎপাদন করিয়াছিলেন, দেহসুখ কি, ইহার আকর্ষণ কিরূপ, তাহাও জানিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন কেন এবং ফিরিয়া আসিয়া গোপাকে লইয়া গৃহীই বা হইলেন না কেন? চৈতন্যদেবও বিবাহ করিয়াছিলেন। একটী নয়, দুইটী বিবাহই করিয়াছিলেন। নারী-প্রেমের পবিত্রতম উৎকর্ষ তিনি দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে দেখিয়াছিলেন, তথাপি কেন তিনি দেহসুখে মজিলেন না, বরঞ্চ চিরতরে পত্নী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন? সমস্ত জীবন বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রু-জলে বক্ষ ভাসাইলেন, কিন্তু একবারের বেশী দুইবার স্বামিসন্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। ইহা হইল কেন? চৈতন্যদেব ত' সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে গৃহী করিয়াছিলেন, তিনি কি নিজে ফিরিয়া আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গসুখে দিন কাটাইতে পারিতেন না? মহাত্মা তুলসীদাস পত্নীপাগল ছিলেন, এক মুহূর্ত্তও পত্নী-বিচ্ছেদ সহিতে পারিতেন না, (তাঁহার একটী

সন্তানও জন্মিয়াছিল), আর সেই ব্যক্তিই পরবর্ত্তী জীবনে সহধর্ম্মিণীর সকল কাতরতা তুচ্ছ করিয়া ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না ! পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বাল্যকালে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকগণের স্বেচ্ছাচারে বিবাহ করিতে বাধ্য হন নাই, চব্বিশ বৎসর বয়সে নিজের ইচ্ছায় নিজনির্দ্দেশক্রমে পাত্রী-নির্ব্বাচন করাইয়া তবে সারদামণি দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র জীবনে একবারের জন্যও স্বীয় পত্নীর সঙ্গে কোনও প্রকার দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন না। বুদ্ধদেব যদি পুনরায় সংসারী হইতেন, চৈতন্যদেব যদি পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়া-সাহচর্য্যে কাল কাটাইতেন, তুলসীদাস যদি তাঁহার ঠাকুরের আরতির কর্পূর, তিলক-সেবার খড়িমাটি এবং মুখশুদ্ধির হরীতকীর ন্যায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীকেও ঝোল্নায় করিয়া লইয়া যাইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যদি সারদামণি দেবীকে লইয়া গার্হস্থ্য-জীবন কাটাইতেন, কে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিত ? সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতি আকুমার ব্রহ্মচারীরা যদি বিবাহার্থী হইতেন, তবে কি সেই হতভাগ্য দেশে তাঁহাদের পাত্রী জুটিত না, যে-দেশে কাণা-খোঁড়া-অন্ধ-আতুরেরও বিবাহ হয়, যে দেশে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন দীন-দরিদ্রেরও গৃহলক্ষ্মীর অভাব হয় না, যে-দেশে পাঁচ বৎসর বয়সে অকাল-মৃত্যু মরিয়াও সহস্র সহস্র শিশু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এড়াইয়া চলিতে পারে না ? জনক-গৃহে শুকদেব ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের শত উপকরণ পাইয়াও সংযমভ্রষ্ট হইলেন না, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ রূপ, যৌবন ও অর্থে সুসমৃদ্ধা মার্কিণ-যুবতীদের ঘনিষ্ঠতায় তিলমাত্র টলিলেন না। ইন্দ্রিয়-সংযমে এই যে অটল প্রতিষ্ঠা ইঁহারা লাভ করিলেন, তাহা

কিসের বলে ? ইন্দ্রিয়সুখের অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠতর সুখ আছে, তাহাতে মজিয়াছিলেন বলিয়াই মদন-ধনুর ঘন টঙ্কার এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহামানবদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। ইন্দ্রিয়সুখই চরমসুখ নহে এবং এই সকল মহাত্মারা প্রকৃত চরমসুখের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রক্তমাংসের প্রলোভনে ভুলিয়া যান নাই।

ইন্দ্রিয় সুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সুখ আছে।

অধিকন্তু, ইন্দ্রিয়সুখে কখনও পরিতৃপ্তি সম্ভব নহে। ভোগের স্রোতে ভাসিতে গিয়া ডুবিয়াই মরিবে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার শেষ হইবে না। কামাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে কামের কখনও অক্ষুধা জন্মিবে না, তাহার লেলিহান রসনা তোমাকে আরও বেশী করিয়া গ্রাস করিবার জন্য লক্ লক্ করিয়া বিস্তারিত হইবে। দশ সহস্র বৎসর যৌবন উপভোগ করিয়াও রাজা যযাতির সুখ-তৃষ্ণা উপশান্ত হয় নাই। শেষে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" যাহারা ভোগ করিয়া ভোগ-বাসনা কমাইতে চাহিয়াছে, চিরকাল তাহারা ঠকিয়াছে। দেহসুখের চেষ্টা করিতে করিতে যাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়াছে, ভোগের সামর্থ্য চিরতরে চলিয়া গিয়াছে, কৈ তাহারও ত' মুখে কেহ কখনও শোনে নাই যে,—"নাঃ, বেশ পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আর চাই না।"

ইন্দ্রিয়-সুখে কখনও পরিতৃপ্তি সম্ভব নহে !

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥"

ইহাদের মুখে শুনিবে শুধু হাহাকার, শুধু মনস্তাপ। কেহ বলিবে—"হায় হায়! যৌবন চলিয়া গেল, সুখভোগ করিতে পারিলাম না।" কেহ বলিবে "অহো! আগে বুঝিলাম না, সাবধান হইলাম না, শিক্ষার অভাবে, দীক্ষার অভাবে, ভ্রমবশে চিরকাল মায়া-মরীচিকার অনুসরণ করিয়া ইহকাল নষ্ট করিলাম, পরকাল হারাইলাম।"

মোটকথা, ইন্দ্রিয়সুখ শান্তি-প্রার্থী মানব-মানবীর বিবাহের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। পরমসুখ-প্রাপ্তিই তাহাদের বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে। পরমসুখের উপাসনাকালে আত্ম-কল্যাণার্থ ও লোক-কল্যাণের জন্য নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে তাঁহারা দাম্পত্য-জীবনে দৈহিক সম্বন্ধ প্রয়োজনবশে স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ভোগের জন্য ভোগ, সুখের জন্য সুখ, মৈথুনের জন্য মৈথুন প্রার্থনা তাঁহারা করিবেন না।

ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে

দেহের জন্য দেহ বিকল হইল, বিহ্বল হইল, লালসার দুর্নিবার তাড়নায় এক দেহ অপর দেহকে প্রগাঢ় পরিরম্ভনে জড়াইয়া ধরিল, দেহেন্দ্রিয়ের মিলনে যতটুকু সুখ আস্বাদন সম্ভব, তাহা আস্বাদন করিবার প্রাণান্ত চেষ্টা পাইল এবং ঠিক যেই মুহূর্ত্তে সুখের লোলুপতা চূড়ান্ত শিখরে উঠিয়াছে, সেই সময়েই হতাশার সহিত উপলব্ধি করিল যে, অন্তরের সমস্ত পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা কোনও প্রকার দৈহিক অধ্যবসায়েরই আয়ত্ত নহে। কি নিদারুণ মনোভঙ্গ! এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির পরে কোন্ বিবেকবান্ ব্যক্তি বলিতে সাহসী হইবেন যে, ইন্দ্রিয়-সুখ-চরিতার্থতাই বিবাহের উদ্দেশ্য? বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়-সুখকর কার্য্যেরও সম্মানজনক স্থান অবশ্যই আছে কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ-চরিতার্থতাই কখনো তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সূতা ধরিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে টানিতে থাকিলে যেমন তাহার

সহিত বাঁধা রশি হাতের মুঠায় চলিয়া আসে, আবার সেই রশি ধরিয়া টানিতে থাকিলে যেমন তাহার সহিত বাঁধা কাছি আস্তে আস্তে হাতে আসিয়া যায়, এবং সেই কাছি ধরিয়াই আস্তে আস্তে টানিতে থাকিলে যেমন কাছির অপর প্রান্তে বাঁধা অশেষ বাণিজ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ জাহাজ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া যায়, স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন-জনিত ইন্দ্রিয়-সুখও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই। একটু সুখ পাইয়া, ক্ষণিক সুখটুকুকে চাখিয়া আত্মা বৃহত্তর সুখকে পাইবার পথ খুঁজিবে, নিত্যকালস্থায়ী সুখের উপায় উদ্ভাবন করিবে,—দেহ-সুখ যেন সেই অনন্ত পিপাসাকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য এক টুক্‌রা নমুনা-বিতরণ। ইহার নিজস্ব সার্থকতা কিছুই নাই, কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম সার্থকতাকে লাভ করিতে হইবে। তাহারই জন্য যে উদ্যোগ ও আয়োজন, ইহাই আদর্শ মানব-মানবীর বিবাহিত জীবন।

দম্পতীর ইন্দ্রিয়-মিলন ও বৃহত্তর দূরবর্তী লক্ষ্য

(২) ইন্দ্রিয়-দমনকে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-দমনের জন্য জগতের প্রত্যেককেই বিবাহিত জীবন গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিবাহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সংযম সম্ভব নহে, এমন ভাবিবার কোনও কারণ নাই। অতীত এবং বর্ত্তমান কালে অসংখ্য মানব ও মানবী বিবাহ না করিয়াও যে ইন্দ্রিয়-সংযমে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব পৃথিবীর কোনও দেশেই নাই। কিন্তু বিবাহিত জীবনকে স্বীকার না করার ফলে লক্ষ লক্ষ মানব-মানবী যে সংযম-ভ্রষ্ট হইয়াছে ও জীবনকে কলুষ-কালিমায় কলঙ্কিত করিয়াছে, ইহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যেখানে মানুষ ঝঞ্ঝাটের ভয়েই বিবাহ

ইন্দ্রিয়-দমনই কি বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য?

বর্জ্জন করিয়াছে, সেখানে জীব-সুলভ সুখলিপ্সা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া তাহাকে দিয়া সংযম-বিরোধী অনুষ্ঠান করাইয়া লইয়াছে এবং মানুষকে দিনের পর দিন নূতন সংসর্গের মাদকতায় শুধু আচ্ছন্নই করিয়াছে। এই সকল নরনারী একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমা বুঝিতে পারে নাই, অতৃপ্ত ভ্রমরের মত নিত্য নূতন ফুলের সন্ধান করিয়াছে। ফলে নিজের জীবনে যেমন অসংযমের অকথনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে, তেমনি আবার সমাজ-শরীরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অসংযমের ব্যাবায়ী বিষ ছড়াইয়া দিয়াছে। এই সকল স্থলে বিবাহিত-জীবন সংযম-সাধনে সহায়, একথা নিঃসন্দেহ। কারণ, ভোগলুব্ধ লম্পট মন সুখের আশায় যতই আকাশ-পাতাল ভ্রমণ করুক না কেন, বৈধ ভোগের সুযোগ পাইলে অবৈধ পথে সহজে পদার্পণ করিতে চাহে না।

কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই যে নরনারী সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে। বিবাহের দ্বারা নরনারীর দৈহিক এক-পরায়ণতা স্থাপিত হইলেও অযথা ভোগ নিবারিত হয় না। তাহা নিবারণের জন্য নরনারীর যথেষ্ট তপস্যার প্রয়োজন আছে। বিবাহ-প্রথা ভোগলোলুপ নরনারীর কামাচারকে বহুজন-সংস্পর্শ হইতেই মুক্ত করিতে পারিল কিন্তু কামাচারকে প্রেমে রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা এই প্রথাটার মধ্যে নাই, তাহা আছে তপস্যাতে। কামাচারকে একনিষ্ঠ করিবার জন্য বিবাহ-প্রথার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু এই একনিষ্ঠ কামাচারকে প্রেমে পরিণত করিয়া ভোগলুব্ধতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার সামর্থ্য বিবাহের নাই। পরন্তু তপস্যার সেই সামর্থ্য আছে। সুতরাং যদি কোনও মানব-মানবী ইন্দ্রিয়-দমনের উদ্দেশ্য লইয়া বিবাহিত জীবন

বিবাহ ও দম্পতীর দৈহিক একপরায়ণতা

গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বিবাহের মন্ত্রপড়া বা বিবাহের রেজিষ্টারী খাতায় নাম তোলাকেই শেষ কথা মনে না করিয়া তাহাদিগকে বিবাহিত জীবনে পরস্পরের সহায়তায় সাধন-ভজন, নিয়ম-নিষ্ঠা, আচার-বিচার প্রভৃতিতে যত্নপরায়ন হইতে হইবে। বিবাহ করিলেই সংযম লাভ হয় না, বিবাহিত জীবনে সাধন-ভজন করিলেই সংযম লাভ হয়।

বিবাহিত-জীবনে সংযম-লাভ তপঃসাপেক্ষ

যে ব্যক্তি বহু-পরায়ণ বা বহু-পরায়ণা হইতে পারিত, অথবা মন্দভাগ্য বশে যে ব্যক্তি ছিল বহু-পরায়ণ বা বহু-পরায়ণা, বিবাহ তাহাকে এক-পরায়ণ বা এক-পরায়ণা করিল। সুনিশ্চিতই এইটুকু বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটা বিরাট সামাজিক সুফল। কিন্তু অর্থানুকূল্য থাকিলে, দিনে, রাত্রে, সকালে, সন্ধ্যায় গণিকা যেমন সর্ব্বসময়েই সুলভ্যা, নিজ স্ত্রীকে সেই ভাবে ব্যবহার করিলে কি এই এক-পরায়ণতাও অতি কদর্য্য সংজ্ঞা লাভ করিবার যোগ্য হয় না? এই কারণেই কি কোনও কোনও চিন্তাশীল মনীষী বিবাহকে "legalised prostitution" বা আইন সিদ্ধ বা সমাজ-সম্মত স্বৈরিণী-জীবন বলিয়া গালি দেন নাই? রজস্বলা অবস্থায়, রুগ্ন অবস্থায়, গর্ভাবস্থায় যদি স্বামী অন্য নারীতে দৃষ্টি না দিয়া স্বীয় পত্নীতেই উপগত হন, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই তাহার দাম্পত্য একনিষ্ঠার পরিচায়ক হইবে কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই তাহার পত্নীর পক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন বলিয়া বর্ণিত হইবে না। ক্রুদ্ধা, শোকগ্রস্তা, ক্ষুধার্ত্তা স্ত্রীতে উপগত স্বামী দাম্পত্য একনিষ্ঠা ভঙ্গ করিয়াছেন বলা চলিবে না কিন্তু ইহা নিশ্চিতই সংযম-সাধনা নহে। বিবাহিত জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দম্পতীর পক্ষে পারস্পরিক মায়া-মমতা, সমবেদনা, সহানুভূতি এবং স্থায়ী সুগভীর

দাম্পত্য-সংযম ও শাস্ত্র-বচন

স্নেহ দিয়া থাকে। ফলে রজস্বলা, গর্ভিণী, শোকার্ত্তা এবং ক্ষুধাক্লিষ্ট পত্নী হইতে ইন্দ্রিয়-ব্যবহার স্বভাবতই দমিত হইয়া আসে। একদা এই সকল স্থলেও বেপরোয়া ইন্দ্রিয়-ব্যবহার চলিত এবং বিবাহ-প্রথা বিধিবদ্ধ হইবার পরে মানব-মানবীর পারস্পরিক সহানুভূতিই এই সকল স্থলে ইন্দ্রিয়-পরিচালনাকে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা এই সকল বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় নিষেধ-বচন রচনা করিয়াছেন, তাহা দম্পতীর পারস্পরিক সম্মতিতে এই নীতি গৃহীত হইবার অনেক পরে। সুতরাং বিবাহ দ্বারা স্বভাবতই মানুষের মধ্যে খণ্ডিত একপ্রকার সংযম স্থাপিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উন্নততর বর্গের সংযম বিবাহ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহা দম্পতীর মিলিত তপস্যায়ই সম্ভব।

সন্তান-জনন কি বিবাহের উদ্দেশ্য?

(৩) সন্তান-জনন বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিলে মানুষ নিজের মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কতক পরিমাণে ইতর জন্তু-সমূহের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। যে সকল প্রাণী ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ ব্যাপারটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, অথচ প্রকৃতির অন্ধ তাড়নায় দিবসের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে কামোন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের যে কামক্রিয়া, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণিগণের বংশরক্ষারই জন্য বিধাতার অব্যর্থ বিধান। নির্দ্দিষ্ট কাল অপগত হইলে ইহাদের কামাতুরতাও অপগত হয় এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ প্রাণিগণের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃ-ভাবের অবসান ঘটে। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগণের মধ্যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও সন্তান-জননে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পুরুষ প্রাণীরা গর্ভাধানের অব্যবহিত

পরে এবং স্ত্রী-প্রাণীরা প্রসবান্তে জীবলীলা সাঙ্গ করে। কিন্তু মানুষের কামের সহিত তাহার ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ যোগ রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ সমগ্র জীবন কামোন্মত্ত থাকিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে সে আমরণ কামদমন করিয়াও চলিতে পারে। দিবসের কোনও নির্দ্দিষ্ট ঋতু অথবা জীবনের কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়স তাহার কাম-পরিতৃপ্তির জন্য অবধারিত নাই। যৌবনের কামের চাঞ্চল্য অপরাপর প্রাণিগণেরই ন্যায় প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু এই ভরাবর্ষার উচ্ছৃঙ্খল প্লাবনকেও মানুষ চেষ্টার মত চেষ্টা করিলেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। অপরাপর প্রাণীদের মধ্যে কাম একটা দুর্নিবার অন্ধ তাড়না বলিয়াই সন্তানজনন তাহার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু মানুষ কামকে নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত করিবার পৃথক অধিকার পাইয়া সন্তান-জনন ব্যতীত কামকে অপর পরিণতিতে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "শৃঙ্গার-সাধনের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। একশ্রেণীর সাধক কামচর্চ্চাকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা সন্তান-জনন এই উভয় উদ্দেশ্যের একটিরও উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া পরমানন্দ লাভের সোপান স্বরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা এই বাংলা দেশেই করিয়াছিলেন। চিত্তের প্রত্যেকটী বৃত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরীয়-প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র এবং অন্তরের যাবতীয় সুখানুভূতি পরমসুখ-স্বরূপ শ্রীভগবানেরই নিত্য-সঙ্গ-জনিত বিমল সুখের অংশমাত্র,—এইরূপ এক দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে একদা এক শ্রেণীর সাধকেরা ইন্দ্রিয়সুখের আস্বাদনের ভিতর দিয়াই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের নিত্য-সান্নিধ্যের পরমসুখকে আয়ত্ত করিবার একটী ব্যাপক এবং বিপুল

মানুষের কামে তথা ইতর প্রাণীর কামে পার্থক্য

স্নেহ দিয়া থাকে। ফলে রজস্বলা, গর্ভিণী, শোকার্ত্তা এবং ক্ষুধাক্লিষ্ট পত্নী হইতে ইন্দ্রিয়-ব্যবহার স্বভাবতই দমিত হইয়া আসে। একদা এই সকল স্থলেও বেপরোয়া ইন্দ্রিয়-ব্যবহার চলিত এবং বিবাহ-প্রথা বিধিবদ্ধ হইবার পরে মানব-মানবীর পারস্পরিক সহানুভূতিই এই সকল স্থলে ইন্দ্রিয়-পরিচালনাকে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা এই সকল বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় নিষেধ-বচন রচনা করিয়াছেন, তাহা দম্পতীর পারস্পরিক সম্মতিতে এই নীতি গৃহীত হইবার অনেক পরে। সুতরাং বিবাহ দ্বারা স্বভাবতই মানুষের মধ্যে খণ্ডিত একপ্রকার সংযম স্থাপিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উন্নততর বর্গের সংযম বিবাহ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহা দম্পতীর মিলিত তপস্যায়ই সম্ভব।

সন্তান-জনন কি বিবাহের উদ্দেশ্য ?

(৩) সন্তান-জনন বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিলে মানুষ নিজের মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কতক পরিমাণে ইতর জন্তু-সমূহের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। যে সকল প্রাণী ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ ব্যাপারটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, অথচ প্রকৃতির অন্ধ তাড়নায় দিবসের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে কামোন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের যে কামক্রিয়া, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণিগণের বংশরক্ষারই জন্য বিধাতার অব্যর্থ বিধান। নির্দ্দিষ্ট কাল অপগত হইলে ইহাদের কামাতুরতাও অপগত হয় এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ প্রাণিগণের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃ-ভাবের অবসান ঘটে। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগণের মধ্যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও সন্তান-জননে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পুরুষ প্রাণীরা গর্ভাধানের অব্যবহিত

পরে এবং স্ত্রী-প্রাণীরা প্রসবান্তে জীবলীলা সাঙ্গ করে। কিন্তু মানুষের কামের সহিত তাহার ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ যোগ রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ সমগ্র জীবন কামোন্মত্ত থাকিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে সে আমরণ কামদমন করিয়াও চলিতে পারে। দিবসের কোনও নির্দ্দিষ্ট ঋতু অথবা জীবনের কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়স তাহার কাম-পরিতৃপ্তির জন্য অবধারিত নাই। যৌবনের কামের চাঞ্চল্য অপরাপর প্রাণিগণেরই ন্যায় প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু এই ভরাবর্ষার উচ্ছৃঙ্খল প্লাবনকেও মানুষ চেষ্টার মত চেষ্টা করিলেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। অপরাপর প্রাণীদের মধ্যে কাম একটা দুর্নিবার অন্ধ তাড়না বলিয়াই সন্তানজনন তাহার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু মানুষ কামকে নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত করিবার পৃথক অধিকার পাইয়া সন্তান-জনন ব্যতীত কামকে অপর পরিণতিতে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "শৃঙ্গার-সাধনের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। একশ্রেণীর সাধক কামচর্চ্চাকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা সন্তান-জনন এই উভয় উদ্দেশ্যের একটিরও উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া পরমানন্দ লাভের সোপান স্বরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা এই বাংলা দেশেই করিয়াছিলেন। চিত্তের প্রত্যেকটী বৃত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরীয়-প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র এবং অন্তরের যাবতীয় সুখানুভূতি পরমসুখ-স্বরূপ শ্রীভগবানেরই নিত্য-সঙ্গ-জনিত বিমল সুখের অংশমাত্র,— এইরূপ এক দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে একদা এক শ্রেণীর সাধকেরা ইন্দ্রিয়সুখের আস্বাদনের ভিতর দিয়াই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের নিত্য-সান্নিধ্যের পরমসুখকে আয়ত্ত করিবার একটী ব্যাপক এবং বিপুল

মানুষের কামে তথা ইতর প্রাণীর কামে পার্থক্য

প্রয়াস এক যুগে পাইয়াছিলেন। শৃঙ্গার-সাধকদের সেই কামচর্চ্চার মাধ্যমিকতায় প্রেমানন্দ লাভের চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ স্থলে ব্যর্থতার কণ্টক-মালা আহরণ করিলেও কদাচিৎ দুই একটী অতি বিরল ক্ষেত্রে সাফল্যযুক্ত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আবার কামচর্চ্চাকে এমন কি ইন্দ্রিয়সুখের উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া শুধু একটা লোকাচার, দেশাচার, স্ত্রী-আচার বা 'ফ্যাসানে'র অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতেও মনুষ্যজাতি সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মোটকথা, কামচর্চ্চাকে মনুষ্যজাতি পশুপক্ষ্যাদির অপেক্ষা অনেক প্রকার পৃথক্ প্রয়োজনে, পৃথক্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছে এবং করিতেছে, সন্তানজননের প্রয়োজন ব্যতীত অপরাপর প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে যাইয়া কামচর্চ্চাকে সংস্কৃত অথবা বিকৃত, উন্নীত অথবা অবনত করিয়াছে এবং করিতেছে।

শৃঙ্গার-সাধক

পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়ে যে মানব নিজ বুদ্ধি ও চিন্তা-চেষ্টাকে সর্ব্বপ্রকারে ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত করিবার অধিকার পাইয়াছে, তাহার পক্ষে পশু ও পক্ষীদের ন্যায় অন্ধ তাড়নায় সন্তান-জনন করিয়া যাওয়াকেই বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। সন্তান-জনন বিবাহের উদ্দেশ্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যও যেমন তেমন সন্তানের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। চাই সুসন্তানের জনন। যে পুত্র বলবান্, বীর্য্যবান্, চরিত্রবান্, সৎসাহসী, পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী এবং যে কন্যা বলবতী, বীর্য্যবতী, চরিত্রবতী, সৎসাহসিকা ও পরার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী,—তাহারাই সুসন্তান। যে পুত্র-কন্যা ধর্ম্মানুরাগী, অধ্যবসায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সহিষ্ণুস্বভাব ও মরণভয়রহিত,—তাহারাই সুসন্তান। যে পুত্রকন্যা জীবনের

চাই সুসন্তানের জনন

গৌরব দিয়া পূর্ব্বপুরুষদের কলঙ্ক-কালিমা ঢাকিয়া দেয় এবং পরপুরুষদের মধ্যে মঙ্গলের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে, তাহারাই সুসন্তান। যাহারা স্বার্থকে চাহিয়া বলবীর্য্যের অভাবে তাহাকে চাহিবার মত চাহিতে পারে না, আর, মেধা-মনীষার অভাবে তাহাকে বুঝিবার মত বুঝিতে জানে না, তাহারা সুসন্তান নহে। যাহারা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াও বলবীর্য্যের অভাবে সেই উৎসর্গকে বহুদেশব্যাপী এবং প্রজ্ঞার অভাবে বহুপুরুষব্যাপী করিতে পারে না, তাহারাও সুসন্তান নহে। যাহারা সহস্র বিপদেও হৃদয়ে সাহস রাখিতে পারে, মৃত্যু-মুহূর্ত্তেও বাহুতে ভীমবলের সন্ধান পায়, বজ্রপতনের মধ্যেও বুদ্ধিকে স্থির এবং লক্ষ্যকে অটল রাখিতে পারে, যাহারা নিজ হাতে মাথা কাটিয়া দিতে পারে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিতে পারে, হাসিতে হাসিতে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে, দ্বিধাহীন চিত্তে সজীব সমাধিকে আলিঙ্গন করিতে পারে,—তাহারাই সুসন্তান। যাহাদের কাছে জীবন কর্ম্ম-সংগ্রাম, মরণ নব-সংগ্রামের জন্য ক্ষণিক বিশ্রাম, যাহাদের জন্ম সার্থক মৃত্যুর জন্য এবং মৃত্যু শ্রেষ্ঠতর জন্ম গ্রহণের জন্য, যাহাদের ব্রাহ্মণত্ব শূদ্রকে নীচ হইতে উচ্চে তুলিয়া আনিবার জন্য, শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণকে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিঃশব্দে মরার মত পড়িয়া না থাকিতে দিবার জন্য,—তাহারাই সুসন্তান। যাহাদের স্ত্রীত্ব পুরুষের বন্ধন-মুক্তির জন্য, পুরুষত্ব নারীর দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য, যাহাদের স্বাধীনতা জগদ্ব্যাপী পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য, পরাধীনতা স্বাধীনতা লাভের শ্রেষ্ঠতম আদর্শতম পন্থা আবিষ্কারের জন্য,—তাহারাই সুসন্তান। আর, যাহারা ইহা নহে, তাহারা কুসন্তান। কু-সন্তানের

সুসন্তান কাহাকে বলে?

উৎপাদন কিছুতেই দাম্পত্য-বন্ধনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বিশ্ব-ব্যাপিনী কাম-তৃষ্ণাকে ইচ্ছাবলে গুটাইয়া আনিয়া একটী স্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইয়া তৎপর সাধনাসম্ভূত অব্যর্থ ইচ্ছার বলে এই কামকে হস্তধৃত যন্ত্রের ন্যায় সুসন্তান-প্রয়োজনে প্রয়োগ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। কাম যখন চরিতার্থতার বহু পথ পরিত্যাগ করিয়া একটী মাত্র পথকে অবলম্বন করে, তখনই উহা মাত্র সমাজপত্তনই করে। কিন্তু কাম যখন অন্ধ চরিতার্থতা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুষ্মানের ন্যায় নিজের কল্যাণকে, সন্তানের কল্যাণকে, এবং জগতের কল্যাণকে দেখিয়া লয়, তখন উহা আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করে।

বিবাহের উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজ সৃষ্টি

বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই আদর্শ সমাজের সৃষ্টি, যে সমাজে পিতা-মাতার হৃদয়জোড়া সদিচ্ছাগুলি সন্তান-সন্ততির জীবনের গৌরবদীপ্ত কর্ম্মে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং যুগের পর যুগে অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানকে বৃহত্তর ও মহত্তর এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎকে বৃহত্তর ও মহত্তর করিয়া তোলে। সেই সমাজের সৃষ্টি কিছুতেই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে পারে না, যে সমাজে পুত্রকন্যা পিতামাতার স্কন্ধে গুরুভার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন। য়ুরোপের তথা আমেরিকার একশ্রেণীর সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌গণ (sociologists) সন্তান-সন্ততিরূপ বিরাট আবর্জ্জনাকে পারিবারিক জীবন হইতে অপসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

পাশ্চাত্য জগতে বিবাহ-সম্পর্কিত নানা আন্দোলন

কেহ কেহ কৃত্রিম উপায়ে নারীর অপত্য-সম্ভাবনাকে নাশ করিবার জন্য নিত্য নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া পৈশাচিক আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে-ছেন, কেহ বা প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা এমন রাষ্ট্রীয়

পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, যাহাতে পিতা গর্ভাধান করিয়া এবং মাতা প্রসব করিয়াই সন্তান সম্বন্ধীয় সকল দায়িত্ব হইতে 'খালাস' পাইতে পারেন এবং রাষ্ট্র (State) নবজাত পুত্রকন্যার ভরণ, পোষণ, ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বলাই বাহুল্য যে, এই বিষয়ে য়ুরোপ বা আমেরিকার এক প্রবলাংশ জনতা ভুল পথে চলিয়াছে। সম্প্রতি ১৯৫৪ ইংরাজী সনের একটী মামলার রায়ে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের একটী সন্তান-জন্মের বৈধতা-বিচার-প্রসঙ্গে যে ঘটনার কথা জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, স্বামীর সহিত সহবাস পরিহার করিয়া অন্যতর পুরুষের শুক্র টিউবের সাহায্যে জরায়ুতে গ্রহণ করিয়াও নারীরা সন্তানবতী হইতে শুরু করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রেরই অন্যত্র এই ভাবে গর্ভধারণের কয়েকটী দৃষ্টান্তের বিবরণ সংবাদপত্র মারফৎ ইহার সাত আট বৎসর পূর্ব্বেই শোনা গিয়াছিল।

সন্তান-জননে সহবাস কি সুনিশ্চিত আবশ্যক ?

কিন্তু সাম্প্রতিক এই মামলায় ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে, ব্যাপারটা একেবারেই নিছক কল্পনার বা পরীক্ষার রাজ্যে নহে, ইহার বাস্তবিকতা রহিয়াছে। ফলে সন্তান-জননের জন্য পুরুষ-সহবাস যেমন নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল, তেমনই বিবাহও নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল। যে যে দেশে এই সকল পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ (experiments and observations) চলিতেছে, সেই সকল দেশের জনমন আস্তে আস্তে রূপান্তর পাইতে পাইতে যদি এমন সময় কখনো আসিয়া যায় যে, এই ভাবে জন্মপ্রাপ্ত পুত্রকন্যাদের সামাজিক সম্মান ব্যাহত হইবে না, তখন স্বভাবতঃ সেই সেই দেশে স্বাভাবিক পরিণতি রূপে নিম্নলিখিত দুইটী অবস্থাও হয়ত আসিয়া যাইবে। প্রথমতঃ হয়ত সামাজিক ভাবে এই স্বীকৃতি আসিয়া

যাইবে যে, বলবান্, বীর্য্যবান্, ধীমান্, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সবলেন্দ্রিয় পুত্র-কন্যাদের আবির্ভাবের জন্য এতদ্রূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুক্র প্রতি ডাক্তার-খানায় সুলভ করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে যে-কোনও নারী গর্ভধারণের প্রয়োজন হইলে একজন শিক্ষিত চিকিৎসকের সহায়তায় অনায়াসে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে। (একটী বলশালী ষণ্ডের একবারের স্খলিত শুক্রটুকুর সাহায্যে শুক্রস্খলনের বহুদিন পরেও অনেকগুলি গাভীর গর্ভধারণের প্রথা ইতিমধ্যে প্রায় সকল সভ্য দেশেই চালু হইয়াছে। সুতরাং মানুষ নিজেকে ষণ্ড আর গাভীর মত বিচার করিতে শিখিলেই এই ব্যাপারটা সম্পর্কে সর্ব্বসঙ্কোচ কাটিয়া যাইবে।) ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এই স্বীকৃতিও আসিয়া যাইবে যে, সঙ্গম-কালে সঙ্গম হইতে মানব-শরীরে যে সুখ উৎপাদিত হইয়া থাকে, সেই সুখের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অন্যায়, অপর দিকে গর্ভাধান টিউবের সাহায্যেই হইয়া যাইতেছে বলিয়া গর্ভোত্তর সঙ্গম-কালে যাহাতে পুনর্গর্ভাধানের আশঙ্কা না আসে, তাহার সুনিশ্চিত ভাবে থাকা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। এই দুইটী স্বীকৃতি আসিয়া যাইবার পরে রতি-বিষয়ে দাম্পত্য একনিষ্ঠা আদর্শ রূপে পূজিত হইতে পারে কিনা, ইহা ঘোর সংশয়ের বিষয় হইবে। ফলে, তখনও যদি বিবাহ-প্রথা একটা বদ্ধমূল প্রথা রূপেই টিকিয়া যায়, তাহা হইলে পুরুষেরা বিবাহ করিবে নারীর সম্পত্তির লোভে আর নারীরাও বিবাহ করিবে পুরুষের সম্পত্তিরই লোভে। বলিতে কি, বিবাহ-সম্পর্কিত যে-সকল আন্দোলন পাশ্চাত্য জগতে চলিতেছে, তাহাতে পাশ্চাত্য পুত্রকন্যাগণ নিজ নিজ পরমারাধ্য জননীকে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদীর শ্রদ্ধাপূত বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে না দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বভাব বৈজ্ঞানিকের বস্তুতন্ত্র প্রশ্নপরায়ণ দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিবে এবং সম্ভবতঃ করিতেছেও।

যাহারা জননীর রমণীমূর্ত্তি চিন্তা করে বা করিবে, তাহাদের আর সর্ব্বনাশের বাকী কোথায়? এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যেরা বিবাহের যথার্থ আদর্শের সন্ধান পায় নাই বলিয়া কামের পঙ্কিল আবর্ত্তেই ডুবিয়া মরিবার আয়োজন করিতেছে। য়ুরোপ ও তৎশিষ্যগণের মানসিক জগতে এখনও দেহসুখের পূর্ণ রাজত্ব চলিয়াছে বলিয়াই সন্তান-সন্ততি স্বামি-পত্নীর সুখের বিঘ্ন, তাই বর্জ্জনীয়। রক্ত-মাংসের ক্ষুধা য়ুরোপীয়-দের অস্থি মজ্জা চর্ব্বণ করিয়া খাইতেছে বলিয়াই আজও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নীতিবাদী (moralist) বা অধ্যাত্মবাদীরা (idealists) বিবাহ-সম্বন্ধে সুপ্রজননের অতিরিক্ত বড় কোনও কথা কহিতে পারেন নাই। বলিতে গেলে, সমগ্র পৃথিবীরই যাহারা সম্রাট, সেই য়ুরোপীয়দিগেরও একটু নিন্দা করিয়া লইয়াছি। কিন্তু এইটুকু রসনা-কণ্ডূয়নহেতু নহে। ভারতবাসী পাশ্চাত্যদের অপেক্ষাও বড় কথা বিবাহ সম্বন্ধে কি ভাবিতে পারিয়াছেন, তাহার ভূমিকা বা back-ground রূপে এইটুকুউল্লেখ করিতে হইল। কারণ, বিবাহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইল ভগবৎ-সাধনা বা আত্মার উদ্ধার।

বিবাহ ও সুপ্রজনন

সুসন্তান-প্রজনন ইহার তুলনায় অনেক ছোট কথা। তথাপি এই সুসন্তান জনন করিতে হইলেও বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। সন্তান পিতামাতার দেহ পায়, মনও পায়। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যাঁহারা দেহ ও মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিও প্রকৃতিবশে বিশুদ্ধ দেহ ও বিশুদ্ধ মনের অধিকারী হইবে। সংযম সাধনার দ্বারা যাঁহারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সুপুষ্ট, সুদৃঢ় এবং মনোবৃত্তিসমূহকে অনাবিল ও সুসমর্থ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিও সাধারণতঃ সবল দেহ ও সমর্থ মনেরই অধিকারী হইবে। পিতামাতার পূর্ব্বগামী

পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন জীবনের বহু অকল্যাণ হয়ত ব্রহ্মচারী পিতা ও ব্রহ্মচারিণী মাতার সম্যক্ সুবিশুদ্ধতা সত্ত্বেও সন্তানের দেহ ও মনের মন্দিরে উঁকি দিতে চাইবে, কিন্তু পিতামাতার তপঃসাধনাই সন্তানকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা বহুল পরিমাণে দান করিবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান-সংখ্যা কমাইতে গেলে মহাবীর্য্যশালী তপস্বী সন্তানের জন্মলাভ অসম্ভব। কারণ, বৈজ্ঞানিকেরা নারী এবং পুরুষের সম্মিলিত সত্তাশক্তিতে (রজোবীর্য্যকে) সন্তানরূপে পরিণত হইতে না দিয়া নারীকে প্রসবের যন্ত্রণা এবং পুরুষকে সন্তান পালনের অর্থব্যয় হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন, কিন্তু বৃথা-মৈথুনে উভয়ের দৈহিক শক্তির যে ক্ষয় হইল এবং মানসিক পবিত্রতার যে ভ্রষ্টতা জন্মিল, কোন প্রকারেই তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন না। আবার বিনা মৈথুনে বিনা স্বামি-সহবাসে টেষ্ট-টিউবের সাহায্যে গর্ভাধানের ফলে যে সন্তান জন্মিবে, তাহার কাছ হইতেও তপস্যার অনুরাগ, ঈশ্বর-সাধনে রুচি, ঈশ্বরীয় বিধানের উপরে শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করা যায় না। ব্রহ্মচারী দম্পতীর সহবাসে জাত পুত্র কেবল পিতামাতার ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুশীলনের সুফলগুলিই প্রাপ্ত হয় না, পিতা এবং মাতার মিলন-জনিত যে ঐক্যবোধ, সূক্ষ্মভাবে সে তাহারও অধিকারী হয়। সঙ্গমকালীন একাত্মবোধ সন্তানের মধ্যে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির জন্ম দেয়। সঙ্গমকালীন দ্বৈতবোধ সন্তানকে লক্ষ্যহীন ও অনেকাগ্র করে। যে সন্তানের জন্মে পিতা ও মাতা উভয়ের সম অধ্যবসায় নাই, সে সন্তান পিতা এবং মাতা উভয়ের পরিপালন ও স্নেহের সমভাবে অধিকারী হয় না। সন্তান-জনন যেখানে প্রয়োজন, স্ত্রীপুরুষের অসামান্য প্রেমপ্রসূত দৈহিক সম্ভোগও সেখানে সন্তানেরই কুশলের জন্য প্রয়োজন। তপস্বী নরনারী

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্মনিরোধ-চেষ্টা বা জন্মদান-চেষ্টা তপস্বী সন্তান লাভের সহায়ক নহে।

তাঁহাদের এই দেহ-সম্ভোগকে তপস্যালব্ধ বিমল প্রজ্ঞার আলোকে পরিচালিত করিবেন, ইহা সন্তানের কুশলের জন্যই প্রয়োজন। পিতা-মাতার দেহমধ্যস্থ যে মহাবস্তুদ্বয়ের সম্মিলনে সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ দেহ জন্মে এবং পিতামাতার মনোমধ্যস্থ যে প্রবল বৈদ্যুতিক প্রেরণাসমূহের সম্মিলনে সন্তানের জন্য সর্ব্ববিষয়ের ধারণক্ষম শক্তিমান্ মন গঠিত হয়, তাহাদের অপচয়কে স্তম্ভিত করিবার ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকের পিতামহেরও নাই। আবার, সন্তানার্থে সম্মিলিত পিতামাতার প্রেমময় মনোভাবও বৈজ্ঞানিকের টেষ্ট-টিউবের বাহিরেই থাকিয়া যাইবে। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারাই এই অসাধ্য সাধন করিতে হইবে এবং সুপুষ্ট দেহ, সুসংযত মন ও কল্যাণময়ী প্রেরণা দিনের পর দিন সঞ্চয় করিয়া উপযুক্ত কালে ইহাকে সন্তানার্থে প্রয়োগ করিতে হইবে। সন্তান-জনন যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আদর্শ সমাজে সন্তানজনন এইরূপই হইবে। পাশ্চাত্যের সৌজাত্য-বিদ্যা শূকর, গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী, খরগোশ, গিনিপিগ আদি বহু প্রাণীর বংশানুক্রমিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া জীবমাত্রেরই আশ্চর্য্য ক্রমোন্নতির সম্ভাবনার পথ দেখাইয়াছে। ভারতবর্ষের গো-জাতির বংশধরেরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া শত বর্ষেরও কম সময়ের মধ্যে বহুক্ষীরা নূতন গো-জাতির পত্তন করিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য হইলেও সত্য। পশুপক্ষীর বংশানুক্রমিক উন্নতির জন্য মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বত্রই চিত্ত-চমৎকার অধ্যবসায়ে রত। মানুষ-জাতির বংশানুক্রমিক এবম্বিধ উৎকর্ষের জন্য মানুষের আগ্রহ কোথায়? মানুষ যে দিন সুসন্তান জননের জন্য বিবাহ করিবে, এই আগ্রহ সেই দিন প্রমাণিত হইবে।

পাশ্চাত্যের সৌজাত্য-বিদ্যা

(৪) জীবন-সংগ্রামের দুঃখকষ্টের লঘুতা-সাধনও বিবাহের একটী উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু মানুষের পরিশ্রম কমাইবার যে দুইটী উপায় আছে, একমাত্র সদ্‌গৃহীর পক্ষেই সেই দুইটী সহজলভ্য, কপট গৃহীর নহে। দুঃখকষ্টের লঘুতাসাধনের প্রথম উপায়—শ্রমবিভাগ, দ্বিতীয় উপায়—কষ্টে উপেক্ষা। সাংসারিক কর্ম্মের অর্দ্ধাংশ যখন গৃহিণী নিজ স্কন্ধ পাতিয়া গ্রহণ করেন, তখন গৃহস্থের কিছু বিশ্রামের অবসর ঘটে। আবার, অত্যন্ত-পরিশ্রম-সাধ্য উপার্জ্জনাদি কার্য্য গৃহস্থের স্কন্ধেই ন্যস্ত থাকিলে গৃহিণী বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার আক্রমণ অনায়াসেই এড়াইয়া চলেন। গৃহস্থকে যদি সংসারের সকল কাজ করিতে হইত, অথবা গৃহিণীকে যদি নিজের উদর নিজে চালাইতে হইত, তবে আর কাহারও নিঃশ্বাসটুকু ফেলিবার অবসর মিলিত না। য়ুরোপে পতিপত্নী উভয়কেই উদরান্ন অর্জ্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। ফলে, হোটেলের অন্ন খাইয়াও শ্রমক্লান্ত স্বামিপত্নী পরস্পরকে বিশ্রাম ও অবসর দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। এই ভারতেও যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিকে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন করিয়া লইবার জন্য রাস্তায় বাহির হইতে না হইবে, ততদিন পর্য্যন্তই স্বামিপত্নীর মধ্যে সংসারের শ্রমবিভাগ বিদ্যমান থাকিবে এবং একে অন্যের জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হ্রাস করিতে সমর্থ হইবেন।

বিবাহ ও জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হ্রাস

জীবন-সংগ্রামের মৃদুতা সাধনের পক্ষে দ্বিতীয় উপায়টী সম্যক্ মানসিক। বিপদকে যে গ্রাহ্য করে না, তাহাকে বিপন্ন করিবে কে? মৃত্যুকে যে গ্রাহ্যে আনে না, কে তাহাকে মারিতে পারে? শ্রমে যাহার অরুচি নাই, কর্ম্মের কঠোরতা তাহাকে

কষ্টে উপেক্ষা

ক্লান্ত করিতে পারে না। বিপদের পশ্চাতে যিনি সম্পদের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, মৃত্যুর পশ্চাৎ হইতে যিনি অমৃতের আহ্বান শুনিতেছেন, বিপদ ও মৃত্যু তিনি ত' তুচ্ছ করিবেনই। সদ্‌গৃহী ও সদ্‌গৃহিণীর মধ্যেও পরস্পরের যে বিশুদ্ধ প্রেম বর্ত্তমান থাকে, তাহারই শক্তিতে তাঁহারা সকল দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া চলেন। প্রাণান্ত শ্রমে ক্লান্ত হইয়াও যখন গৃহী তাহার প্রেমপ্রতিমা সহধর্ম্মিণীর হাস্যমধুর মুখখানির কথা মনে করে, দুর্ব্বল হৃদয়ে সে নববল পায়। রোগশীর্ণ, দুঃখজীর্ণ, অবশ দেহে শ্রম করিতে করিতে কাতর হইয়াও গৃহিণী যখন তাহার প্রাণদেবতা হৃদয়স্বামীর জীবন-জুড়ান সস্নেহ দৃষ্টিটুকুর কথা ভাবে, সে যেন নবজীবন লাভ করে। প্রেম দুঃখকে জয় করিবার ক্ষমতা দেয়, প্রেম অগ্নির দাহিকা শক্তিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, প্রেম তুষারের শীতলতাকে বাষ্পীভূত করে। যেখানে স্বামিপত্নীর পরস্পরের মধ্যে সহৃদয় সহযোগিতা নাই এবং যেখানে নিবিড় প্রেম নাই, সেখানে জীবন-সংগ্রামে মৃদুতা লাভ করে না,—দুঃখের পর দুঃখ বাড়িয়াই চলে। স্বামিপত্নীর মধ্যে প্রকৃত মমত্ববোধ থাকা চাই, একে অন্যকে যথার্থ আপন বলিয়া জানা চাই, নতুবা, হয় শৃঙ্খলিতা নারী পুরুষের অবিবেকী অত্যাচারে জর্জ্জরিতা হইয়া জীবনকে দুঃসহ ও দুর্ব্বহ বোধ করিবে অথবা কটুকাট্য-পীড়িত তর্জ্জনক্লিষ্ট স্বামী বিবাহকে অভিসম্পাত বলিয়া মনে করিবে। স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে প্রকৃত সমবেদনার অভাব বলিয়াই আজ একদিকে যেমন শত শত নির্য্যাতিতা নারীর অশ্রুধারায় ভারতের গৃহতল সিক্ত হইতেছে, আর একদিকে তেমনই মর্ম্মাহত ব্যথিত পুরুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় ভারতের আকাশ প্রতপ্ত হইতেছে। উভয়ের মধ্যে

দুঃখের লঘুতা সাধনে প্রেমের শক্তি

শ্রমবিভাগের যথার্থ মর্য্যাদা ও সীমা নির্দ্দেশ করিতে আজ সমাজ-সংস্কারকের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু একটুখানি সহানুভূতির, একটুখানি মমত্ববোধের। গৃহীর গৃহছাদের তল হইতে দুঃখ-কষ্টকে নির্ব্বাসিত করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, কোনও যোগীর নাই, দণ্ডীর নাই, সাধুর নাই বা নেতার নাই,—আছে শুধু একমাত্র সহানুভূতির। পুরুষ যখন নিজের স্বার্থের কথা কম করিয়া ভাবিয়া নারীর স্বার্থের কথা বেশী করিয়া ভাবিবে, আবার নারী যখন নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কম করিয়া হিসাবে আনিয়া পুরুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই বেশী চিন্তা করিবে, সেইদিনই গৃহিজীবন তাহার দুঃখ-দুর্গতির স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা দূরে অপসারিত করিয়া শান্তির সুবিমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

প্রেম চাই, নতুবা উদ্ধার নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার ক্ষুধা কমাইয়া জীবন-সংগ্রামের আক্রমণকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছেন, কৌমার্য্যের একাগ্রতার মধ্য দিয়া ভগবান্‌কে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিয়া কঠোর কষ্টকে অগ্রাহ্য করিবার সামর্থ্য পাইয়াছেন। গৃহীকে ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে কমাইয়া দিলে চলিবে না, ভগবানকে ভালবাসিতে গিয়া স্বামীর পক্ষে পত্নীবর্জ্জন এবং পত্নীর পক্ষে স্বামিবর্জ্জন করিলেও হইবে না। সকল ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়াই, সকল আকূতি-কাকুতি লইয়াই, সকল প্রবৃত্তির কোলাহলের মধ্যেই তাহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, স্ত্রীকে লইয়াই স্বামীকে এবং স্বামীকে লইয়াই স্ত্রীকে ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। তাহাদের আজ সহানুভূতি চাই, তাহাদের আজ প্রেম চাই। কিন্তু পত্নীর পক্ষ লইয়া বিধবা মাতা, ভগ্নী বা ভ্রাতৃজায়ার অপমান করিবার নাম দাম্পত্য মমত্ববোধ নহে, পত্নীর অসুস্থতার

অপ্রাকৃত দাম্পত্য প্রেমের লক্ষণ

অজুহাতে পিতৃমাতৃহীন অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রদের বা অন্যান্য অনুজীবীদের উপরে অমানুষ অত্যাচার করার নাম দাম্পত্য সহানুভূতি নহে, পত্নীর ভরণপোষণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপলক্ষে সহোদর ভ্রাতাকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, করার নাম পত্নী-প্রেম নহে। আবার স্বামীর স্বার্থ-সংরক্ষণের নাম করিয়া নারীজনোচিত স্বাভাবিক কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতির সমক্ষে সম্মার্জ্জনীহস্তে রণ-চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ করার নামও স্বামি-প্রেম নহে। যথার্থ প্রেম সাধন-সাগরের মন্থনোত্থ অপূর্ব্ব অমৃত। স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে এই প্রেমামৃতের সঞ্চারের জন্য সর্ব্ব-প্রকার অযথা মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একভাবানুগ একপন্থানুগ ভগবৎ-সাধনের আবশ্যক। যেদিন এই অনাবিল সুবিশুদ্ধ সুপবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে, সেই দিনই একে অন্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইবে এবং এই ভাবেই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। হে ভারতের আত্মবিস্মৃত যুবকযুবতীগণ! তোমরা আজ স্থির চিত্তে এই কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা কর! বহু-সন্তান-পরিবৃত হইয়া তোমরা যে দিনের পর দিন জীবনকে মরুভূমি করিয়া তুলিতেছ, অপ্রাকৃত সুখ-সৌভাগ্যের পশ্চাতে মরীচিকা-লুব্ধ মৃগের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে যে প্রকৃত সুখ-সৌভাগ্যে চিরবঞ্চিত রহিয়া যাইতেছ, সেই নিদারুণ অধঃপতনের গতিবেগ লক্ষ্য করিয়া আজ সাবধান হও, অযথা মৈথুন সঙ্কল্পপূর্ব্বক পরিহার করিয়া বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত কর, আপ্রাণ প্রয়াসে নিজেরা যথার্থ মনুষ্যত্বের গরীয়ান্ গৌরবে দীপ্যমান হও এবং দাম্পত্য পবিত্রতার অমর্য্যাদাকারী শত শত

প্রকৃত প্রেম লাভের পথ অযথা মৈথুন ত্যাগ ও ভগবৎ-সাধন

অসংযত অমানুষকে তোমাদের আদর্শ জীবনের অপরাজেয় প্রভাবে সুষ্ঠুরূপে গড়িয়া তুলিতে যত্নবান্ হও। নিশ্চিত জানিও, যত বুদ্ধিমানেরই আবিষ্কার হউক না কেন, কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা কখনই জীবনসংগ্রামের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দূরীভূত করা যাইবে না, বিজ্ঞানের বলে চখের জল ও বুকের ব্যথার প্রশমন হইবে না।

ভগবৎ-সাধনাই বিবাহের উদ্দেশ্য

(৫) ভগবৎসাধনাকেই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় একমাত্র তান্ত্রিক যোগাচার্য্যেরা ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তেমন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন নাই। সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতারাই বিবাহকে একটা পরম পবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—"বিবাহ করিয়া নিজ স্ত্রীতে অনুরক্ত থাক, তাহা হইলে ব্যভিচার-পাপে লিপ্ত হইবার আশঙ্কা কমিয়া যাইবে, পরস্ত্রীতে রুচি ধাবিত হইবামাত্র নিজ স্ত্রীর প্রতি সৌহার্দ্দ বর্দ্ধনের দ্বারা মনকে বিপথ হইতে টানিয়া আন।" তাঁহাদের মতে বিবাহ ব্যভিচার-প্রশমক অনুষ্ঠান বলিয়া অতীব ধর্ম্মকার্য্য। কেহ বলিয়াছেন,—"বিবাহ করিলে তোমার সন্তানদের দ্বারা জগতে ধার্ম্মিক লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে জগতে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে।" তাঁহাদের মতে এইজন্যই বিবাহ ধর্ম্মজনক ও পুণ্যবর্দ্ধক। কেহ বলিয়াছেন,—"বিবাহের ফলে পুত্র-কন্যা জন্মিলে তাঁহাদের সেবা-যত্ন প্রভৃতির মধ্য দিয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে নিঃস্বার্থ-পরতার অনুশীলন করিতে হয়, তাহা ব্যক্তিগত ভাবে তোমার নৈতিক ও আত্মিক মঙ্গল সাধন করিবে এবং সামাজিক ভাবে সমগ্র মানব-জাতিকে উপকৃত করিবে।" তাঁহাদের

মতে এই জন্যই বিবাহ একান্ত অভিপ্রেত কার্য্য। কেহ বলিয়াছেন,—"বিবাহ করিলে ধর্ম্মযোদ্ধা বা দেশরক্ষী সৈনিকের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিবে এবং তাহাতে সম্প্রদায়ের বা দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।" কিন্তু বিবাহিত জীবনের গোপনতম অংশটুকুকেও ভগবৎসাধনা বলিয়া অকুতোভয়ে

বিবাহ ও তন্ত্রশাস্ত্র

প্রচার করিতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র ব্যতীত আর কেহ তেমন সাহসী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভারতে যখন তন্ত্রধর্ম্মের উন্মেষ হইল, তখনই স্বামিপত্নীর মৈথুনকে পূজা, অর্চ্চনা ও ভোগারতির ন্যায় সম্মানপূর্ণ স্থান দান করা হইল। তান্ত্রিকদের এই সাহস যে অতীব দুঃসাহস, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগ-রূপ ঘনিষ্ঠ কার্য্যকে আত্মিক সাধনার অঙ্গ বা উপায়-রূপে প্রচার করার ফলে বহু সরলপ্রাণ ব্যক্তি পাপের পল্বলে ডুবিয়া মরিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ কিন্তু "যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্—যাহাই আমি করি, তাহাই জগন্মাতার পূজা" এই ভাব লইয়া অগ্রসর হইবার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই সাহসের ভাল দিকটা একেবারে উপেক্ষায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না। জগতে কোটি কোটি নরনারী স্বভাবতই বিবাহও করিবে এবং বিবাহের পরে স্বামিস্ত্রীতে মিলিত হইয়া সম্ভোগও করিবে। তন্ত্র-ধর্ম্মের দুঃসাহসের ভালর দিক্‌টা এই হইল যে, বিবাহিত নরনারী সাংসারিক প্রয়োজন হিসাবে মৈথুনে রত হইলেও ইহাকে ভগবচ্চিন্তা দ্বারা বিশোধিত করিয়া যত্নবান্ রহিয়া মনকে সাধ্যমত পঙ্কিলতা প্রমুক্ত করিবে। তান্ত্রিকেরা নিজেরা মরিয়াও অপরকে বাঁচাইবার জন্য এই দিক্-প্রদর্শন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে প্রাগ্‌বৈদিক যুগে বিবাহ প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক মিলন, বৈদিক যুগে প্রধানতঃ সন্তানোদ্দেশ্যযুক্ত মিলন এবং প্রায় সকল যুগেই অল্পবিস্তর

শ্রমবিভাগমূলক মিলন ছিল। কিন্তু তান্ত্রিকের পক্ষে ইহা হইল একটি অভিনব সামগ্রী। **তান্ত্রিক সাধক বলিলেন,**—"ইন্দ্রিয়তৃপ্তিও আমার উদ্দেশ্য নয়, সন্তান-জননও আমার উদ্দেশ্য নয়, শ্রমবিভাগও আমার উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু, আমার উদ্দেশ্য নিজের অভাবকে পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া, নিজের অসম্পূর্ণতাকে অপর কাহারও সম্পূর্ণতা দিয়া দূর করিয়া দেওয়া। যিনি আমার এই পরিপূর্ণতা সাধন করেন, তাঁহাকে আমি স্ত্রী বলি না, তাঁহাকে আমি বলিতে চাহি আমার শক্তি। যত প্রকারে তাঁহার সহিত আমার সহযোগ সম্ভব, প্রত্যেকটি প্রকারের মধ্য দিয়াই আমি ভগবৎ-সাধনাই করিয়া থাকি, ইহাতে ইন্দ্রিয়সুখ হইল কি না, সন্তানোৎপত্তি ঘটিল কি না প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় ভাবিবার আমার অবসর কোথায়?" **তান্ত্রিক সাধিকা বলিলেন,**—"তোমরা যাহাকে বিবাহ বল, তাহাকে আমরা বিবাহ বলিয়া মানি না; আমরা জানি, ইহা নিত্য পুরুষের সহিত নিত্য প্রকৃতির মিলনাভিসার। আমি যখন আমার স্বামীকে আমার মন ও আত্মা দিবার সময়ে ভগবানেরই স্পর্শ পাই, তখন দেহদানের সময়েও কেন না ভগবানের স্পর্শ পাইব? যদিও আমার দেহ প্রাকৃত পদার্থ, তথাপি, এই দৈহিক মিলনের পশ্চাতে অপ্রাকৃত নিত্য লীলা চলিতেছে এবং ভগবৎ সাধনারই জন্য দেহকে সর্ব্বথা নিয়োজিত করিয়া আমরা প্রাকৃত দেহকেও অপ্রাকৃত গৌরবের আস্পদ করিয়াছি। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বা সন্তানজননের জন্য মৈথুন পশুপক্ষীতেও করে, পরন্তু, আমাদের মৈথুন সর্ব্ববিধ লৌকিক-উদ্দেশ্য-বিরহিত, আমাদের ইন্দ্রিয়-পরিচালনা অতীন্দ্রিয় সত্তারই অনুভূতির জন্য।"

তান্ত্রিকের আচার অতিশয় বীভৎসতা-সঙ্কুল হওয়ায় তন্ত্রধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তান্ত্রিক সাধকেরা মৈথুনের এই যে কৌলীন্য দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎ সংসারাশ্রমী মানবগণের মধ্যে পরোক্ষভাবে শুভসাধনার প্রেরণা জাগ্রত করিতে ভুলিবে না। এমন এক অভাবনীয় মহাযুগের অরুণোদয় এই জগতে শীঘ্রই হইতেছে, যখন সকল ধর্ম্মের সকল বিরোধ সামঞ্জস্যীভূত হইয়া মানুষ মাত্রকেই পরমধর্ম্ম মানব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে এবং বৌদ্ধাচারী ও তন্ত্রাচারী বেদ-বিরুদ্ধতা পরিত্যাগ করিবে, কোরাণ-ধর্ম্মী বাইবেল-বিদ্বেষে বিরত হইবে, জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের বৈষম্য নিরাকৃত হইবে। এক মহাসমন্বয়ের যুগ যেন বিষ্ণুবাহন গরুড়ের দুইপক্ষ স্বরূপ নারী ও পুরুষে ভর করিয়া বাত্যাবিক্রমে ছুটিয়া আসিতেছে এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা দেখিতে পাইয়াই যেন তান্ত্রিক সাধকেরা বলিয়াছিলেন,—"মৈথুন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিও নহে, অধর্ম্মও নহে, ইহা ধর্ম্মেরই অঙ্গ, ধর্ম্মেরই সাধন।" কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনার জন্য স্ত্রীকে পুরুষ-সহবাস, পুরুষকে স্ত্রী-সঙ্গম করিতেই হইবে, তান্ত্রিকের এইরূপ কোনও ইঙ্গিতকে বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মবুদ্ধির ও নৈতিক বিচারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাস্তব জীবনে গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে হইবে। পরন্তু, সাধারণ মানবমাত্রকেই যে বিবাহিত জীবন গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে দম্পতীর আবশ্যকীয় ঘনিষ্ঠ ব্যবহার-সমূহকে যে সৎসঙ্কল্পের বলে ধর্ম্মময় ও ধর্ম্মজনক করা যাইতে পারে, এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায়ই তন্ত্রের পরোক্ষ প্রেরণা শুভময়ী হইতেছে। আধুনিক জীবন-যাপনকারী আদর্শ

তন্ত্র-ধর্ম্মের শুভময়ী প্রেরণা

গৃহস্থের উপরে ইহাই তন্ত্রের দান। কিন্তু তান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটিতেছে। যে অতীতের গর্ভে বৈদিক যুগ সমাহিত হইয়াছে, তান্ত্রিক যুগও তাহারই উদার উদরে ডুবিতে বসিয়াছে, কারণ, এ জগতে আচারের নিত্যত্ব নাই, সত্যই নিত্য। বৈদিকের আচার গিয়াছে, বৌদ্ধের আচার গিয়াছে, সত্যই রহিয়াছে। তন্ত্রেরও আচার গিয়াছে, এখন সত্যটুকু রহিয়াছে। নিজস্বতাকে প্রসারিত করিবার জন্য তন্ত্রের তত্ত্ব ও আচার বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল এবং তান্ত্রিক কুলাচার, বীরাচার, বামাচার প্রভৃতিই কিশোরী-ভজন, কর্ত্তাভজা, বাউল প্রভৃতি নানা নাম ধরিয়া রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রতিষ্ঠার যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং যে পরম সত্য প্রত্যেকটী নবোদিত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আবর্ত্তন ও আলোড়নের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, তাহাই আজ সকল বৈপরীত্য ও আপাতদৃষ্ট বিরুদ্ধতার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া সর্ব্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়া যেন নবতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন এবং এই বিগ্রহের অস্থি-সংযোজন-কালে যেন কাহার বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠ জগতের সকল কোলাহলকে স্তম্ভিত করিয়া বলিতেছে,—

আচার নিত্য নহে, সত্যই নিত্য

তান্ত্রিক তত্ত্বের বহুপ্রসারিণী গতি

"বিবাহের উদ্দেশ্য ভগবৎ-সাধনা, নরনারীর মিলনের মূলে ভগবৎ-সাধনা, অপত্যোৎপাদন ভগবানকে পাইবার জন্য, সন্তান-পালন ভগবানকে বুকে ধরিবার জন্য। ভগবান আজ মনুষ্য-জীবনের কদর্য্যতম প্রবৃত্তির মূলেও নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, মৈথুনরত নরনারীর কামের পূতিগন্ধের মধ্য দিয়াও স্বকীয় অঙ্গের প্রাণমনোহারী সুমধুর

বিবাহের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সর্ব্ব-সমন্বয়ী শ্রেষ্ঠ মত

পদ্মগন্ধ ছড়াইতে চাহিতেছেন। নবজাগ্রত যুগের ভারত-সন্তান ইহা বিস্মৃত হইও না।"

ভগবানকে লাভ করিবার জন্য প্রত্যেককেই যে বিবাহিত হইতে হইবে, এমন নহে। চিরকুমার ও চিরকুমারী যে কেহ থাকিবেন না, এমন নহে। নিজ শক্তি, সামর্থ্য, রুচি, প্রকৃতি, সংস্কার ও প্রবৃত্তির বেগাবেগ বুঝিয়া, বলাবল বুঝিয়া, আত্মার উদ্ধার এবং জগতের উদ্ধারে একদল মহামানব ও মহামানবী চিরকালই জগতে সন্ন্যাসের গরীয়ান্ গৈরিক পতাকা উড্ডীন করিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইবেন, সন্দেহ নাই। মানুষমাত্রেরই পক্ষে বিবাহ যে বিধি-নির্দ্দিষ্ট অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধি এবং বিবাহিত না হইলেই যে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধতা করা হয়, এইরূপ যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া একদল তেজস্বী, বীর্য্যবান, মনঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং নারী চিরকালই তাঁহাদের তপস্তেজোদীপ্ত মহিমান্বিত জীবন সন্ন্যাসরূপ জগৎকল্যাণ-আদর্শের চরণে সমর্পণ করিয়া বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দনে শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিবেন।

ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যক্তিমাত্রেরই কি বিবাহ আবশ্যক?

কিন্তু ভগবান্ আজ শুধু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ের কামলেশবর্জ্জিত জ্ঞানশুভ্র অজিনাসন অধিকার করিতে পারিয়াই তুষ্ট নহেন; যাহার হৃদয় নিয়ত বিক্ষোভে চঞ্চল, নিয়ত আসক্তিতে মলিন, সেই সংসারসেবীর হৃদয়টীকেও নিজ হাতে জঞ্জালমুক্ত করিয়া, চরণস্পর্শে বিক্ষোভহীন করিয়া দয়াল ঠাকুর সেখানে বসিতে চাহেন। প্রেমের ঠাকুর আজ গার্হস্থ্যে ও সন্ন্যাসে সমান সৌরভ পাইতে চান। তাই

ভগবান আজ গৃহীর জীবন-মধ্যেও ফুটিতে চাহেন

আজ যাহারা বিবাহ করিবেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে পাইবার জন্যই বিবাহ করিবেন, স্বামী উত্তরসাধিকা স্বরূপে পত্নী গ্রহণ করিবেন, পত্নী উত্তরসাধক স্বরূপে স্বামী গ্রহণ করিবেন এবং একে অন্যের সাহচর্য্যের মধ্যবর্ত্তিতায় পরস্পরের দেহে, পরস্পরের মনে, পরস্পরের উৎকর্ষে এবং পরস্পরের প্রশান্তিতে শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন।

"উত্তর-সাধক" ও "উত্তর-সাধিকা" কথা দুইটী এস্থানে একটু প্রণিধান-যোগ্য। জীবনের চরম চরিতার্থতাকে লাভ করা যখন স্বামীর পরমৈকলক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য-লাভ-কল্পে প্রাণপাত প্রয়াসে যখন তিনি যত্নপরায়ণ, তখন তাঁহাকে বলা চলে,—"সাধক"। স্বামী যে পরম লক্ষ্যকে আয়ত্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, নিজ-সুখ-কামনায় অক্লেশে জলাঞ্জলি দিয়া, নিজের ব্যক্তিগত সাধ, আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তির দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নিজের প্রার্থিত সকল কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি ও ভোগ হইতে নিজেকে সম্যক্ বঞ্চিত করিয়া স্বামীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাকে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিবার জন্য নিজেকে দুঃখ দিয়াও যখন স্ত্রী সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর ন্যায় জাগ্রত, উদ্যত ও প্রস্তুত, স্বামীকে বিপদ হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাঁর চেষ্টার নাই অন্ত, যত্নের নাই ত্রুটী, অবসাদগ্রস্ত স্বামীর বাহুতে উৎসাহের বিদ্যুৎ-সঞ্চারণায় যাঁর কৃতিত্বের নাই তুলনা, নিয়ত মাভৈঃ-বাণীতে যিনি স্বামীর সাধন-পথের সকল শঙ্কা, সকল ভয়, সকল আতঙ্ক, সকল আশঙ্কা, সকল সংশয়, সকল সন্দেহ হরণ করেন এবং ইহাই যিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে,—"উত্তর-সাধিকা"। আবার, মনুষ্য-জন্মের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা ভগবদ্দর্শনকে আয়ত্ত করিবার জন্য স্ত্রী যখন নিঃশেষে আত্মোৎসর্গশীলা,

উত্তর সাধক ও উত্তর সাধিকা

—তখন তাঁহাকে বলা চলে—"সাধিকা।" স্বামী যখন নিজসুখ-লালসায় শত পদাঘাত হানিয়া আত্মসুখের সুযোগ হইতে স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অহোরাত্র সহধর্ম্মিণীকে তাঁহার জীবনৈকলক্ষ্য সাধনের সহায়তা ও আনুকূল্য প্রদান করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে বলা চলে "উত্তর-সাধক।" আদর্শ দম্পতির জীবন এই উত্তর-সাধক ও উত্তর-সাধিকারই জীবন।

(৬) বৈদান্তিক দৃষ্টি দিয়া জগৎকে দেখিতে হইলে এক ছাড়া দুই-এর অস্তিত্বই নাই। সুতরাং যেখানে যাহা আছে দুই, তাহাই মিলিয়া এক হইতে চাহিবে, ইহা ত এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

যাহা কিছু জানিতেছি, দেখিতেছি, সবই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত ভিন্নরূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া ইহারা প্রতীত হয়। এই যে ভিন্নতার প্রতীতি, তাহাই অবিদ্যা।

অবিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডকে ছাইয়া রাখিয়াছে, তাই স্বামী নিজেকে স্ত্রী হইতে পৃথক্ এবং স্ত্রী নিজেকে স্বামী হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন। এই ভিন্নতা-বোধ একের প্রতি অপরকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণ তাহাদিগকে পরস্পরের সন্নিকট হইতে সন্নিকটতর করিয়া থাকে এবং দেহ দ্বারা দেহ নিবিড়তম নৈকট্যে আসিয়াও দেখে যে, আরও পথ পর্য্যটন করিতে হইবে, এখনও একে অন্যকে পায় নাই, এখনও একজন অপরজনের হাতের নাগালে আসে নাই। "পাইয়াছি" "পাইয়াছি" মনে হইতেছে কিন্তু এখনো পরস্পরের কাছ হইতে অনেক দূর। তখন উপলব্ধির মধ্যে আসে যে, স্বামী হইতে বিরহিত হইয়া স্ত্রীর কোনও স্বরূপ নাই, স্ত্রীর স্বরূপ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বামীর কোনও অস্তিত্ব নাই। উভয়ে এক, অভিন্ন, অপৃথক্ পরম সত্তা। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দুইটী জীব নিজেদের এই পরম-সত্তাকে আস্বাদন করিয়া যে অতুলন তৃপ্তির অধিকারী

দাম্পত্য-জীবন ও বেদান্ত-তত্ত্ব

হন, তাহাতেই চিরস্থির স্থিতিলাভের নাম বিবাহ, অথবা তাহাতে চিরস্থির স্থিতিলাভই বিবাহের উদ্দেশ্য।

বিবাহের উদ্দেশ্যকে এই একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টিকোণ হইতেও বিচার করা যাইতে পারে।

হিন্দু-নারীর একটী বদ্ধমূল বিশ্বাস

হিন্দুর সংসারে একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস সচরাচর লক্ষ্য করা যায় যে, যে দম্পতি পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ়রূপে প্রীতিশীল, সেই দম্পতি মৃত্যুর পরে দুইটী ভিন্ন আত্মারূপে না থাকিয়া একটী আত্মায় পরিণত হন। প্রকৃত বিবাহে স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে একত্বের অনুভূতি এত অগাধ যে, দেহধারী রূপে অবস্থান-কালে একে অন্যকে নিজ হইতে অপৃথক্ ও অভিন্ন অদ্বৈত-সত্তা বলিয়া অনুভবের পরে একথা বিশ্বাস করাই অতি স্বাভাবিক হইয়া থাকে যে, দেহ-পরিহারের পরে ইঁহাদের দুইটী আলাদা অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ইঁহাদের দুইটী অস্তিত্ব মিলিয়া একটী মাত্র সুখময় সত্তায় পরিণত হইয়া যায়। যেখানে ইহাই হয় ভবিতব্য, সেখানে সেই যুগ্মতার প্রাণস্পন্দনে দ্বৈতবোধের রেখামাত্রও থাকে না এবং সেই আত্মা নবদেহ ধারণ করিলে, তিনি নারীদেহ বা পুরুষ-দেহ যাহাই ধারণ করুন না, জৈব চাঞ্চল্যের তিনি ঊর্দ্ধে থাকেন।

সাধারণ হিন্দু এই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, বিদ্রূপও করেন না, অনাদরও করেন না।

কিন্তু কর্ম্মফল-বাদী ব্যক্তিরা একটী আপত্তিও উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, স্বামী এবং স্ত্রী এই দুইটী জীব একই সংসারে বাস করিলেও উভয়ের কর্ম্মফল কখনও এক হইতে

পারে না। কেবল শারীরিক কর্ম্মের দ্বারাই কাহারো পরকালের গতি নির্দ্ধারিত হয় না, মানসিক কর্ম্মও কর্ম্ম। মনের চিন্তায় পার্থক্যহেতু স্বামী এবং পত্নীর গতি আলাদা হইয়া যাইতে পারে।

দম্পতি ও কর্ম্মফল

আবার পুনর্জ্জন্ম-বিশ্বাসীরা বলিবেন, একই সঙ্গে একই গৃহছাদতলে সমগ্র জীবন যাপন করিয়া একই শয্যায় সমগ্র জীবন ঘুমাইয়া নিজ নিজ কর্ম্মফলহেতু স্বামী একটী মূষিক এবং পত্নী একটী মার্জ্জাররূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন এবং পরজন্মে তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রীতির না হইয়া ভক্ষ্য-ভক্ষকেরও হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এই সকল যুক্তির পরেও প্রগাঢ় প্রেমিক দম্পতির মন হইতে তাঁহাদের পরিপূর্ণ ঐক্যের সম্ভাবনা-সম্পর্কিত বিশ্বাস তিলমাত্র শিথিল হয় নাই। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি ত কেবল কল্পনায়ই নহে। প্রকৃত দম্পতি কেবল নিজেদের পরিপূর্ণ ঐক্যের সম্ভাবনাকেই স্বীকার করেন, তাহা নহে। এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের অনুভব আরও বিচিত্র। স্বামীর হৃদয়-গুহায় স্ত্রীই ত গিয়া বসিয়া আছেন হৃদয় আবরিয়া, স্ত্রীর সেই অবিকল্প স্বরূপ স্ত্রীর এই বিকারশীলা পরিবর্ত্তনময়ী মূরতিকে প্রবল আকর্ষণে ডাকিয়া বলিতেছে,—"আয় ত্বরা করিয়া, জীবননাথের কাছ হইতে কতকাল দূরে থাকিবি?" স্ত্রীর হৃদয়-গুহায় স্বামীই ত গিয়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন প্রসারিত বাহুতে, স্বামীর সেই নিত্য-স্বরূপ স্বামীর এই জন্মজরাশীল ভঙ্গুর মূর্ত্তির প্রতি প্রেমবিগলিত আহ্বান জানাইয়া বলিতেছে,—"সময় নষ্ট করিও না, প্রাণবল্লভার নিকটে দ্রুত চলিয়া আইস।" নিজের মধ্যে নিজেকে না দেখিয়া স্ত্রী স্বামীকে দেখিতেছেন, নিজের মধ্যে নিজেকে স্বামী স্ত্রীকে দেখিতেছেন। অন্তরের দিক দিয়া মিলনের আকাঙ্ক্ষা

এত প্রবল হইয়াছে যে, দেহ দেহকে ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইতেছে দেখিয়া আত্মা দেহের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া আগেই গিয়া স্বামীর ঘরে পৌঁছিয়াছে বা স্ত্রীর বুকে বসিয়াছে। কাব্য-রসময় বিচিত্র এ অধ্যাত্ম-জীবন!

স্ত্রী স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয় কেন? স্বামীই বা স্ত্রীর প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়? কেন তারা দেহ দিয়ে দেহকে সন্নিহিত করে, কেন তাহারা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে শতবার নিজেদের বেষ্টিত করিয়া ধরিয়াও আবার তাহাই করে? কি হইতে পারে এই তীব্র আকর্ষণের হেতু? ইহা কি কেবলই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা? ইহা কি কেবলই অভ্যাসের দাসত্ব? ইহা কি কেবলই কতকটুকু সুখপ্রাপ্তির ছলনা? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ যৌন-বিশারদেরা নারী ও পুরুষের নিভৃত জীবন নিয়া লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, কিন্তু এই আকর্ষণের হেতু কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। যিনিই এই প্রশ্নটী ধরিয়াছেন, তিনিই শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বলিতে না পারিয়া আফশোষের সহিত লেখনী অন্য দিকে পরিচালিত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসাই নর-নারীর সকল সম্পর্কের উপরে পূর্ণ মীমাংসা।

গ্রীক্ দার্শনিক প্ল্যাটো এই বিষয়ে একটি বিশেষ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, সুদূর অতীত কালে পুরুষ এবং নারীর দুইটী ভিন্ন দেহ ছিল না, তাহারা ছিল এক। দেবতাদের ক্রোধে ও অভিশাপে একজন ভাগ হইয়া দুইজন হইলেন, তাহার পর হইতে এক জনের সহিত অপর জন মিলিত হইবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া কেবল চেষ্টা করিতেছেন। ইহাই পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের সুতীব্র আকর্ষণের কারণ।

প্ল্যাটো

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থেও পুরুষের একখানা বক্ষপঞ্জর দিয়া নারীর দেহ নির্ম্মিত হওয়ার কথা জানা যায়।

এই সকল বিশ্বাস একটী দৃঢ়মূল সত্যেরই ছায়ামাত্র যে, নারী এবং পুরুষ স্বরূপতঃ এক এবং সেই একত্বকে সুদীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের দ্বারা নিজেদের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনেই বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। সকল প্রাণীর মধ্যেই পুরুষ-প্রাণীর প্রতি স্ত্রী-প্রাণীর এবং স্ত্রী-প্রাণীর প্রতি পুরুষ-প্রাণীর আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু মানুষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের এই পারস্পরিক আকর্ষণ এমন কেন হইল যে, একজন অপর জনকে পাইবার পরে সমগ্র-জীবন-ব্যাপী সম্বন্ধের স্বীকৃতি আসিয়া যায়? পশু-পক্ষীরা সম্ভোগার্থেই মিলিত হয়, অন্ধের মতই যৌন বিলাসে প্রমত্ত হয়, স্ত্রী-প্রাণীর গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়া যায় যে, উভয়ের মধ্যে আর কোনও সম্পর্ক আছে। মানুষের কেন তাহা হয় না? একবার যাহার সহিত ইন্দ্রিয়-মিলন ঘটিয়াছে, কেন মানুষ তাহাকে সহজে ভুলিতে পারে না? একান্ত রুগ্নমনা ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর সকলেরই উপরে কাম-ক্রিয়ার মানসিক প্রভাব দূরান্তব্যাপী। একবার যাহার দেহ সংসর্গ করিয়াছে, তাহার স্পর্শের অনুভূতি দশটী বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের প্রতি রোমকূপে বহন করিয়া বেড়াইতেছে, এমন পুরুষ বা নারী জগতে দুর্ল্লভ নহে। এই কারণেই আদি মানব পশু-পক্ষীর মত জীবন-যাপন আরম্ভ করিয়াও চিরকাল পশুপক্ষীর মত থাকিতে পারিল না। এই কারণেই, যাহার সহিত ভোগ-সুখ-প্রমত্ততায় দুই ঘণ্টার জন্য আত্মীয়তা হইবার কথা, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মানুষ ঘর বাঁধিল, সংসার রচিল, আমৃত্যু একনিষ্ঠায় তাহার সহিত সম্পর্ক

নারী-পুরুষের দুর্ব্বার আকর্ষণের হেতু কি?

কেন মানুষ পশুপক্ষীর ন্যায় থাকিতে পারিল না?

বজায় রাখিয়া যাইবার জন্য বিধি গড়িল, এই একনিষ্ঠার হন্তারক যাবতীয় সম্ভাবনাকে দূর করিয়া দিবার জন্য নানা নিষেধের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল। একটী মাত্র আত্মিক কারণ হইতেই মানুষের সমাজ-বোধ, জাতিবোধ, সম্প্রদায়-বোধ, দেশ-বোধ সব কিছুর উৎপত্তি ঘটিল। অর্থাৎ পত্নী ও পতির পারস্পরিক পরিপূর্ণ ঐক্যকে আত্মার স্বরূপ-অবস্থায় উপলব্ধিই বিবাহের উদ্দেশ্য এবং একমাত্র সেই প্রয়োজনেরই তাগিদে তাহাদের মন হইবে এক অভিন্ন, দেহ হইবে এক অভিন্ন,—শরীর করিবে শরীরকে লইয়া আত্মীয়তা, মন করিবে মনকে লইয়া রমণ।

যাহা কিছু কহিলাম, হয়ত পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও মনীষীই একথা ইহার পূর্ব্বে কহেন নাই। কিন্তু নূতন কথা বলিয়াই ইহা মিথ্যা হইয়া যাইবে, এমন মনে করিবার যুক্তি নাই! প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতি নিজেদের সামাজিক মিলন, যৌন মিলন, মানসিক প্রবণতার মিলন অপেক্ষাও আত্মায় আত্মায় পরিপূর্ণ মিলন সাধনের অধিকতর যোগ্যতা এবং গভীরতর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া মনন-শীল চিত্ত লইয়া, অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া, পরীক্ষা-পরায়ণ লক্ষ্য লইয়া অগ্রসর হইলে জীবনে অধিকতর সুখী হইবেন। আত্মার সহিত আত্মার পরিপূর্ণ একত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ব্যক্তিগত স্বার্থ-লোলুপতা এবং অহমিকার বিজৃম্ভন হইতে মুক্ত রাখিয়া পথ চলিতে পারিলে, এ পথ মহাশান্তির, মহাতৃপ্তির, মহা-আনন্দের পথ হইবে। মানবের মনে প্রকৃতি-প্রদত্ত যে যৌন লিপ্সা রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। এমন বিবাহিত জীবন দেবগণেরও শ্লাঘ্য হইবে।

বিবাহিতের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি

সুখপিপাসা অতি মোটা কথা, সৌন্দর্য্য-পিপাসাই যেন মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে। সৌন্দর্য্য-পিপাসাই কাহাকেও যতিধর্ম্মে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কাহাকেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে। চিরসুন্দরের মোহিনী মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী প্রাকৃত নারী ও প্রাকৃত পুরুষের রূপ হইতে দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গায়িত আবেগ ফিরাইয়া লইয়াছেন, আবার গৃহী বা গৃহিণী যে নারী বা পুরুষের মুখপানে আত্মহারা দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন, তাহাও সেই পরমসুন্দরকে আঁখির তারায় বাঁধিয়া রাখিবার দুর্দ্দমনীয় অজ্ঞাত তাড়নায়। চিরসুন্দরেরই চিরমধুর পরশ পাইবার জন্য সন্ন্যাস-পন্থী নিবৃত্তিকে এবং গার্হস্থ্যপন্থী প্রবৃত্তিকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। একই পিপাসা, একই অতৃপ্তি উভয়কে অঙ্কুশ-তাড়নে নক্ষত্রবেগে ছুটাইয়া চলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ এই পিপাসার পরমা পরিতৃপ্তি। নিবৃত্তির কণ্টকাস্তৃত পথেই চল কিম্বা প্রবৃত্তির উদ্দামগতি-রথেই চড়, শ্রীভগবানকে পাইলেই সকল শ্রম সার্থক, সকল কষ্ট সফল,—নতুবা একমাত্র অবসাদই তোমার ললাটের লিখন। চিরব্রহ্মচারী ভোগবিমুখ সন্ন্যাসী যদি ভগবানকে ভুলিয়া নিবৃত্তি-ধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তবে তিনি গোলকধাঁধায়ই ঘুরিয়া মরিবেন। পুনশ্চ, ভগবানকেই একমাত্র ক্ষুধার

সুখপিপাসা বনাম সৌন্দর্য্য-পিপাসা

শ্রীভগবানই এই পিপাসার পরমা পরিতৃপ্তি

অন্ন এবং পিপাসার জল না জানিয়া গৃহী যদি প্রবৃত্তিধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তবে সুন্দরকে দেখিতে চাহিয়া তিনি শুধু কুৎসিতের প্রতিই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, সুন্দরের স্পর্শ পাইতে যাইয়া অসুন্দরকেই বুকে জড়াইয়া ধরিবেন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-প্রলেপ মাখিতে যাইয়া ক্রিমিকুল-সেবিত পূতিগন্ধপুরীষই মর্দ্দন করিবেন, সুন্দরের রসসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাইয়া অসুন্দরের কামকূপেই ডুবিয়া মরিবেন। কিন্তু যেদিন ভগবানকেই সকল সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরমা তৃপ্তি বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ গৃহাশ্রমী বুঝিতে পারেন, সেই দিন নারীর সঙ্গ পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষের সঙ্গ নারীর পক্ষে প্রবঞ্চনাসঙ্কুল ও মরীচিকাধর্ম্মী হয় না। পরস্পরকে শ্রীভগবানেরই রূপবিগ্রহ, রসবিগ্রহ জানিয়া যখন নরনারী দেহের, মনের ও আত্মার সম্মিলন সাধন করেন, তখন প্রেমের বন্যায় কাম ডুবিয়া যায়, ব্রহ্মানুভূতি ও ভূমানন্দে দেহানুভূতির চঞ্চলতা ও বিষয়-সুখের আবিলতা শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, দেহক্ষয় করিয়াও সম্মিলিত নরনারী পরমাক্ষয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই অনুশীলন করেন। প্রতি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে শ্রীভগবান তখন উভয়েরই দেহমনে ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজমান থাকিয়া মৈথুনরূপ পশু-ধর্ম্মকে জগৎকল্যাণকর দেহধর্ম্মে পরিণত করেন এবং নরনারীর প্রত্যেকটী অঙ্গসঞ্চালনের পশ্চাতে ভগবান নিজ সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশ-চেষ্টাকে মৈথুন-পরায়ণ দম্পতির নিকটে নিয়ত অনুভূয়মান রাখিয়া তাহাদের প্রাকৃত-জনোচিত কামচেষ্টাকেও অপার্থিব প্রেমসাধনায় রূপান্তরিত করেন। বলিতে গেলে, দেহ তখন নিদ্রিত, আত্মাই তখন জাগ্রত এবং আত্মার নির্বিষয় আনন্দের মধ্য দিয়াই দেহ নিজের অজ্ঞাতসারে সন্তানজনন ও সন্তান-

বিবাহিতের সাধনা

প্রসব করিয়া যায়। এই ভাবে ভগবৎ-প্রেমের মধ্য দিয়া স্বামিপত্নীর দেহ জগতের চক্ষু জুড়াইবার জন্যই নিজেদের নিত্যসুন্দরের পিপাসাকে পুত্র ও কন্যারূপে বিগ্রহান্বিত করিয়া তোলে।—ইহাই বিবাহিতের সাধনা।

ভগবৎ-সাধনাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে সন্তানসন্ততি না জন্মিলেই বা ক্ষতি কি? কত ভাগ্যবান্ দম্পতি যে দেহধর্ম্মের অনুশীলনে মগ্ন হইয়া আমরণ অপত্যোৎপাদনের কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন! আবার, কত কত সাধক-সাধিকা পুত্রকন্যার পিতামাতা হইয়াও দেহকে আত্মার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিতে অবসর দেন নাই। চিরসুন্দর ভগবানকে পাইবার জন্য যেটুকু বৈশিষ্ট্য-সঞ্চয় আবশ্যক, তাহাই তাঁহারা দেহ-মনে সঞ্চয় করিতেছেন এবং চিত্রশিল্পী বা কবি যেমন চির-সুন্দরের পিপাসাকেই ফুটাইয়া তুলিবার আবেগে ও আবেশে চিত্র ও কবিতা লিখিয়া যান, তেমনি ভগবানকে অনুভব করিবার আবেগে ও আবেশে মৈথুনরত হইয়া দেহ ও মনের বিশিষ্টতাকে সন্তানসন্ততিতে সংক্রামিত করিয়া নিত্য নব সৌন্দর্য্য-বিগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ভরা রসানুভূতি থাকিলেও রেখা এবং শব্দের উপরে নিজ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে যেমন মহারসিক ব্যক্তিও চিত্রের বা কাব্যের মধ্য দিয়া নিজ হৃদয়কে প্রবাহিত করিতে পারেন না, ঠিক তেমনি দেহের এবং মনের প্রত্যেকটী স্পন্দনের উপরে আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে নরনারী তাঁহাদের সন্তানসন্ততির মুখশ্রীতে নিজ নিজ

ভগবৎ-সাধনাই মূল লক্ষ্য; সন্তান-সন্ততি গৌণ প্রয়োজন মাত্র

দেহ ও মনের প্রত্যেকটী স্পন্দনের উপরে আত্মকর্তৃত্ব লাভ-কল্পে তপস্যার প্রয়োজনীয়তা

মুখশ্রী, সন্তানসন্ততির হৃদয়ে নিজ নিজ হৃদয় এবং সন্তানসন্ততির অনুভূতিতে নিজ নিজ অনুভূতিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। অনেকের ভিতরেই চিত্রকর হইবার উপাদান থাকে কিন্তু বর্ষের পর বর্ষ প্রাণপণ রেখার সাধনা না করিলে ভিতরের সুপ্ত প্রতিভা পূর্ণ জাগ্রত হয় না। অনেকের ভিতরেই কবি হইবার উপাদান থাকে কিন্তু বর্ষের পর বর্ষ একনিষ্ঠ প্রযত্নে শব্দশক্তির সাধনা না করিলে কবিত্ব-শক্তির সম্যক্ বিকাশ ঘটে না। ঠিক তেমনি প্রায় প্রত্যেকেরই ভিতর সন্তান-জননের সামর্থ্য থাকে, কিন্তু বর্ষের পর বর্ষ অনলস ভাবে দেহ-মনের স্পন্দনের যথোচিত সাধনা না করিলে সৃজন-সৃষ্টির প্রকৃত শক্তি উন্মেষিত হয় না। অপরিসীম অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠা সহকারে সরল রেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ ও বৃত্ত প্রভৃতি অঙ্কন করিতে করিতে যেমন ক্রমশঃ চিত্রের মধ্য দিয়া মনের নিগূঢ় ভাবটীও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা জন্মে, সুগভীর মনোযোগ ও অনুরাগ সহকারে শব্দ-শক্তির অনুশীলন করিতে করিতে এবং মনোগত ভাবকে প্রকাশ করিবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে যেমন কবি কালক্রমে গভীরতর ভাব সমূহকেও সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন, তেমনি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত দেহ ও মনের শক্তিস্পন্দন সমূহের সাধনা করিতে করিতেই সন্তানের মধ্য দিয়া নিজের যাবতীয় কল্যাণময়ী বিশিষ্টতা বিকাশের স্বাভাবিকী ক্ষমতার প্রস্ফুরণ ঘটে। সাধনাহীন চিত্রকর কত হিসাব করিয়া, কত সন্তর্পণে, কত সাবধানতার সহিত তুলির রেখাপাত করে কিন্তু তাহার চিত্র প্রাণের ভাবপ্রকাশে

অসমর্থ হয়। সাধনাহীন কবি অক্ষর গণিয়া ভাষাকে ছন্দোবদ্ধ করে এবং কত কষ্টই না করিয়া পংক্তিতে পংক্তিতে ধ্বনির মিল রক্ষা করে কিন্তু তাহার কবিতা কোনও সৌন্দর্য্য বা রসকেই সৃষ্টি করিতে পারে না। ঠিক তেমনি দেহমনের স্পন্দনশক্তির সাধনাহীন অতপস্বী নরনারী সন্তান-জননকালে শতবার পঞ্জিকা দেখিয়া এবং দিনক্ষণের চুলচেরা বিচার করিয়াও তাহাদের উৎকৃষ্ট চিন্তা, উৎকৃষ্ট রুচিসমূহ সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত করিতে পারে না। পরন্তু, যে ব্যক্তি যথোচিতভাবে রেখার সাধনা করিয়াছে, তাহার তুলিকা যথেচ্ছভাবে পরিচালিত হইলেও সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ফোয়ারা খুলিয়া দেয়। যে ব্যক্তি শব্দশক্তির সাধনা করিয়াছে, তাহার লেখনী অতর্কিত প্রযত্নে শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করে এবং কবিত্ব-মধুভাণ্ডের আবরণ উন্মোচিত করিয়া দেয়। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি দেহমনের আভ্যন্তর ও বাহ্য স্পন্দনসমূহের সাধনা নিখুঁত ভাবে করিয়াছে, তাহার এমনকি অতর্কিত অপত্যোৎপাদনও জগতের মধু, জগতের অমৃত, জগতের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। তুলি চালাইলেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না, তুলির অগ্রে সাধনা চাই। দেহ-মনের স্পন্দনকে সন্তান-জননকার্য্যে ব্যবহার করিলেই সৃজনসৃষ্টি হয় না, দেহমনের যাবতীয় আন্দোলন ও স্পন্দনকে ঈশ্বরানুগত, ভগবৎ-প্রেম-সমন্বিত এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবস্থিতির প্রত্যক্ষ-অনুভূতিযুক্ত করিবার জন্য সকল স্পন্দনের মূলীভূতা শক্তির আগে সাধনা করিয়া লইতে হয়। এই জন্যই বিবাহ যখন রসসাধন বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টিরূপে আদর্শ মানব-সমাজে গৃহীত হইবে, সেই দিন বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যই এই সাধন-জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপে অবস্থান করিবে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়াই মানব-মানবীর দেহ-মনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জীবন আনন্দের নিকেতন হইবে।

যে কৌশল এবং নৈপুণ্যের অধিকারী হইলে নরনারী তাহাদের কল্যাণ-সাধনাকে বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত রাখিতে সমর্থ হইবে, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য-প্রয়াস সেই কৌশল ও নৈপুণ্যের সমাবেশে দম্পতির জীবন মানবতার পরিপূর্ণ গৌরবে বিমণ্ডিত করিবে। কেন না, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরক্ত এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রতি চেষ্টান্বিত দম্পতিই নিজেদের প্রত্যেকটী দাম্পত্য ব্যবহারের ভিতরে নিজেদিগকে অনাসক্ত, উদাসীন বা দ্রষ্টাব্য রাখিয়াও কোন্ প্রক্রিয়ার কি পরম ফল, কোন্ চেষ্টার কি চরম কুশল, কোন্ পথে দেহকে চালাইয়া জীব-ধর্ম্মের অনুশীলন সত্ত্বেও জৈবী লালসার নিকট মাথা নত না করিয়া চলা সম্ভব, তাহার সফল অনুশীলন এবং পন্থা উন্মোচন করিতে সুসমর্থ হইতে পারিবে। সাধারণ দম্পতির ইন্দ্রিয়-সেবায় মন রিরংসার নেশায় মজিয়া থাকে। অনুভূতি তার অন্ধ থাকে,—সে জাগিয়া থাকিয়া লক্ষ্য করিবার শক্তি হারায় যে, কোন্ রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ দ্বারা দেহকে তাহার চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি দিয়াও প্রাণকে বিশ্বের প্রকৃষ্টতম আনন্দে, পরমতম মাধুর্য্যে, শ্রেষ্ঠতম ধ্যানে লাগাইয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য কেন আবশ্যক?

দম্পতির এই মিলন যে শরীরের ভোগাঙ্গদ্বয়ের মাত্র মিলন নহে, ইহার লক্ষ্য যে প্রাণের এমন মিলন, আত্মার এমন মিলন, বিচ্ছিন্ন দুইটী সত্তার এমন পরিপূর্ণ অভিন্নতা সাধন, যেই অভিন্নতা অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে, ইহা সে স্মরণে রাখিতে পারে না। নিজের জন্য সুখ আদায় করিয়া লওয়াই যে ইহার উদ্দেশ্য নহে, এই সময়ে উভয়েরই মনকে যে তুচ্ছতম স্বার্থপরতার উর্দ্ধে তুলিয়া আনিতে হইবে, ইহা সে ভুলিয়া যায়। স্ত্রী নিজেকে বলি দিতেছে স্বামীর সহিত একাত্মতা-সাধনের

প্রয়োজনে, স্বামী নিজেকে বিকাইয়া দিতেছে স্ত্রীর সহিত আত্মার অভিন্নতা-সাধনে, অব্রহ্মচারী দম্পতি ইহা ভুলিয়া যায়। তাই সহবাস সৌন্দর্য্যবোধ সৃষ্টি না করিয়া বীভৎস কদর্য্যতার রূপ পায়, তাই ইহা ভগবানের লীলার ঐক্যগীতি না হইয়া ভূতপ্রেতের ছন্দোহীন তাণ্ডব নৃত্যে পরিণত হয়। পরন্তু, প্রকৃত রসজ্ঞ দম্পতির হাতের মুঠির মধ্যে যখন যৌন জীবন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বিধৃত হয়, তখন ইহা হইতে জান্তবতার পূতিগন্ধ বিদূরিত হইয়া যায়, যেন দম্পতির প্রতিটি হৃৎস্পন্দন, নেত্রপাত, স্পর্শসুখ, পরিরম্ভন, বাক্‌স্ফুরণ সবই এক অনিন্দ্য-সুন্দর দিব্য জগতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। এই জন্যই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা আবশ্যক।

———

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে প্রচলিত আপত্তিসমূহ

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া আমাদিগকে যতগুলি আপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

(ক) বিবাহিতের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন অসম্ভব। কারণ, ভোগ-সামগ্রী তাহার হাতের মুঠায় রহিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি খাদ্যপানীয় পাইয়া কি করিয়া রসনা সংযত করিবে?

(খ) বিবাহিত পুরুষেরা মৈথুনে অনাসক্তি প্রদান করিলে তাহাদের পত্নীরা কাম-চরিতার্থতার জন্য অবৈধ পন্থার অন্বেষণ করিবে।

(গ) বিবাহিতা নারীরা স্বামীর ভোগেচ্ছায় বাধা জন্মাইলে স্বামীরা বাসনাতৃপ্তির জন্য কুপথগামী হইবে।

(ঘ) বিবাহিতেরা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইলে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে অনুরাগের হ্রাস হইবে এবং তৎফলে সংসারের সুখ বিনষ্ট হইবে।

(ঙ) বিবাহিতেরা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া বাস করিলে দেশের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং তাহাতে জাতীয় অধোগতি সাধিত হইবে।

(চ) দাম্পত্য-জীবনে মৈথুন বর্জ্জন করিলে স্বামী বা স্ত্রীর রোগ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে আয়ুষ্কাল কমিয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উল্লিখিত আপত্তিগুলি সম্বন্ধে আমরা কি বলিতে পারি।

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা অসম্ভব নহে

(ক) বিবাহিতের পরে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা যে অসম্ভব, তাহা চিন্তা-শক্তিবঞ্চিত আত্মবিশ্বাসহীন নিরুদ্যম ব্যক্তিরই কথা। চিন্তাশীল ও আত্মশক্তিতে আস্থাবান্ ব্যক্তিরা কেহই "অসম্ভব" বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যকে গার্হস্থ্য জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন না। যাহারা এখনও বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে নাই, সে সকল তরুণ ও তরুণীদিগকে যদি সময় থাকিতে সংযমানুকূল প্রকৃত সুশিক্ষায় প্রভাবিত করিয়া জীবনের আদর্শ এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জনই বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে অল্পাধিক সমর্থ হইবে।

বালক ও বালিকা-বস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভ্যাস থাকিলে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য লাভ অতি সহজ

এই অভিমত কোনও কল্পনাবিলাসীর অতিভাষণ নহে; কিম্বা শুধু প্রবন্ধ-কারেরই ব্যক্তি-গত মত নহে; যাঁহারা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্য ভাবে সংযম-সাধনার প্রসার-সাধনে কোন চেষ্টারই ত্রুটী করেন নাই এবং শত শত স্থলে বিফলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে এক একটী সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য বা বর্জ্জনীয় বলিয়া মানিয়াছেন, সেই অভিমত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লব্ধ সিদ্ধান্তের

সহিত মিলিবে। বর্ত্তমান যুগের বালক-বালিকারা অধিকাংশ স্থলেই অসংযমী গৃহীর সন্তান-সন্ততি বলিয়াই সৎশিক্ষা পাইলেও শতকরা পঁচিশ জন বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের নাম রাখিতে পারিবে না বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করিবার জন্য যদি ক্রমান্বয়ে কতিপয়-পুরুষ-ব্যাপী একাগ্র চেষ্টা চলিতে থাকে, তাহা হইলে এমন দিন এই ভারতে আসিবেই আসিবে, যেদিন শতকরা পঁচানব্বই জন বালক-বালিকাই সংযমানুকূল সৎশিক্ষা পাইলে বিবাহিত জীবনের গোপনতম অংশটুকুকেও পবিত্রতায় প্রদীপ্ত রাখিতে পারিবে। এইখানে পাঠকের স্মৃতিশক্তিকে সহায়তা করিবার জন্য আর একবার বলিয়া রাখিতেছি যে, গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যকীয় মৈথুনের বিরোধী নহে, কল্যাণোদ্দেশ্যহীন বৃথা-মৈথুনই তাহার ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী। সন্তানোদ্দেশ্যহীন যে মৈথুন, আত্মিক মিলনের দিকে লক্ষ্যহীন যে মৈথুন, বৃহত্তর প্রাপ্তিকে সহজতর করিবার চেষ্টাহীন যে মৈথুন, তাহাই বৃথা-মৈথুন। যে সন্তানকে সবল সুস্থ দেহমনের অধিকারী করিয়া ভূমিষ্ঠ করান যাইবে না, যাহার জন্য পুষ্টিকর আহার্য্য ও মনুষ্যত্ববর্দ্ধক সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, তেমন সন্তানকে পাইবার জন্য মৈথুনরত হইলে তাহাও বৃথা-মৈথুনেরই পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। বৃথা-মৈথুনই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যকে ধ্বংস করে, অপর মৈথুন তাহার ব্রহ্মচর্য্যের পরিপন্থী নহে।

বৃথা মৈথুন ও গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য

উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই যাহারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হইলেও সকল স্থলেই অসম্ভব নহে। মাতালেরা দুগ্ধকে হিতকর জানিয়াও তাহাতে অনাদর করিয়া যে মদ্যেই আসক্ত রহিয়াছে, তাহার

কারণ তাহাদের পূর্ব্বাভ্যাস। কিন্তু পদ্ধতিবদ্ধভাবে ধারাবাহিক চেষ্টা চালাইলে মাতালেরও অভ্যাস-পরিবর্ত্তন সুসম্ভব। ত্রিপুরা ও আসামের পার্ব্বত্য-অঞ্চলে একমাত্র দীক্ষোপদেশের দ্বারাই শত শত মদ্যপকে আমরা মদ্যপান ছাড়াইতে পারিয়াছি, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। পানাসক্তি ত্যাগের জন্য আমরা কাহাকেও উপদেশ পর্য্যন্ত দেই নাই, তবু নামের বলে ইহা হইয়াছে। ফরিদপুরের মহাপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু স্থানীয় সাঁওতাল-বংশীয়গণের মধ্য হইতে অতি অল্প সময়েই মদ্যপানাসক্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া বিলাতেও বিস্ময় উদ্রিক্ত হইয়াছিল। প্রভু জগদ্বন্ধু একমাত্র নাম-কীর্ত্তনের প্রভাবে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও যে একমাত্র "পিকেটিং" দ্বারা মদ্যপায়ীদের সংখ্যা-হ্রাসে সমর্থ হইয়াছিলেন, সরকারী আবগারী বিভাগের হিসাবপত্রেই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। যদি মহাত্মার বহুসংখ্যক সহকারী নেতা ও অনুচর কর্ম্মী হুজুগ সৃষ্টি করিতেই ব্যস্ত না থাকিত এবং বৃথা চেষ্টায় সামর্থ্যের পুঞ্জ অপব্যয়িত করিয়া যথার্থ কার্য্যকালে গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া না পড়িত, তাহা হইলে পনের বিশ বৎসরের মধ্যে মদ্যপানাসক্তি এতদ্দেশ হইতে যে চিরতরে নির্ব্বাসিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শত শত বৎসরের অসাবধানতা ও অকৃতি আমাদের জন্য যে দুর্ভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাকে এক তুড়ীতে উড়াইয়া দিতে না চাহিয়া, ধীর, স্থির ও বুদ্ধিকৌশল-সমন্বিত ধারাবাহিক চেষ্টা দ্বারা ব্যূহবদ্ধ আক্রমণে ক্রমশঃ পরাহত করিবারই উদ্যোগ আজ আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—তাহা হইলেই আমরা যথাযথভাবে ভবিষ্যৎ ভারতকে

পদ্ধতিবদ্ধ ধারাবাহিক চেষ্টায় পূর্ব্বাভ্যাস পরিবর্ত্তন সম্ভব

নির্ম্মাণ করিতে পারিব। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাতেও তেমন সঙ্ঘবদ্ধ এবং কৌশল-পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াস চাই। নরনারীর কুমার-জীবন এবং বিবাহিত-জীবন হইতে কাম-পঙ্কিলতাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যদি এই কার্য্যে সমর্পিতযত্ন সন্ন্যাসী কর্ম্মীরা হুজুগবহুল নিত্যনূতন কর্ম্মতালিকার মাদকতায় আকৃষ্ট না হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে এই এক চেষ্টাই চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে এক শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় দাম্পত্যজীবন প্রায় সর্ব্বজনীন ভাবেই প্রদীপ্ত সাধনার জ্যোতির্ম্ময় জীবনে পরিণত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বর্ত্তমান অসংযত কদভ্যাস-সমূহের প্রকৃত কারণ ও প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হইয়া যদি এই সকল সন্ন্যাসী কর্ম্মিগণ সকল প্রয়াস প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে আংশিক সাফল্য হাতে হাতেই পাওয়া যাইবে। এখানে বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসী কর্ম্মীর কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-কার্য্য পুরুষানুক্রমিক প্রয়াসে সম্পাদিত করিতে হইবে, তাহাতে গৃহী কর্ম্মী অপেক্ষা সন্ন্যাসী কর্ম্মীর কর্ম্মসামর্থ্য অধিকতর উপযোগী এবং একনিষ্ঠ; যেহেতু, যে-স্থলে গৃহীর জীবন-সাধনা পুত্রপরম্পরায় কদাচিৎ ক্রমবর্দ্ধিত হইতে চাহে, সে স্থলে সন্ন্যাসীর-জীবন-সাধনা শিষ্যপরম্পরায় প্রায় সর্ব্বদাই পরিমার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিস্ফুট হইতে পারে।

আংশিক সাফল্য হাতে হাতেই মিলিবে

বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান বালক ও বালিকারা তাহাদের সুরসিক ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, ভগ্নীপতি, দাদার শালা প্রভৃতির নিকট হইতে হাসি-ঠাট্টায়, রং-তামাসায় বিবাহিত জীবনের শুধু পঙ্কিল ছবিই দেখিয়া আসিয়াছে। বিবাহিত দম্পতির এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থাটা এতই পাকা ও বাধ্যকর হইয়াছে যে, আত্মরক্ষণেচ্ছু বালকের জন্য জোর-

জবরদস্তি এবং অকালমৈথুনভীতা বালিকার জন্য নির্দ্দয় প্রহার এই মৃত্যুন্মুখ সমাজের লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে কটু বলিয়া আদৌ ঠেকিতেছে না। একদিকে যেমন সৎশিক্ষার অভাব, অপর দিকে তেমন কুশিক্ষার প্রভাব। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা এইভাবে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যকে অতীব কঠিন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি বলিব, বিবাহিতের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন অসম্ভব নহে। যে দম্পতির উভয়ের হৃদয়ে শ্রীভগবানের জন্য কোনও ক্রমে একটী আসন রচিত হইতে পারিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিন দিনই সংযম রক্ষার কাঠিন্য হ্রাস পাইতে থাকিবে।

অশিক্ষা ও কুশিক্ষা

যে সকল স্বামিপত্নী বিবাহের পূর্ব্বেই শ্রীভগবানের পরমমঙ্গল মহানামে সুদীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন, যত্ন-চেষ্টায় অপরাঙ্মুখ হইলে তাঁহারা ত' অতি অল্পকালমধ্যেই বিবাহের পঙ্কিল দুর্গন্ধময় নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া সংযম-সৌরভামোদিত সুদৃঢ় উচ্চ ভূমিতে বিচরণ করিতে পারিবেনই, এমন কি বিবাহিত জীবনে যাঁহারা নিজস্বতাকে ক্লেদপঙ্কে হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন, তাঁহারাও শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে, অকপট চিত্তে তাঁহার পরমকৃপার আশ্রয়প্রার্থী হইলে, নিশ্চিতই ক্লেদমুক্ত শুভ্রসুন্দর সুপবিত্র জীবনের অধিকারী হইবেন। অবশ্য, স্বামী এবং পত্নী সম-সাধনের সাধক-সাধিকা হইলে, সম-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে সংযম-সাধনার পথেও যে তাঁহাদের গতিপথ সুগমতর হইবে, ইহা মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। হে ভারতের নবজাগ্রত দাম্পত্য সাধক ও সাধিকা! তোমরা আজ হতাশ হইও না। তোমাদের মধ্যে পরমাত্মার যে অপরিমেয় শক্তিরাশি নিহিত রহিয়াছে, আত্ম-অবিশ্বাস করিয়া তাহার প্রস্ফুটনে বাধা প্রদান করিও না।

ভগবানের পরমমঙ্গল নামই অবলম্বন

দেশের, দশের, সমাজের এবং জগতের কল্যাণের জন্য এবং তোমাদের উভয়ের পরমার্থসিদ্ধির জন্য, তোমাদিগকে আজ শত বিঘ্ন পদদলিত করিয়া পবিত্রতার সাধনা করিতে হইবে। দেহকে পরিশুদ্ধ করিয়া মনকে আবিলতাপ্রমুক্ত করিয়া তোমাদিগকে আজ সন্তান-সন্ততির জন্য সৌভাগ্য রচনা করিতে হইবে,—তোমরা আর আত্মবিস্মৃত থাকিও না। গভীর হুঙ্কারে আজ তোমরা নিজেদের সংযম-সামর্থ্যকে স্বীকার কর,

নিজেদের সংযম-সামর্থ্যকে স্বীকার কর

তোমাদের আচরণের দ্বারা পূর্ব্বপুরুষ-গণকে মর্য্যাদা দান কর, তোমাদের আদর্শের দ্বারা ভবিষ্যদ্‌বংশীয়-গণের জন্য প্রকৃত কৌলীন্যের সৃষ্টি কর। সন্দেহ-বাদীর যুক্তিতর্কে তোমরা কক্ষভ্রষ্ট হইও না। দুই চারিবার পদস্খলনে তোমরা হতোৎসাহ হইও না। স্খলিত-পদ অধোগতির ভিতরেও বারংবার প্রতি শরীরান্দোলনে অনাথ-শরণ পতিত-পাবন পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামকে স্মরণ কর, আশ্রয় কর। শ্রীভগবানকে যাহারা জীবনের সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া জানিয়াছে, তাহাদের অসাধ্য এ জগতে কি আছে ? তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া যাহারা স্খলিতপদ হইবে, বা স্খলিতপদে ও পতন-পথেও যাহারা তাঁহারই নামকে আশ্রয় করিবে, তিনি নিজেই কি তাহাদিগকে বাহু বাড়াইয়া

দুই চারিবার পদস্খলনে হতাশ হইও না

তুলিয়া লইবেন না ? হে নারি ! পুরুষ তোমার ভোগের জন্যই নহেন। পুরুষ তোমার পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য। হে পুরুষ ! নারী তোমার ভোগ্যবস্তু নহেন। নারী তোমার পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য। দুইজনের বিভিন্নমুখিনী প্রবণতাকে একমুখিনী করিয়া দুর্ব্বার বিক্রমে তোমারা পূর্ণ সত্য লাভের পথে ত্বরান্বিত গতিতে ছুটিবে, তোমাদের বিবাহ এইজন্য। এই সুমহৎ লক্ষ্যের দরুণই তোমরা একের পক্ষে

অপরে অপরিহার্য্য। এই পরম লক্ষ্যকে লাভ করিবার জন্য বা এই পরম লক্ষ্যকে লাভ করিবার পথে প্রসঙ্গক্রমে যদি তোমাদের ভোগ-মূলক দেহ-সংসর্গও আবশ্যক হয় তথাপি তোমরা উভয়ে উভয়ের সেই পরমলক্ষ্যকে লাভ করাইবারই উত্তর-সাধিকা ও উত্তর-সাধক। সুখে সংসার করিবার দুদিনের সম্পর্ক ইহা নহে, তোমাদের বিবাহিত জীবন অনন্ত সুখশান্তির ভবিষ্যদ্‌বিধাতা। পরস্পরকে ভোগ করিয়াই তোমাদের পরমা শান্তি লাভ হইবে না, একে অপরকে উন্নতির পথে অকৃপণ সহায়তা দিয়াই তোমরা ভূমানন্দের অধিকারী হইবে। দেহ যখন দেহের ধর্ম্মে নিজেকে লইয়া লিপ্ত, সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়-নিচয় যখন

বিদেহ রমণ

সাময়িক দুর্ব্বলতায় বা শারীরিক প্রয়োজনে ভোগ-লিপ্সার অন্ধকূপে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তখনও প্রকৃত মতিমান্ দম্পতি আত্মার সহিত আত্মার মিলন কোথায় কিভাবে কতটুকু ঘটিল, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য মনের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। দেহ যতই শ্রম করুক, আত্মার মধুভাণ্ড দিব্যপ্রেম-রসে পূর্ণ না হইলে সবটুকু শ্রমই বৃথা গেল। আত্মার উপলব্ধি দিয়া আত্মাকে আস্বাদন করিবার এই প্রয়াসের নাম বিদেহ-রমণ। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, তোমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ, রসনা ও তেঁতুলের সম্বন্ধ নহে, ঘৃত এবং অগ্নির সম্বন্ধ নহে,—তোমাদের সম্বন্ধ, দীর্ঘ পথের সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সম্বন্ধ,—তোমরা একে অন্যের ধর্ম্ম-জীবনের সাথী, কর্ম্ম-জীবনের সাথী, একে অন্যের শ্রমাপহারক সঙ্গী, চিত্তাপ-প্রশমক প্রাণের জন। শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল নামের আশ্রয়ে আজ তোমরা পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা লাভ কর। সেই প্রজ্ঞার দিব্য আলোকে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়া লও এবং সন্দেহবাদীর যুক্তিতর্কের

উত্তর যুক্তিতর্কের দ্বারা না দিয়া জীবনের অকাট্য দৃষ্টান্ত দ্বারা চিরতরে তাহাকে নিরুত্তর করিয়া দাও।

এই গ্রন্থখানার সপ্তম সংস্করণ মুদ্রণ কালে এই অনুচ্ছেদে আমরা আমাদের একটী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিতে চাহি যে, দুর্ভাগ্যক্রমে যে সকল দম্পতীর প্রাগ্-বিবাহিত জীবনে উল্লেখযোগ্য সংশিক্ষার কোনও সুযোগ ছিল না এবং বিবাহোত্তর জীবনে বেশ কিছু কাল যাহারা দেশেরও সমাজের প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিয়া দাম্পত্য জীবনকে সম্ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিবারই ছাড়পত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, এমন দম্পতীরাও যে সর্ব্বমন্ত্রের মহাসমন্বয়-স্বরূপ ওঙ্কার মহামন্ত্রে দীক্ষা লইয়া জগৎ-কল্যাণ-সঙ্কল্পে জীবন গঠনে তৎপর হইবার ফলে সামান্য চেষ্টায় কামজয় করিয়াছেন, তাহার সহস্রাধিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে রহিয়াছে।

দাম্পত্য সংযমে ওঙ্কার-মহামন্ত্র ও জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পের শক্তি

বিবাহিত জীবনে সংযম-সাধনা, দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-লালসা-বিহীন উত্তেজনা-বিবর্জ্জিত সরল সহজ গৃহি-জীবন আজ একটা অলৌকিক রহস্য নহে, একটা অলীক কাহিনী নহে, একটা কল্পনার খেয়াল নহে। দীক্ষামন্ত্রের নিজস্ব একটা শক্তি আছে, যদি তাহা সংযমে সুপ্রতিষ্ঠিত গুরুর মুখোচ্চারিত হয়। মন্ত্রের নিজস্ব একটা শক্তি আছে, যদি তাহা সর্ব্বসমন্বয়ী সর্ব্বসমুচ্চয়ী সর্ব্বতত্ত্বাধার মন্ত্ররাজ হয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতে, ধমনীতে, সমগ্র অস্তিত্বটুকুর প্রতিটি অণুপরমাণুতে এক অসাধারণ রূপান্তর আপনা-আপনি হয়, যদি জগৎকল্যাণ সঙ্কল্প নিষ্ঠার সহিত পরিচালিত হইতে থাকে। ইহা সহস্রাধিক দম্পতীর জীবনে প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। (১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৫)

(খ) বিবাহিত পুরুষেরা স্ত্রী-সঙ্গমে অনাসক্তি প্রদান করিলে তাহাদের পত্নীরা কামচরিতার্থতার জন্য অবৈধ পন্থার অন্বেষণ করিবে বলিয়া যে আশঙ্কার কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা বহুলাংশেই অমূলক। কারণ, দুই চারিটি ব্যতিক্রম-স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্রই নারী-চরিত্র একান্তই অপ্রগল্ভ এবং স্বামীর ইচ্ছানুগামী। নারী তাহার হৃদয়ের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষাকেও অতি দীর্ঘকাল হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে জানে এবং অতি বিলম্বেও ধৈর্য্য না হারাইয়া আশা-প্রতীক্ষা করিতে পারে। নারীর কাম পুরুষের অপেক্ষা আটগুণ বেশী বলিয়া কেহ কেহ যতই লম্ফ-ঝম্ফ দিন না কেন, রতি-লালসা-দমনে পুরুষের অপেক্ষা নারীরই সামর্থ্য অধিক, একথা আমরা বজ্রকণ্ঠে বলিব।

রতি-লালসা দমনে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সামর্থ্য অধিক

বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নারীর প্রতি যথেষ্টই অবিচার করিয়াছেন, এমন কি তাহাদের মনুষ্যত্বের ওজন দিতেও বাটখারায় চুরি করিয়াছেন, এই লজ্জাকর সত্য কথাটা আর ধামাচাপা দিয়া রাখা অসম্ভব। যে পত্নী সঙ্গমসুখের আস্বাদন এখনও পান নাই, তাঁহার স্বামী যদি নিজে সংযতচেতা অথচ বিবেচক এবং প্রেমিক-হৃদয় ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে ইচ্ছা করিলে তিনি অতি দীর্ঘকাল স্বীয় পত্নীকে দেহ-লালসার সংস্পর্শ হইতে সর্ব্বতোভাবেই দূরে রাখিয়াও নিরতিশয় অনুরক্তা এবং একান্ত পতিগতপ্রাণা রাখিতে পারেন। কারণ, স্বামিপত্নীতে ভালবাসা যতই নিবিড় হউক না, পরস্পরের সরলতা যতই গভীর হউক না, মুখ ফুটিয়া দেহ-সমর্পণের প্রস্তাব স্ত্রীর পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব। স্বামী যতদিন না পত্নীর দেহকে গ্রহণ করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত পত্নীর মনে যাহাই থাকুক, তাহার

দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে স্বামী চেষ্টা করিলে অতি সহজেই সংযম পালন করিতে পারেন

পক্ষে দৈহিক প্রয়াসের দ্বারা স্বামীকে আসক্ত ও অনুগত করিবার চেষ্টা প্রায় অভাবনীয়। একবার অসংযমের আস্বাদন পাইলে সুশীলা নারীও যৌবনের উদ্দাম প্রকৃতিবশে ব্যাঘ্রিণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু **কৌশলাভিজ্ঞ** ভগবৎ-প্রেমিক স্বামী ইচ্ছা করিলেই তাহার বাসনার দুর্ব্বার স্রোতের গতি ফিরাইয়া এই দুঃখময় মর্ত্ত্যলোকে সুখসুন্দর স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করিতে পারেন। পত্নীর কাম-চরিতার্থতায় স্বামী যদি নিজেকে যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে না দেন, তাহা হইলেই যে পত্নী পরপুরুষগামিনী হইবেন, নারী-চরিত্রে অনভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাহীন নীচবুদ্ধি ব্যক্তিরাই এইরূপ অসঙ্গত আতঙ্কে অস্থির হইবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে নারীর চিত্তবৃত্তি এত দুর্ব্বল, হীন বা জঘন্য নহে। যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীজাতিকে আমরা সমাজের নিকৃষ্টতম মনোভাবগুলির সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিতে বাধ্য করিয়া এবং তাঁহাদের লোককল্যাণী ক্ষমতার ব্যাপকতাকে বলিতে গেলে প্রায় কায়মনো-বাক্যেই অস্বীকার করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে নিজস্ব মহিমা হইতে

নারী-চরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা নিন্দনীয়তর নহে

শত প্রকারে পরিভ্রষ্ট করিলেও, আজও নারী-চরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা নিন্দনীয়তর হয় নাই। ভারতে যত স্বামিবতী হতভাগিনী পরপুরুষগামিনী হইয়া নিজেদিগকে পতিতা এবং বংশকে নরকাচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই পরনারীরত মদ্যপ পতিদেবতার অকথ্য অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি জর্জ্জরীভূতা হইয়াই পরিশেষে জীবনের দুঃসহতম মুহূর্ত্তে পাপপন্থা গ্রহণ করিয়াছে। কুল-ত্যাগিনী এই পরমদুঃখিনী মন্দভাগিনীরা কুলবতী সতী-শিরোমণিদেরও মুখ ঘৃণায় লজ্জায় পাংশুবর্ণ এবং মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু এই রূপোপজীবিনী দুর্ভাগিনীদের পতনের প্রথম ইতিহাস

যখন মনে মনে আলোচনা করি, তখন যে শোকে, দুঃখে ও বেদনায় অধীর হইয়া পড়ি! যে পুরুষের জাতি ইহাদিগকে কোথাও বা

অধিকাংশ স্থলে পুরুষেরাই নারীর দুশ্চরিত্রতার প্ররোচক

অত্যাচারের বিকট বিকর্ষণে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কোথাও বা প্রলোভনের মদির আকর্ষণে টানিয়া আনিয়া, আমৃত্যু পাপের স্রোতে ভাসিয়া চলিতে বাধ্য করিল, সেই পুরুষের জাতিকেই জগতের সকল অপরাধের নাটের গুরু জানিয়া ব্যথায় যে অবশ হইয়া পড়ি। তথাপি চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখ, পদাঘাত যাঁহার নিত্যকার অভিনন্দন, অনাহার যাঁহার নিত্যকার স্বামিভক্তির পুরস্কার, বারিবর্ষণের জন্যই যাঁহার কুরঙ্গ-চক্ষুদ্বয়, নির্ম্মম তিরস্কার-বাক্যই যাঁহার কর্ণ-রসায়ন, ভ্রষ্টচরিত্র লম্পট স্বামীর সেই একপরায়ণা সতী-প্রতিমা পত্নীদের সংখ্যা একপরায়ণ স্বামীদের অপেক্ষা কত বেশী। মৃত্যুতুল্য দুঃখকষ্টের বজ্রাঘাত সহিয়াও যাঁহারা দুশ্চরিত্র অধার্ম্মিক স্বামীরই চরণযুগল সবলে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, তুমি কি বলিতে চাহ যে, তাঁহাদেরই এক সহোদরা ভগিনী স্বামীর স্নেহমমতার সর্ব্বাংশে অধিকারিণী হইয়াও শুধু দেহসুখের সাময়িক লোভেই পরপুরুষ-স্পর্শের দ্বারা দেহকে কলুষিত করিবেন?

ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থী স্বামী নিজ পত্নীকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গিনী জানিয়া নিয়ত কল্যাণময়ী সুশিক্ষায় মণ্ডিত করিতে চাহিবেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও দেহকে দেহের সহিত মিলিতে দেওয়া হইবে না,—ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। জীবন ভরিয়া প্রায় প্রতিদিন জৈব-মিলনে রত হইয়া সমগ্র জীবনে সাকল্যে সাধারণ মানুষ যে সুখানুভূতিটুকু লাভ করে, সঙ্কল্পানু-

গত বিরল মিলনে তাঁহারা একদিনে তাহার শতগুণ সুখকে আস্বাদন করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরানুগত ও শুদ্ধচেতা থাকিবেন, তাহারই পন্থা উন্মোচনের জন্য এই ব্রহ্মচর্য্য। একে অন্যকে পরমাত্মার বিকাশ-বিগ্রহ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাদের সম্বন্ধ অনেকটা গুরু-শিষ্যের ন্যায়। মৈথুনের অভাব বা অল্পতা ইহাদের প্রীতিকে বর্দ্ধিতই করিবে, মৈথুনের বাহুল্য সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবুদ্ধির ধ্বংসসাধন করিবে। বহু-বার মিলিলেই প্রীতি বাড়ে না, যদি দৈহিক-মিলন-জনিত আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধ ও রসানুভূতি অতীব তীব্র এবং গভীর না হয়। পত্নী যখন পতিকে শ্রদ্ধা করিবার কারণ পায়, তখনই তাঁহাকে জীবনের জীবন, সর্ব্বস্বধন, যৌবনাধিরাজ শ্রীভগবান্ বলিয়া মনে প্রাণে স্বীকার পায়। আর, যখন স্বামীর দেহকেই শুধু তাহার প্রয়োজন, পরন্তু সেই দেহও কোনও স্থায়ী সম্পদের আস্বাদন দিতে পারে না, তখন মনে মনে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের সমর্থন করে। হে ভারতীয় নববিবাহিত যুবক! যদি তোমার পত্নীকে যথার্থই তুমি সমধর্ম্মিণীরূপে পাইতে চাহ, জীবন-সাধনার সহায়তাকারিণী মহাশক্তিরূপে যদি তাঁহাকে দেখিতে চাহ, হতাশার আশারূপে, বেদনার সান্ত্বনারূপে তাঁহার সুখ-সাহচর্য্যকে যদি লাভ করিতে চাহ এবং পরিশেষে যদি তাঁহার হৃদয়-মনকে নিঃশেষে অধিকার করিয়া লইতে চাহ, তবে জানিও, বিবাহের পরমুহূর্ত্ত হইতেই পাশব স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া না দিয়া উপযুক্ত কালের জন্য তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে এবং এই সময়টুকুর প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত তোমার সঙ্গিনীর সুশিক্ষার

স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কতকটা গুরু-শিষ্যের ন্যায়

বিবাহের পরমুহূর্ত্তেই ভোগ-স্রোতে ভাসিও না

ব্যবস্থা করিবার জন্য তোমাকে চেষ্টা পাইতে হইবে। মানব-জীবনের যথার্থ মহিমার কথা একবার যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া উঠিতে পার এবং স্বয়ং তুমিও যে মহিমার সেই মহাসম্পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ, তোমার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা যদি তাঁহার মনে সেই ধারণা দৃঢ়মূল করিয়া তুলিতে পার, নিশ্চিত জানিও, তাহা হইলে তুমিই তাঁহার কল্পনা-গগনের একমাত্র সুখসূর্য্য রহিবে, তুমিই তাঁহার সকল কল্যাণী প্রেরণার মূল উৎস থাকিবে। তুমিই তখন তাঁহার সুখ এবং সমৃদ্ধি, তুমিই তখন তাঁহার আনন্দ এবং প্রেম, তুমিই তখন তাঁহার জীবন এবং যৌবন, তুমিই তখন তাঁহার রূপ এবং রস। সেইদিন তোমার তৃপ্তিতেই তাঁহার পরমা তৃপ্তি, তোমার সৌভাগ্যেই তাঁহার মহাসৌভাগ্য, তোমার শান্তিতেই তাঁহার নিত্যা শান্তি।

অবশ্য, একান্ত প্রগল্ভা পত্নীর সম্পর্কে যে ব্যবস্থান্তর গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, তাহা নহে। প্রগল্ভা পত্নীকে প্রগল্ভতার পথেই ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতে হয়। ইহা কতকটা মাথা বাঁচাইবার জন্য টিকি কাটার মত দাঁড়ায়, কিন্তু নিরুপায়স্থলে ইহা অবলম্বনীয়। একথা সত্য যে, ভোগ-লালসার নিবৃত্তি কখনই ভোগ-পথে হইতে পারে না। কিন্তু একথাও মিথ্যা নহে যে, ভোগপথে লালসার উত্তরোত্তর বর্দ্ধন হইতে হইতে এমন একটা সময় আসিয়া পড়ে, যখন লালসার উপযোগী বিষয় এই জড়-জগতে একান্ত অপ্রাপ্য হয়। তখন ভোগার্থী ব্যক্তি বৃহত্তর কিছুকে চাহে কিন্তু সে বুঝিতে পারে না যে, সেই বৃহত্তর বিষয়টী কি, যাহা তাহার লালসা-চঞ্চল মনকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রদান করিতে পারে। যাহাতে মনের এই অবস্থাতে ভোগার্থী তাহার ভোগ্য

প্রগল্ভা পত্নীর রতি-প্রার্থনা পূরণে কৌশল

বস্তুকে শ্রীভগবানের মধ্যে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভগবানেরই প্রেমরসে মজিয়া যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল স্থলে কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে হইবে। এক এক গৃহে প্রগল্‌ভা পত্নীর মনোবৃত্তিও মনোভঙ্গী পৃথক্ বলিয়া সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য কোনও নির্দ্দিষ্ট উপদেশ এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হইল না।

পত্নীর সংযমাবলম্বনে স্বামীর বিপথাচরণের আশঙ্কা

(গ) পত্নীরা আত্মসংযম অবলম্বন করিয়া স্বামীর ভোগেচ্ছায় বাধা জন্মাইলে কামাতুর স্বামীরা বিপথচারী হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়া থাকে, তাহা একেবারে অমূলক নহে। এই আপত্তিটী খণ্ডন করিবার মত কোনও প্রবল যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যে-সমাজে নারীর বহুপতিত্ব নিষিদ্ধ হইবার বহু সহস্র বৎসর পরেও আজ পর্য্যন্ত পুরুষের বহুপত্নীত্ব অচল হইল না, * নারী যে-সমাজে পুরুষের পক্ষে থালা, ঘটী, বাটীর ন্যায় একটা সম্পত্তি মাত্র অথবা তৈল, মৎস্য, মাংসাদির ন্যায় একটা ভোগ্যবস্তু মাত্র এবং যে-সমাজে ইচ্ছা করিলেই একটীকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের বাজার অথবা গণিকার হাট হইতে মনের মতন আরও

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নারী-জাতির প্রতি অকথনীয় অবিচার

দুই দশটী অনায়াসে আনয়ন করা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, সেই সমাজে সংযত-স্বভাবা পত্নীর পক্ষে ইচ্ছা থাকিলেও বৃথা-মৈথুন পরিহারের চেষ্টায় সাফল্যের আশা খুবই কম। যে-সমাজে একটা মিথ্যা অপবাদেই নারীর লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইতে পারে এবং সামান্য স্বার্থের জন্য স্বামীও অনেক সময়ে মিথ্যা অপবাদের দ্বারা স্ত্রীর উপরে

* হিন্দুর বহুবিবাহ-নিরোধক আইন জারি হইবার বহু বর্ষ পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

আক্রোশ মিটাইবার চেষ্টায় লজ্জিত হয় না, অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে কুলটা-সঙ্গ করিলেও পুরুষকে কেহ কাণে ধরিয়া নিমন্ত্রণের পংক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করে না, যে-সমাজে সমগ্র জীবন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিয়াও অপবাদগ্রস্তা অথবা স্বামীরই পৌরুষের অভাবহেতু দুর্ব্বৃত্ত পশুকর্ত্তৃক ধর্ষিতা নির্দ্দোষ নারী একটুকু অনুকম্পার আশ্রয় পায় না অথচ সর্ব্বাঙ্গ উপদংশ-বিষে খসিয়া পড়িলেও পুরুষের সামাজিক কৌলীন্য একরতি কমে না, সেই সমাজে যথার্থ সৎশিক্ষায় সুশিক্ষিতা পত্নীর পক্ষেও উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় অনেক সময়ই উপেক্ষা করিতে হইতেছে। স্বামী যদি সরলস্বভাব হন, তাহা হইলে বুদ্ধিমতী পত্নী ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় কৌশলে জয় করিয়া লইয়া কালক্রমে সংযমের পথে পরিচালন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বুদ্ধিমতী ও কৌশলাভিজ্ঞা পত্নীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই অতি অল্প। আর স্বামী কুটিল-প্রকৃতি হইলে মহা-বুদ্ধিমতীর পক্ষেও কিছু করিয়া ওঠা অতীব কঠিন। তবে, একটী কথা এই যে, স্বামীর অদম্য উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে অসমর্থা হইয়া যে-সকল পত্নী নিজেদিগকে কামের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইতে না দিয়া পারিতেছেন না, তাঁহারা যদি নিয়ত মনে-প্রাণে শ্রীভগবানের চরণে তাঁহাদের মনের

শ্রীভগবান বিপদের বন্ধু

বেদনা জানাইতে থাকেন, তবে অনাথশরণ দীনদয়াল কাঙ্গালের ঠাকুরের কৃপার বাতাসে তরী একদিন উজান বহিতে আরম্ভ করিবেই। প্রার্থনার শক্তি অপরিসীম। স্বামীর জীবনের যে অপূর্ণতাগুলি তাহাকে বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিতেছে, ভালবাসার-জন কেহ যদি ভগবানের কাছে সেই অপূর্ণতা দূর করিয়া দিবার জন্য একাগ্র প্রাণে

প্রার্থনা করে, তবে তাহা সফল না হইয়াই পারে না। বিশেষতঃ ভগবৎ-সমর্পিতপ্রাণা নারীর গর্ভজাত সন্তানেরা প্রত্যেকেই মায়ের নিকট হইতে কতকগুলি বাঞ্ছনীয় কল্যাণ-প্রেরণা লইয়া আসিবেই।

(ঘ) বিবাহিতেরা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইলে স্বামি-পত্নীর অনুরাগের হ্রাস হইবে এবং তাহার ফলে সংসারের সুখ বিনষ্ট হইবে, এইরূপ আশঙ্কা প্রকৃতই অমূলক। কারণ, যথার্থ অনুরাগ একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা হইতেই জন্মে, শ্রদ্ধাতেই তাহা বর্দ্ধিত হয়।

শ্রদ্ধাই স্থায়ী অনুরাগের মূল

যাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই, যাহার প্রতি আমার নিয়ত-প্রশংসমানা দৃষ্টি নাই, যাহার চিত্তাকর্ষিণী গুণাবলী আমাকে সতত মুগ্ধ করে না, তাহার প্রতি আমার যে অনুরাগ, তাহা নিতান্তই হেয় এবং ক্ষণভঙ্গুর। প্রথম দর্শনের ভালবাসা (Love at First Sight) প্রকৃত প্রস্তাবে দেহপিপাসা বা রূপ-লালসারই নামান্তর,—দেখিয়া দেখিয়া পুরাতন হইয়া গেলে এইরূপ ভালবাসার বস্তুটী আর নয়নানন্দ রহে না।

দৈহিক আকর্ষণজাত অনুরাগ ক্ষণস্থায়ী

দেহের জন্য দেহের যে আকর্ষণ, তাহা দেহকে পাইবার পরে আর থাকে না। তখন প্রথম-দর্শনের ভালবাসা অতিদর্শনের বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়। পরন্তু, শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া যে ভালবাসার সৃষ্টি, তাহার লক্ষ্য দেহটার মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, সে তাহার প্রিয়জনের সসীম বিকাশের মধ্যে একটা অসীম চৈতন্যের স্পর্শ পাইতে চাহে, দেহকে পাইল কি না-পাইল সে দৃষ্টি তাহার নাই, পিপাসা তাহার অফ্‌রন্ত, প্রাপ্তি ও তাহার অফুরন্ত, পাওয়ার এখানে শেষ নাই এবং বিতৃষ্ণার এখানে অবকাশ নাই। ভ্রমর-স্বভাব মানব-মানবী এক ফুলের মধুপান করিয়াই অপর ফুলে যাইয়া বসিতে চায়। আর,

চাতক-স্বভাব মানব-মানবী একমাত্র পূর্ণচন্দ্রমারই জ্যোছনা-মাখান অমিয় পানের জন্য আমৃত্যু-একনিষ্ঠায় সুনীল গগনের মলয়-তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়।

ভ্রমর-ধর্ম্মীর প্রেম ও চাতক-ধর্ম্মীর প্রেম

দেহের আকর্ষণই যাহাদের অনুরাগের মূল, তাহারা সঙ্গীর বা সঙ্গিনীর দেহটীকে মোহমত্ততার বশে পরম-সুখের আকর ভাবিয়া খুব কয়েকদিন নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া তারপর অনুরাগের জোয়ারে ভাঁটার তীব্র টান অনুভব করে। ইহারা ভ্রমরধর্ম্মী। পারস্পরিক শ্রদ্ধাই যাহাদের অনুরাগের মূল, তাহারা সঙ্গীর বা সঙ্গিনীর দেহটাকে প্রায় ভুলিয়াই যায় এবং একের চিন্তার উদারতা, বাক্যের মধুরতা ও কার্য্যের সরসতা অপরকে এমন এক অসীম কল্পনার গহন-নীলিমার মলয়-কম্পিত তরঙ্গ-প্রবাহে ভাসাইয়া দেয়, যেখানে প্রাণপ্রিয়কে লক্ষ বৎসর বুকে ধরিয়াও আত্মহারা চিত্ত চির-বিরহের সুমধুর জ্বালা ভুলিতে চাহে না, লক্ষ বৎসর প্রাণের জনকে চোখে চোখে রাখিয়াও দেখিবার সাধ আর মিটে না। ইহারা চাতক-ধর্ম্মী। ইহাদের প্রেম চিদায়তন বিদেহী প্রেম, তাই ইহা অনন্ত, অফ্‌রন্ত। সংযম-সাধনা এই প্রেমকে সুলভ করে। সহজপ্রাপ্য করে। ভ্রমরের প্রেম সীমাবদ্ধ ক্ষণিক প্রেম, দেহায়তন ভোগলুব্ধ প্রেম, কারণ ইহাতে দেনা-পাওনার হিসাবটাই সব। চাতকের প্রেম অসীম চিরস্থায়ী, কারণ ইহাতে দেনা-পাওনার বিস্মৃতিটাই মুখ্য। ভ্রমর পাইলেই খুসী, না পাইলে অখুসী। চাতক পাইলেও যেমন, না পাইলেও তেমন, প্রাণপ্রিয়কে ভালবাসিয়াই সে তৃপ্তিমান। এই যে আদর্শ প্রেম, ইহা ব্রহ্মচর্য্য-কল্পপাদপেরই দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত অপূর্ব্ব ফল। অল্পেই যাহাদের দৃষ্টি, অল্পেই যাহাদের তুষ্টি, সেই দেহভোগী, রূপলোভী, স্তোকসুখী মানবের উহাতে অধিকার কোথায়? দেহসুখের

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর সুখকে যাঁহারা দাম্পত্য-জীবনের যুগল-সাধনায় লাভ করিতে প্রয়াসী, সেই বৃথা-মৈথুন-পরিত্যাগী স্বামী এবং পত্নীরই প্রেমরূপ অমৃতফল আস্বাদনের সৌভাগ্য ঘটে।

বৃথা কথায় কাণ দিও না

হে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণ যুবক-যুবতি! তোমরা আজ বৃথা কথায় কাণ না পাতিয়া নিজেদের ব্রহ্মচর্য্য-পুষ্ট ঔরসে এবং সংযমশুদ্ধ জঠরে ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবকে জন্মদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা তোমাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত করিবে বলিয়া অনভিজ্ঞেরা যে হট্টগোল সৃষ্টি করিতেছে, তোমরা তাহাতে ধীর ও অচঞ্চল থাকিয়া আত্মবিশ্বাসের সহায়তায় দিনের পর দিন জীবনগঠন করিতে যত্নবান্ ও যত্নবতী থাক। নিয়ত আত্মোন্নতির চেষ্টা দ্বারা তোমরা পরস্পরের শ্রদ্ধা আকর্ষণের যোগ্য ও যোগ্যা হও এবং শ্রদ্ধা-সম্বর্দ্ধিত অপরিমেয় প্রেমের দ্বারা একে অন্যের হৃদয় এবং মনকে বেষ্টন করিয়া ধর। সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য তোমরা তোমাদের আত্মগঠনপরায়ণ বাহুযুগলকে বিস্তারিত কর এবং যে বাহু দেহের প্রার্থনাকে আত্মার প্রার্থনা অপেক্ষা বড় করিয়া গড়ে, সেই কামপরায়ণ বাহুযুগলকে গুটাইয়া আন। নিশ্চিত বিশ্বাস করিও, জগতের যাঁহারা দুঃখ দূর করিবেন, বিশ্বকে যাঁহারা দৈন্যমুক্ত করিবেন, তোমাদের বিবাহিত জীবন তাঁহাদেরই ভূমিষ্ঠ হইবার ভূমিকা। তোমাদের দাম্পত্য শুদ্ধতায় তোমাদেরও কল্যাণ, তাঁহাদেরও কল্যাণ, দেশের, দশের, জাতির ও সমাজের প্রত্যেকের কল্যাণ। আত্মকল্যাণের মুখ চাহিয়া তোমরা তোমাদের অমিতাচার পরিহার করিও, ভবিষ্যৎ যুগে তোমাদেরই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যাঁহারা স্বভাব-ব্রহ্মচর্য্যের অমূল্য সম্পদ লইয়া জীবনের পথ চলিবেন, তাঁহাদের কল্যাণের

মুখ চাহিয়া তোমরা চিত্তের দুর্ব্বলতার সময়ে আত্মদমন করিয়া স্বস্থ হইও।

(৬) দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে লোকসংখ্যা কমিয়া যাইবে বলিয়া যে জুজুর ভয় দেখান হয়, তাহাও সম্যক্ ভিত্তিহীন। বরঞ্চ একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাবে যে, বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য্য শুধু যে লোকসংখ্যাই বর্দ্ধিত করিবে, তাহা নহে, নবজাত সন্তান-সন্ততিগুলিকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা শক্তিতে, সামর্থ্যে, বুদ্ধিতে, মেধায় ও মনীষায় শ্রেষ্ঠ করিবে।

লোক-সংখ্যা হ্রাসের জুজুর ভয়

বিভিন্নপন্থী সমাজ-সংস্কারকেরা নিজ নিজ কর্ম্মতালিকার প্রতি একান্ত অনুরাগ নিবন্ধন জাতীয় ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, শিশু-মৃত্যুর আধিক্যই যে জাতীয় ক্ষয়ের প্রধানতম লক্ষণ এবং প্রাগ্‌দাম্পত্য ও বিবাহিত জীবনের অদমিত অসংযমই যে শিশু-মৃত্যুর প্রধানতম কারণ, এই কথাটীকে অস্বীকার করিয়া যাইবার উপায় কাহারও নাই। বিবাহিত জীবন হইতে যদি অসংযম দূরীভূত হয় এবং কুমার ও কুমারী-জীবনে কঠোর আত্মগঠনের পরে যদি নরনারী গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে শিশু-মৃত্যু প্রশমিত না হইয়াই পারিবে না।

শিশু-মৃত্যুর আধিক্যই জাতীয় ক্ষয়ের প্রধানতম কারণ

ব্রহ্মচারী জনক-জননীর সন্তানেরা স্বভাবতঃই সুস্থ, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী হইবেন এবং অকালমৃত্যু স্বভাবতঃই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তাঁহাদের রোগ-প্রতিরোধক সামর্থ্যও বর্ত্তমান মানবদের অপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে। দুর্ভিক্ষের মূল কারণ "আলস্য শত্রুকে" এবং

দাম্পত্য সংযম শিশুমৃত্যু প্রশমিত করিবে

অপরাপর অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণসমূহকে সমূলে ধ্বংস করিতে তাঁহারা অধিকতর সমর্থ হইবেন। রণক্ষেত্রে কোটি কোটি মানব-জীবন বলি দিলেও নিজেদের গৃহত্যক্তা সহধর্ম্মিণীদের জঠরে বা ক্রোড়ে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বীজ অথবা অঙ্কুর তাঁহারা রক্ষা করিয়া যাইতে পারিবেন। সর্ব্বব্যাপীভাবে গৃহিজীবনকে যদি একবার সংযম-পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ভারত যে অভ্যুত্থান লাভ করিবে, তাহা হাহাকার-সঙ্কুল মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রতাপে অথবা নরশোণিতলুব্ধা তৃষ্ণাতুরা ধরিত্রীর বক্ষে কুরুক্ষেত্রের পুনরভিনয়ে আর কখনও মাথা নত করিবে না।

সম্প্রতি ইটালিতে মুসোলিনী, জার্ম্মেনীতে হিট্‌লার এবং রাশিয়াতে ষ্টালিন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ নিজ নিজ জাতির জনসংখ্যা বর্দ্ধনের জন্য নানাভাবে প্রয়াস-পরায়ণ হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের দেশের অনেকের অনুকরণস্পৃহা জাগ্রত হইতে পারে। বহুসন্তানের জনক-জননীদিগকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়া প্রত্যেক দম্পতীকে অত্যধিক পরিমাণে অপত্যোৎপাদনে প্রথমোক্ত দেশদ্বয়ে ধারাবাহিকভাবে উৎসাহিত করা হইয়াছিল এবং শেষোক্ত দেশে পরোক্ষভাবে জন্ম-সংখ্যা-বৃদ্ধির সহায়তা করা হইতেছে। কিন্তু যে কারণ বশতঃ ইটালি ও জার্ম্মানীকে বেপরোয়াভাবে সন্তান-সংখ্যা বর্দ্ধনে চেষ্টা পাইতে হইয়াছিল এবং যে কারণে রাশিয়াতে তাহার পরোক্ষ প্রয়াস হইতেছে, ভারতবর্ষে ঠিক অনুরূপ কারণ যদি বিদ্যমান থাকেও, তথাপি বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় নবজাত সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষা-দানের সৌকর্য্য নাই বলিয়া, নবজাত শিশুগুলিকে দারিদ্র্য-প্রভাবজ

য়ুরোপের জনসংখ্যাবৃদ্ধির আন্দোলন

ব্যাধির ব্যূহবদ্ধ আক্রমণ হইতে রক্ষা করার কোনও উপযুক্ত সম্ভাবনাও নাই। ফলে, অফুরন্ত সন্তান-জননের প্রয়াস বর্ত্তমান ভারতবর্ষে কোনও রাজনৈতিক উপযোগিতাও রাখে না। বিগত ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের এবং তৎপরবর্ত্তী বল্কান-সমরের পরে বল্কান প্রদেশে অভ্যুদ্গত বুলগেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বহু-বিবাহের প্রচলন করিয়াও লোকসংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু যেই কারণে সেই চেষ্টা চলিয়াছিল, ভারতে সেই কারণের অসদ্‌ভাব। মহম্মদীয় ধর্ম্মে জনসংখ্যা বর্দ্ধনার্থে বহু-বিবাহকে সমর্থন করিতে কৃপণতা নাই,—কারণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রথম প্রচার-কালে ইস্‌লাম-বিদ্বেষী প্রতিবেশীদের অন্যায় নির্য্যাতন বশতঃ সাময়িক ভাবে অতি দ্রুত স্বকীয় সম্প্রদায়ে জনবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছিল। কিন্তু দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য ভাবে অফুরন্ত সন্তান-জনন করিয়া গেলে সমাজ কিরূপ লোকসমূহের দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহাও চিন্তনীয়। ইস্‌লামের উপাসক হইয়াও মুস্তাফা কামালপাশাকে তলোয়ারের জোরে বহুবিবাহ রুদ্ধ করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন সমাজে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন সময়ে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় জীবনে তাহার অন্ধ অনুকরণ করিতেই হইবে, এমন কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। আবার, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বেপরোয়া লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির উৎপাতে অধীর হইয়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র (United States) প্রভৃতি দেশে একদল সামাজিক-আন্দোলনকারী কৃত্রিম জন্ম-নিরোধের কদর্য্য ও নিন্দনীয় চেষ্টা করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে অবাধ জন-বৃদ্ধির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিই প্রকটিত করিতেছে এবং ইহা হইতে এই কথাই প্রতীত হয় যে, জন্ম-সংখ্যা

যেন-তেন-প্রকারেণ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই মস্ত বড় একটা কাজ হইয়া গেল না, সময় সময় জন্মবৃদ্ধিও সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। অবশ্য, ভারতে জন-বৃদ্ধি অনাবশ্যক, এইরূপ কথা আমরা বলিতেছি না। পরন্তু তালে বেতালে জন-বৃদ্ধি ঘটাইলেই যে তাহা দ্বারা ভারত মঙ্গলান্বিত হইবে, এমন অর্থহীন যুক্তির সঙ্গতিকেই মাত্র আমরা অস্বীকার করিতেছি।

এস্থলে আর একটী কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে-কোন দেশের জন্ম এবং মৃত্যুর হার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে যখনই যে দেশে জন্মের সংখ্যা বাড়িয়াছে তখনই সে দেশে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ফলে জন্মসংখ্যার বর্দ্ধনে দেশের লোক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই। লোক-সংখ্যা বর্দ্ধনের কৌশল নিরবচ্ছিন্ন সন্তান-জননকারীর হস্তে নহে, মৃত্যুসংখ্যা-হ্রাসকারীই দেশের প্রকৃত লোকসংখ্যার বর্দ্ধনকারী, কারণ মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস করিবার উপায়ই যথার্থ প্রস্তাবে লোকসংখ্যা-বর্দ্ধনের নির্ভুলতম উপায়।

মৃত্যুসংখ্যার হ্রাসকারীই দেশের প্রকৃত লোকসংখ্যা-বর্দ্ধনকারী

তথাপি, যুক্তি দ্বারা বাধ্য না হইলেও তর্কস্থলে যদি একথা স্বীকার করিয়াই লই যে, জন্মসংখ্যা বর্দ্ধনের দ্বারা লোকসংখ্যা প্রকৃতই বাড়ে, তাহা হইলেও প্রমাণিত হয় না যে, ইহাতে জাতীয় উন্নতি বর্দ্ধিত হয়। অন্ধ, আতুর, অনাথ, অক্ষমের দলবৃদ্ধিতে প্রকৃতই কি সমাজের বলবৃদ্ধি হয়, না বলক্ষয় হয়? যাহারা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে পারিবে না, নিজেদের দুঃখ নিজেরা ঘুচাইতে পারিবে না, নিজেদের দুর্ভাগ্যকে নিজেরা চূর্ণ করিতে পারিবে না, তাহাদের দ্বারা কি দেশ ও সমাজ লাভবান্ হয়? চিরকাল যাহারা পরপদানত হইয়া

অক্ষমের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে সমাজের বলবৃদ্ধি হয় না

থাকিবে, চিরকাল যাহারা পরের মুখে ঝাল খাইবে, চিরকাল যাহারা পরের অনুগ্রহের কাঙ্গাল হইয়া রহিবে, চিরকাল যাহারা পরের দেওয়া ভিক্ষান্নকে সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করিয়া আত্মশক্তির ব্যবহারে অলস ও কুণ্ঠিত রহিবে, সেই ভিক্ষুকের পালের জন্ম দিয়া লোকসংখ্যাবর্দ্ধন করিলেই কি ভারতবর্ষ তাহার যথার্থ গৌরব ও মহিমার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে? একটি দুইটী প্রকৃত মানুষের মূল্য অপেক্ষা দুই দশ লক্ষ শূকর-শাবকের মূল্যকে অধিক বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিলেই কি আমাদের মুক্তি-বঞ্চিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রেতাত্মার অফুরন্ত তৃষ্ণার অবসান ঘটিবে? কোটি কোটি নপুংসকের বাচ্চা দিয়া আসমুদ্র হিমাচল বন্যাপ্লাবিত করিয়া ফেলিতে পারিলেই কি ভারতীয় জাতির সেই সুমহান্ অভ্যুদয় লাভ হইবে, যাহার জন্য আজ ছোট-বড়, ধনি-নির্ধন প্রত্যেকের প্রাণে এক অদম্য অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষার জাগরণ অনুভূত হইতেছে?

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে অসহনীয় যন্ত্রণা এবং দৈহিক অধঃপতনের শাস্তি সহিয়া জননীরা বৎসরের পর বৎসর অবিশ্রামে সন্তান-প্রসব করিয়া যাইতেছেন, তাহা যে শুধু নারী জাতিকেই মৃত্যুম্লান করিতেছে তাহা নহে, তাহা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই জন্য পরোক্ষভাবে মৃত্যুই আহরণ করিতেছে। তদুপরি, অকাল-মরিষ্ণু বহুসংখ্যক সন্তান-সন্ততির গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষার ব্যবস্থায় যে পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইতেছে এবং এক এক জনের অকাল-মৃত্যুর দ্বারা সেই ব্যয় ও পরিশ্রম যে ভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাহাতে একথা বলা চলে না

অবিশ্রান্ত সন্তান-প্রসব স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে

যে, ডজনের বা কুড়ির হিসাবে সন্তান-জনন করিয়া গেলে মরিয়া-তরিয়া যাহারা থাকিবে, তাহারা জাতীয় উন্নতিরই সাক্ষ্য যোগাইবে। বরঞ্চ যে কুসুমকলি-গুলি ফুটিবার আগেই ঝরিয়া গেল, যদি তাহারা মোটেই জন্মপরিগ্রহ না করিত, তাহা হইলে যেগুলি যাইতে যাইতে রহিয়া গেল, নিতান্তই মরার মত রহিয়া গেল, সেই নির্জ্জীব দুর্ভাগাগুলি বহুপ্রসবক্লান্তা রুষ্টস্বভাবা জননীর তর্জ্জনের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যসুখ-হৃষ্টা প্রফুল্লাননা জননীর স্নেহ প্রাণ ভরিয়া পাইত, দারিদ্র্য-পীড়িত রুক্ষচেতা পিতার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হৃষ্টচেতা পিতা তাহাদিগকে অধিকতর পুষ্টিকর আহারীয় যোগাইতে পারিত, তাহাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্মেষের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে অপরাঙ্মুখ হইত।

বহু সন্তান-সন্ততি জননের অর্থনৈতিক দিক

তাই বলি হে ভারতপ্রেমিক যুবক-যুবতি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আজ তোমরা দাম্পত্য দায়িত্বের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া লও, স্থির বুদ্ধিতে আজ তোমরা পারিবারিক জীবনের সুখ ও দুঃখের প্রকৃত নিদান বুঝিয়া লও। একপাল স্বদেশ-দ্রোহী স্বজাতিদ্বেষী অন্নের কাঙ্গালের জন্ম দিয়া তাহাদের চিরদারিদ্র্য-দুঃখের দায়িত্ব তোমরা নিজেদের স্কন্ধে লইবে কি না, আজ ভাবিয়া দেখ। হাহাকার-পরায়ণ তীর্থকাকের গোষ্ঠীর জন্ম দিয়া নিজেদের বিধিদত্ত দুঃখকষ্টের পরিমাণ ও গভীরতা বাড়াইয়া লইবে কিনা, আজ তাহা বুঝিয়া দেখ। নিত্য-রোগ-কাতর অস্বাস্থ্যপীড়িত সজীব মৃতদেহগুলির জন্ম দিয়া চিকিৎসকের দর্শনীর সাথে সাথে প্রতি গৃহে মিশরের শবদেহের প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা পাকা রকমে করিয়া লইবে কিনা, তাহা আজ বিচার করিয়া দেখ। প্রতি বৎসরেই একটী করিয়া নবজাত শিশুকে তোমার অস্বাস্থ্যকর

প্রকৃত মঙ্গল বহু সন্তান-জননের পথে? না সংযমের পথে?

অন্নহীন গৃহকোণে নিমন্ত্রণ দিতে গিয়া শিশুমৃত্যু ও প্রসূতি-মৃত্যুর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে দেশ ডুবাইয়া দিবে কিনা, তাহা আজ ভাবিয়া দেখ। দেশের লোকসংখ্যা বাড়াইবার মিথ্যা যুক্তিতে ভুলিয়া তোমরা নিজেদের দেহের স্বাস্থ্য, মনের বল, চিত্তের স্বাধীনতা ও হৃদয়ের সজীবতা বিসর্জ্জন দিবে কিনা, আজ নির্দ্ধারিত করিয়া লও। তোমরা আজ তোমাদের অন্তরাত্মাকে তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ পথে তোমাদের প্রকৃত মঙ্গল, বহু-সন্তান-জননের পথে, না সংযমের পথে?

অবশ্য, জনন-নিরোধের পাশ্চাত্য পন্থা লইয়াও কেহ কেহ অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু তাহার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

(চ) দাম্পত্য জীবনে মৈথুন বর্জ্জন করিলে স্বামী বা স্ত্রীর দেহে রোগ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের আয়ুষ্কাল হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের বিরুদ্ধে এক প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সত্যতা কতটুকু আছে, তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখিব। রোগ বাস্তবিকই জন্মে কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা আয়ুঃক্ষয়-সম্পর্কিত আপত্তিটুকুরই বিচার করিব।

ধরা যাউক, যেন দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে বাস্তবিকই আয়ুঃক্ষয় হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, হিতাহিত-বুদ্ধি-বর্জ্জিত হইয়া অবিরাম কামচর্চ্চা চলিলেই কি আয়ুর বৃদ্ধি হইবে? দাম্পত্য সংযমে আয়ুর হ্রাস হইতে পারে বলিয়া তর্কস্থলে বরং স্বীকারই করিলাম। কিন্তু অফুরন্ত ইন্দ্রিয়-সঙ্গমে আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া বাতুলেও কি বিশ্বাস করিবে?

তারপর রোগের কথা। শত শত সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিনিয়ত স্ত্রী-সম্ভোগ বা স্বামি-সংসর্গ করিতেছে,—কিন্তু তাহারা কি কেহ

নীরোগ ? মৈথুন-বর্জ্জনেরই ফলে বহু বহু রমণী হিষ্টিরিয়া বা যোষিতাপস্মার রোগে আক্রান্তা হইয়া থাকেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যদি সত্য হয়, সম্ভোগ-বর্জ্জন করেন নাই, এমন সহস্র সহস্র রমণী কেন আমার আশ্রম-দুয়ারে হিষ্টিরিয়া রোগা-রোগ্যের আশায় উপনীতা হন ? অমৈথুন জরায়ুজ রোগের কারণ নহে, অতিমৈথুনই প্রধানতম কারণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কারণ চিত্তের প্রচ্ছন্ন কাম-সংস্কার। কামুক চিত্ত জরায়ু (Uterus) ডিম্বা-ধারদ্বয় (Ovaries), সুপ্রারেনাল কর্টেক্স (Suprarenal Cortex), থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড (Thyroid Gland) প্রভৃতি প্রবণস্বভাব শারীরিক যন্ত্রপাতির উপরে এমন ক্রিয়া-বিস্তার করিয়া থাকে, যাহাতে উক্ত গ্রন্থিগুলির স্বাভাবিক রসনিঃসারণ-ক্ষমতার বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে—ফলে রোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। অমৈথুন

মৈথুন বর্জ্জনে রোগাশঙ্কা

রোগের উৎপাদক নহে,—দূষিত চিন্তারাশিই রোগের প্রকৃত উৎপাদক। দাম্পত্য-ব্রহ্মচর্য্য-প্রয়াসী যুবক-যুবতীরা অল্প চেষ্টা করিলেই চিত্তের দূষণীয় প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিতে পারেন এবং কার্য্যকালাভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশ পাইলে প্রচ্ছন্ন ভোগ-সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারেন। প্রচ্ছন্ন ভোগ-সংস্কারকে উন্মূলিত করিবার আধ্যাত্মিক পন্থা পাশ্চাত্য রতিশাস্ত্রজ্ঞ মনীষীদের নিকটে আজও সম্যক্ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়াই ভিয়েনার ডাক্তার ফ্রয়েড্ প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কেবল যৌনস্ফূর্ত্তিই দেখিয়াছেন। তাঁহারা ভুল দেখিয়াছেন, এমন বলিতে পারি না। ভোগভূমি পাশ্চাত্য দেশসমূহে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বভাবতঃই প্রায় প্রত্যেক নরনারী আজন্মই এই ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, নরনারীর মৈথুন-মিলনটী মনুষ্য-জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি, একটা

চরম অধিকার এবং একটা চূড়ান্ত সুখ। এই সুখকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের জীবন-দর্শন রচিত হইয়াছে। এই সুখকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের পারিবারিক জীবনের গঠন-প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে। এই সুখকে জীবনের সকল সুখের পুরোভাগে রাখিয়া তাঁহাদের সামাজিক বিন্যাস, সামাজিক মেলামেশার সুযোগ, জাতীয় আনন্দোৎ-সবের ধারা, সঙ্গীত, শিল্প, চিত্র-বিদ্যা, সাহিত্য আদি মানব-মনের অনুশীলনের নানা রূপায়নের রুচি ও প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। সেই দেশে অধিকাংশ মানবের অধিকাংশ ব্যাধিরই মূল যে অতৃপ্ত যৌন-সুখাকাঙ্ক্ষা, এই বিষয়ে মতভেদের অবসর কোথায় ? ভারতে বিবাহিত ব্যক্তি অপরের স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকিলে তাহা অত্যন্ত দোষাবহ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়, পাশ্চাত্য দেশে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন-দর্শনের পার্থক্য

রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলে নিজের স্ত্রীকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া পথ চলিতে সাহায্য করিবার জন্য বন্ধুর হাতে ছাড়িয়া দিয়া বন্ধুর স্ত্রীর বাহু নিজ বাহুতে জড়াইয়া পথ-বিচরণ ভদ্রাচার বলিয়া গণ্য হয়। ভারতে বিবাহাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচলিত তরল আমোদ-প্রমোদে নরনারীর মধ্যে নানা রসিকতার প্রশ্রয় থাকিলেও তাহা নির্দ্দিষ্ট কয়টী দিনের গণ্ডী পার হইয়া গেলেই দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয়,—পাশ্চাত্য দেশে পরস্ত্রীর বা নিঃসম্পর্কিতার কটিদেশ বাম হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সর্ব্বশরীর সর্ব্বশরীরের সন্নিহিত করিয়া "বল্"-নৃত্যানুষ্ঠান (Ball Dance) করিবার জন্য সমস্ত বৎসরের প্রতিটি তারিখই প্রশস্ত এবং এই নৃত্য দ্বারাই সাধারণতঃ প্রথম-পরিচিত বিশেষ খাতিরের লোককে অভ্যর্থনা করা সভ্যতা-সম্মত। ভারতে বিবাহ করিবার সময়ে "মা, তোমার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি" এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বর ভাবী শ্বশুরের গৃহে সদলবলে রওনা হয়, বিবাহ করিয়া কনে নিয়া গৃহে

ফিরিবার সময়ে নবপরিণীতা পত্নীর কাণে কাণে বর এই কথাটী বলিয়া দিতে প্রায়ই ভুল করে না,—"দেখিও, আমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ, তাঁহাদের নিজ মাতা-পিতা জ্ঞানে কিন্তু সেবা করিও, তাহা হইলেই সংসার মধুময় হইবে"। নববধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবার মধ্য দিয়াই জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য-পালন আরম্ভ করে,—পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের পরেই উপার্জ্জনক্ষম যোগ্য পুত্র নিজ বধূটীকে নিয়া প্রথমে বাহির হন পঞ্চদশদিবসব্যাপী "মধুযামিনী" (Honey Moon) যাপন করিবার জন্য এবং এই প্রমোদ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বধূ লইয়া আর পিতৃগৃহে ওঠেন না, প্রেমের কপোত-কপোতী নিজেদের জন্য আলাদা নীড় নির্ম্মাণ করেন, কারণ পিতামাতার চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে যে তাহাদের প্রেমানুশীলনের ব্যাঘাত হইবে! ভারতের বধূ স্বামীর কাছ হইতে স্নেহ-প্রেম, আদর-সোহাগ, দয়া-দরদ পাইলেই একেবারে গলিয়া যায়, সহবাস-সুখ একটু কম হইল কি বেশী হইল, ইহা নিয়া অস্থির হইয়া পড়ে না;—পাশ্চাত্য বধূ বিবাহের প্রথম দিক দিয়াই যদি দেখে যে, স্বামীর সহবাস-সামর্থ্য কম, তাহা হইলে তাহার মাথা গরম হইয়া যায়, এত দিন "কোর্টশিপ" করিয়া শেষে নাকি নিজে পছন্দ করিয়া একটা অপদার্থের সঙ্গে আজীবনের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিল ভাবিয়া সে শতবার আত্মধিক্কার দেয়, কেহ কেহ মনের দুঃখে আধমরা হইয়া অনিচ্ছুকা পত্নীর জীবন যাপন করে, কেহ কেহ নৈশ-ক্লাবের সদস্যা হইয়া দুধের পরিবর্ত্তে ঘোল খোঁজে বা একই সঙ্গে "দুড"ও খায়, "টামাক"ও খায়, কেহ কেহ বিবাহ-বিচ্ছেদের উকিলের বাড়ী পরামর্শের জন্য যায়। প্রত্যেকের পক্ষেই ইহা সত্য, এমন দুঃসাহসের কথা বলিতে পারিব না।

ভারতীয় বধূর বিশেষত্ব

পশ্চিমী সভ্যতার সমস্যা

কিন্তু এই চলচ্চিত্ত অবস্থা হইতে তরুণী বধূদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় তথা য়ুরোপের প্রতি দেশে এত হাজার হাজার বহি লিখিত হইয়াছে যে, এই অবস্থাকে একটা "ঘটনা" মাত্র বলিয়া আখ্যা না দিয়া পশ্চিমী সভ্যতার একটা "সমস্যা" বা "সঙ্কট" বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সমস্যার সমাধান, এই সঙ্কটের মোচন ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ প্রজ্ঞার বলে মনের দিক দিয়াই চমৎকার ভাবে করিয়াছেন, যাহার সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাশ্চাত্য জগৎকে আরও কয়েক শতাব্দীকাল এই ভারত-বর্ষের শরণাপন্ন ও শিষ্য হইতে হইবে। লীলাভূমি ভারতবর্ষ কামকে প্রেমের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া দৈহিক রতি-ক্ষুধা ও কাম-তৃষ্ণার অবসান পন্থা উন্মোচিত করিয়াছেন। ভোগভূমি পাশ্চাত্য দেশসমূহ পুরুষ ও নারীর জান্তব সুখানুভূতিকে বারংবার পর্য্যবেক্ষণাধীন ও গবেষণার বিষয় করিয়া কতকগুলি মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গেলে তাহা মোটামুটি এই। (ক) সঙ্গম-কালে নারীর প্রবল কামেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়গত পরিস্ফীতি (tumescence) পুরুষ অপেক্ষা অনেক পরে ঘটিয়া থাকে, এজন্য অধিকাংশ পুরুষেরই শুক্রক্ষয় ঘটিয়া যাইবার কালে নারী হয়ত উত্তেজনার মধ্যপথেই থাকিয়া যায়। (খ) তাহার অতৃপ্ত কামনা তাহার নিদারুণ আশাভঙ্গের কারণ হয়। (গ) সুতরাং স্নেহ, আদর, ভালবাসা ও আঙ্গিক প্রক্রিয়াদি (love-play) দ্বারা পত্নীকে পূর্ব্বেই উত্তেজনার এক চূড়ান্ত পর্য্যায়ে না আনিয়া পতির পক্ষে লৈঙ্গিক সংযোগ করা উচিত নহে।—এই তিনটী মূলসূত্র ধরিয়া তাঁহারা বিবাহিত নরনারীদের অত্যধিক সম্ভোগ-সুখ লাভ করিবার জন্য নানা প্রক্রিয়ার

নরনারীর জান্তব সুখানুভূতির তিনটী মূলসূত্র

অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেক সম্ভোগ-সুখে অনাগ্রহিণী পত্নী আগ্রহবতী হইয়া স্বামীকে সুখী করিয়াছে, অনেক স্বল্পসম্ভোগরুষ্টা পত্নী স্বামীর কাছ হইতে অত্যধিক প্রগাঢ়তা-বিশিষ্ট সম্ভোগ-সুখ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছে,—কিন্তু ইহার ফলে কাহারও কি আরও সম্ভোগের কামনা মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে? পাশ্চাত্য গবেষণাকারীরা যেই সকল উপায় বা প্রক্রিয়ার সন্ধান দিতেছেন, তাহার মধ্যে গ্রন্থিরস-নিঃসারণ সম্পর্কিত (endocrine) চিকিৎসা ব্যতীত আর প্রত্যেকটী বিষয় ভারতবর্ষে সুপরিজ্ঞাত ছিল। তান্ত্রিক যোগীরা ত' কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে পতি-পত্নীর মৈথুন-সম্ভোগ ব্যাপারে সম্ভব-অসম্ভব সকল পরীক্ষা করিয়া চুকিয়াছেন। এক এণ্ডোক্রিণ চিকিৎসা ব্যতীত পাশ্চাত্য দেশ পতি-পত্নীর মৈথুন-মিলনকে প্রগাঢ়সুখদাতা করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত আর নূতন কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অন্য সকল আবিষ্কারই ভারতের দৃষ্টিতে সেকেলে। পাশ্চাত্য যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের মধ্য-বর্ত্তিতায় জনসমাজে সুপ্রচারিত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। হাজার হাজার গুপ্ত চিকিৎসালয় (Private Clinic) খুলিয়া যৌন-ব্যাপারে সহায়তাপ্রার্থী লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কেবল গম্ভীরতর সম্ভোগ-সুখ লাভ করিবার কৌশল বলিয়া দিবার জন্যই কত মেধাবী পণ্ডিত নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল "উৎকৃষ্ট সম্ভোগ", "পুরাদস্তুর তৃপ্তি" বা "প্রগাঢ়তম সুখ" পাইবার পরেই কি মানুষের দেহ ও মন হইতে সেই ব্যাধিসমূহ দূর হইবে, যাহা রাজা যযাতির সহস্র বৎসর যৌবন উপভোগের পরেও দেহ-মন হইতে দূর হয় নাই? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সর্ব্বসাধারণকে "যযাতির যৌবন" দিবার চেষ্টা

করিতেছেন, কিন্তু যযাতির পরিণাম ভারতবর্ষ স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তাই তাহার সভ্যতার মূলদেশে ভোগ-কামনাকে না বসাইয়া ভোগ-সংযমকে বসাইয়াছে। ইহারই ফলে পাশ্চাত্য দেশের অনেক উৎকট মানসিক ব্যাধি এখনও ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। ইংরাজী ১৯১৪ সনের চারি বৎসরব্যাপী লোকক্ষয়কর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামরিক বিরতির সন্ধিপত্র (Armistice) যেদিন স্বাক্ষরিত হইল, সেদিন পৃথিবীর কোথায় না আনন্দোল্লাস সৃষ্ট হইয়াছিল? কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ কি একই রীতিতে আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছিল? আমরা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে পাঠ করিয়াছি যে, সেইদিন সম্পর্কিত-নিঃসম্পর্কিতের বিচার ছিল না, পরিচিত-অপরিচিতের হিসাব ছিল না, লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায়, পার্কে পার্কে প্রকাশ্যভাবে নরনারীরা নির্লজ্জভাবে যৌনসম্ভোগ করিয়া অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। শুনিয়াছি, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যাহা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা চলে না। আর এই সেইদিন ভারতবর্ষ দুইশত বৎসর পরে স্বাধীনতা পাইল, সে মন্দিরে মন্দিরে পূজা করিয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করিল, নরনারীদের যৌন-সম্ভোগের প্রদর্শনী করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার কল্পনা তাহার মাথায় ঢোকে নাই। নাড়ীর এই একটী স্পন্দন হইতেই ভারতের ও পাশ্চাত্যের মেজাজের পার্থক্য বুঝা যাইবে। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে প্রগাঢ় সুখ-সম্ভোগের আবশ্যকতাকে শতবার স্বীকার করিয়াও ভারতবর্ষ এই কথা কখনও মানিয়া লইতে পারে না যে, নিজেদের কল্যাণের জন্য দম্পতী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিলে তাহার ফলে আধি-ব্যাধি, রোগ-শোক, ব্যারাম-পীড়া বাড়িয়া যাইবে। ভারতবর্ষ ভোগের সম্পদ অপেক্ষা বৃহত্তর সম্পদের অধিকারী, সে তাহার স্বকীয় সম্পদের মহিমাতেই সকল

পাশ্চাত্যের মানসিক ব্যাধি

বিঘ্নে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ। নিজ করধৃত অমূল্য সম্পদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্দিহান রহিয়াছি বলিয়াই প্রচ্ছন্ন ভোগ-কামনাকে প্রকাশ্য ভোগাচারের দ্বারা প্রশমিত করিবার নির্ব্বোধযোগ্য কুযুক্তির আমরা আশ্রয় লইতে চাহি। ভারতের আর্য্য-ঋষির জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে নব-বিজ্ঞানোজ্জ্বলা সভ্যতার সম্পূর্ণ নাগালের বাহিরে দাম্পত্য চিত্তবৃত্তিকে পরিশোধিত এবং সর্ব্বপ্রকার কামজ রোগের সম্ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে সমর্থ অব্যর্থ যৌগিক প্রণালী-সমূহ এই মহাদুর্দ্দিনেও অটুটভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। ভারতের যোগ একদিকে যেমন চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া বেগাকুল ও উদ্বেগক্লান্ত মনকে নিবিড় শান্তি ও নিশ্চিন্ত বিশ্রাম দিতে সমর্থ, তেমনই আবার দেহের মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু সম্ভোগের সামর্থ্য বর্দ্ধন করিয়াও যুগপৎ সংযমকে স্বভাবে পরিণত করিয়া দিতে সমর্থ। যোগের এই উভয়মুখিনী প্রতিভাহেতু যোগপথাশ্রয়ী ভারতীয় নরনারী নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকারী। সুতরাং রোগাতঙ্কে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া পাশ্চাত্যের পানে বিহ্বলনেত্রে তাকাইবার কোনও প্রয়োজন ভারতবর্ষের আদৌ নাই। ভারতের পুত্রকন্যা একবার নিজ জননীর স্নেহাঞ্চলে সঙ্গোপনে-রক্ষিত সযত্নে-লুক্কায়িত অমূল্য নিধির অন্বেষণে ব্যাকুল হও,—যাহা তোমার ছিল, তাহা পুনরায় তোমার হইবে।

কামজ রোগ বনাম যোগ

হারিয়ে গিয়েছে যাহা
বিস্মৃতির বালুকা-প্রান্তরে,
খোঁজ—তাহা পাবে ফিরে
ধ্যান-মৌন আপন অন্তরে।

সন্তান জনন

সন্তান-জনন সম্পর্কে গৃহী সঙ্গমেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে সুনির্দ্ধারিত উপদেশ দিবার অধিকারী বলিয়া নিজেকে মনে করি না। তথাপি এই বিষয়ে কতকগুলি আবশ্যকীয় ধারণা করিবার উপযোগী যুক্তি, তথ্য এবং উপকরণ পরিবেশন করিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহা এমনই একটা বিষয়, যাহাতে দম্পতীর নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-লব্ধ নানা-বিধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিসীম। বিবাহ অনেকেই ত' করে, স্বামি-পত্নীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে তাহার চূড়ান্ত পর্য্যায় অতিক্রম করে, একে অপরকে অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া শত সহস্র বার ধরা দিয়া বা অধিকার করিয়াও নিজেকে আরও অধিক পরিমাণে ধরা দিতে বা সঙ্গীকে আরও অধিক কাড়িয়া নিতে চাহে। কিন্তু এতবড় ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কে কাহাকে সত্য সত্য কি দিল বা কে কাহার কাছে সত্য সত্য কি পাইল, কে কাহাকে কেমন করিয়া কতটুকু সুখী করিল বা কে কাহার কাছ হইতে কিভাবে কতটুকু সুখ লাভ করিল, খোলা চক্ষে, নির্ণয়েচ্ছু দৃষ্টিতে, জিজ্ঞাসু মনে বা পর্য্যবেক্ষণী তৎপরতায় তাহা কয়জনে দেখে বা দেখিতে চেষ্টা করে? অন্ধ আবেগে স্বামী ও পত্নী পরস্পরের সন্নিহিত হয় এবং একের আবেগ-বিহ্বল ভোগান্ধ মন অন্যের মনে তুল্য আবেগ বা ভোগান্ধতা সৃষ্টি করিবার জন্য নানা মনোরঞ্জক কৌশল অনুশীলনে নিরত হয়, আবেগের সমপরিমাণতা

কল্যাণ-দৃষ্টিহীন দম্পতীর অনুসন্ধান-বর্জ্জিত সহবাসের নিরর্থকতা

আসিলে উভয়েই দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানবর্জ্জিত অন্ধের মত দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়-বিলাসে প্রমত্ত হয়, আবেগ ফুরাইয়া গেলে উভয়েই নির্জ্জীবের মত একে অন্যের বাহুপাশ ছাড়াইয়া একান্ত শয্যার আশ্রয় লয়। খুব সম্ভবতঃ ইহাই জগতের অধিকাংশ দম্পতীর গুপ্তজীবনের ইতিকথা।

ফলে ঘরে ঘরে পালে পালে সন্তান-সন্ততি জন্মিতেছে কিন্তু একটা সন্তানের জন্ম-কালেও পিতামাতা এমন কোনও পন্থানুবর্ত্তন করিতে পারিতেছে না, যাহার ফলে পিতা অপেক্ষা পুত্র এবং পুত্র অপেক্ষা পৌত্র অধিকতর দৈহিক ও মানসিক শ্রেষ্ঠতা নিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। পুত্র-কন্যারই যদি জনক-জননী হইতে হয়, তাহা হইলে পিতা ও মাতার নিজস্ব ও প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা-সমূহের বিদূরণ এবং সবলতা-সমূহের পরিবর্দ্ধনের চেষ্টার মধ্য দিয়া গর্ভাধান আবশ্যক।

সুসন্তান-উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে, কল্যাণবুদ্ধিহীন কামান্ধ দম্পতীর ভোগ-সুখ-কাতর সহবাস একেবারেই ব্যর্থ শ্রম এবং নিরর্থক ব্যাপার। সন্তান জননের জন্য পতি-পত্নীর শুক্রশোণিতের মিলন-সাধন নিশ্চয়ই এক অলঙ্ঘনীয় সর্ত্ত,—মানবকুলের মধ্যে ইহা পরম্পরাগত এক প্রাকৃতিক নিয়ম। ধর্ম্মীয় বিশ্বাস বা পৌরাণিক কাহিনীতে যাহাই থাকুক, এই নিয়মের বাহিরে কোনও মানব-শিশুর জন্ম হইয়াছে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবেতিহাসের কুত্রাপি প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের শক্তিতে মানুষ অনেক অতিপ্রাকৃতিক ও অবৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যের মত সম্মান করিয়া থাকে এবং অসম্ভব ব্যাপারে এই সহজ, সরল, সুগভীর বিশ্বাস পাত্র-বিশেষে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সমধিক সহায়তাও করিয়া থাকে।

সন্তান-জননে নরনারীর শুক্র-শোণিতের মিলন-আবশ্যক

কিন্তু পতি-পত্নী নিজ তপস্যার প্রতাপে বা একনিষ্ঠ সাধনার বলে সন্তানোৎপাদন-কালীন দৈহিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াও সম্যক্ দেহ-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে যদি সমর্থও হন, তথাপি শুক্র-শোণিতের মিলন না ঘটাইতে পারিলে সন্তানের জন্ম অসম্ভব ব্যাপার। এমন কি মনুষ্য-শরীরের গঠনই এই প্রকার যে, নরনারীর শুক্রশোণিতকে জরায়ু-মধ্যে সম্মিলিত করিবার জন্য যে দৈহিক সংযোগ ও প্রক্রিয়া অনন্তকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আছে, নিতান্ত যোগস্থ ও সংযতাত্মা ব্যক্তিদেরও সেই সংযোগ সাধনের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে, নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের পরিস্ফীতি (tumescence) অত্যাবশ্যক। পুরুষের পক্ষে এই আবশ্যকতা বাধ্যকর,—এই সর্ত্ত পূরণ না হইলে তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য-সম্পাদন সম্ভব নহে। জননাঙ্গ এই অবস্থায় আসিয়া না পৌছিলে পুরুষ-শরীরস্থ শুক্রকে পিচকারীর মতন করিয়া তীব্রবেগে যথাকালে যোগ্যস্থানে গর্ভাধানের জন্য পৌছাইয়া দিতে সে অক্ষম হয়। নারীর পক্ষে জননাঙ্গের এই পরিস্ফীত অবস্থা বাধ্যকর নহে। অর্থাৎ এই অবস্থা তাহার গুপ্তাঙ্গে না আসিলেও সহবাস চালাইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই নারীর পক্ষে বিরক্তিকর, বহুস্থলেই নারীর পক্ষে ক্লেশকর এবং প্রত্যেক স্থলেই নারীর পক্ষে অনিষ্টকর। যে স্থলে নারীর জননাঙ্গে এই আবশ্যকীয় পরিমাণ স্ফীতির উদ্রেক হইয়াছে, সেইস্থলে ইহা তাহার পক্ষে প্রীতিকর, ইহা তাহার পূর্ণ জান্তব পরিতৃপ্তির সহায়ক এবং এই অবস্থায় গর্ভাধানও সহজতর। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া যেই রোমাবৃত বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় (Labia

Majora) দুই দিক হইতে আসিয়া পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের পরিস্ফীতি নহে, পরন্তু ইহাদেরই দ্বারা আবৃত অংশে যে রোম-চর্ম্মহীন ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় (Labia Minora) ভগচ্ছিদ্রকে দুই দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সঙ্গম-কালে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিস্ফীতি না আসিলে পুং-জননেন্দ্রিয় স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপরে সম-উদ্যোগ-সম্পন্ন, সমভাবের ভাবুক, অপরের দরদে দরদী, সহযোগী বান্ধবের মত আসিয়া মিলিত হয় না, সে আপতিত হয় যেন এক সহানুভূতিবর্জ্জিত স্বেচ্ছাতন্ত্রী উৎপীড়কের মত। দৃশ্যতঃ এবং আয়তনে এই ক্ষুদ্রৌষ্ঠদ্বয় যতই স্বল্পপরিমিত বা তুচ্ছ বলিয়া মনে হউক, তাহাদের এই পরিস্ফীতি না আসিলে পুং-জননেন্দ্রিয়ের গতি-পথও কখনও স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, সুগম বা সুখপ্রদ হয় না। ফলে, সহযোগিতাহীন দুর্গম পথে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পুং-জননেন্দ্রিয় অকালে নিজের পূর্ণোচ্ছ্বাস ঘটাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সহসা ক্ষুদ্রায়তন হইয়া যায়,—স্বামী হয় লজ্জিত। পরন্তু স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ইহার অনেক পরে নিজের ভিতরের আবেগ ও উদ্দাম উত্তেজনা অনুভব করে এবং তাহার বহু পূর্ব্বেই পতি-জননাঙ্গে শৈথিল্য আসিয়া পড়ায় নারীরা অন্তরের আশাভঙ্গ, ক্ষোভ ও অতৃপ্ত কামনা অন্তরের অন্তরে গোপন করিয়া হৃতবীর্য্য হতমান স্বামীকে বাহিরে একটা সান্ত্বনা দিবার জন্যই মুখে চখে পরিতৃপ্ত হইবার অভিনয় করিয়া থাকে। সম্যক্ পরিতৃপ্তির জন্য যেমন, সন্তানোৎপাদনের প্রয়োজনেও তেমন, এই মৈথুন-মিলনে নারী ও পুরুষ উভয়েরই গূঢ়াঙ্গের একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের উত্তেজনা, পরিস্ফীতি ও দৃঢ়তা সংঘটিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাধারণ গৃহী এবং যোগস্থ গৃহীর মধ্যে এই স্থলে পার্থক্য

সঙ্গম-কালে উভয়ের জননাঙ্গের পরিস্ফীতি প্রয়োজন

এইটুকু যে, গূঢ় অঙ্গের উত্তেজনা আসিবার পরে সাধারণ গৃহী সেই ইন্দ্রিয়েরই বশীভূত হইয়া চলিতে থাকে, পরন্তু যোগস্থ গৃহী গূঢ় অঙ্গের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জাগৃতি আসিবার পরে নিজেরা সেই অঙ্গের উত্তেজনার অধীন না হইয়া নিজেদিগকে মহত্তম এক ভাবে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া নিজ নিজ গূঢ় অঙ্গকে নিজেদের অভিপ্রায়ের অনুযায়ী আবশ্যকীয় কাল ব্যাপিয়া পরিচালনা করিয়া যাইতে পারেন। এইভাবে যোগী এবং অযোগী, কেহ উত্তেজিত ইন্দ্রিয়কে নিজের অধীন রাখিয়া, কেহ নিজেই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার অধীন হইয়া, নিয়ত পুত্র-কন্যার জনক-জননী হইতেছেন কিন্তু সকলের পক্ষেই সন্তানলাভের ইহাই চূড়ান্ত সর্ত্ত যে, মাতৃকোষ এবং পিতৃকোষ মাতৃ-জরায়ুর মধ্যে মিলিত হইবে, তবে সন্তান-জন্ম সম্ভব হইবে।

সাধারণ গৃহী ও যোগস্থ গৃহীর পার্থক্য

শুধু ইহাই নহে। ভারতীয় যোগস্থ গৃহি-দম্পতীর সম্ভোগ-জীবনের মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সংযোগও স্বল্পায়াসসাধ্য। দেহকে ভোগ করিয়াও আস্বাদন করিল না, দেহসুখ আস্বাদন করিয়াও ভোগ করিল না, এই যে এক বিচিত্র অবস্থা, ইহাও গৃহী দম্পতীর নিজস্ব অধিকারে। ভারতেও ইহা দুর্ল্লভ, ইহার সহিত পাশ্চাত্যের ত' পরিচয়ই নাই। তাহাদের বর্ত্তমান সভ্যতা তাহাদিগকে ঈশ্বর-বিমুখ করিয়াছে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করিয়াছে, পুরুষের দেহের প্রয়োজনে নারীদেহকে মূল্যবান্ এবং নারীদেহের জন্যই পুরুষদেহকে আবশ্যকীয় জ্ঞান করিতেছে। পুরুষের মন নারীর মনে এবং নারীর মন পুরুষের

Majora) দুই দিক হইতে আসিয়া পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের পরিস্ফীতি নহে, পরন্তু ইহাদেরই দ্বারা আবৃত অংশে যে রোম-চর্ম্মহীন ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় (Labia Minora) ভগচ্ছিদ্রকে দুই দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সঙ্গম-কালে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিস্ফীতি না আসিলে পুং-জননেন্দ্রিয় স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপরে সম-উদ্যোগ-সম্পন্ন, সমভাবের ভাবুক, অপরের দরদে দরদী, সহযোগী বান্ধবের মত আসিয়া মিলিত হয় না, সে আপতিত হয় যেন এক সহানুভূতিবর্জ্জিত স্বেচ্ছাতন্ত্রী উৎপীড়কের মত। দৃশ্যতঃ এবং আয়তনে এই ক্ষুদ্রৌষ্ঠদ্বয় যতই স্বল্পপরিমিত বা তুচ্ছ বলিয়া মনে হউক, তাহাদের এই পরিস্ফীতি না আসিলে পুং-জননেন্দ্রিয়ের গতি-পথও কখনও স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, সুগম বা সুখপ্রদ হয় না। ফলে, সহযোগিতাহীন দুর্গম পথে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পুং-জননেন্দ্রিয় অকালে নিজের পূর্ণোচ্ছ্বাস ঘটাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সহসা ক্ষুদ্রায়তন হইয়া যায়,—স্বামী হয় লজ্জিত। পরন্তু স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ইহার অনেক পরে নিজের ভিতরের আবেগ ও উদ্দাম উত্তেজনা অনুভব করে এবং তাহার বহু পূর্ব্বেই পতি-জননাঙ্গে শৈথিল্য আসিয়া পড়ায় নারীরা অন্তরের আশাভঙ্গ, ক্ষোভ ও অতৃপ্ত কামনা অন্তরের অন্তরে গোপন করিয়া হৃতবীর্য্য হতমান স্বামীকে বাহিরে একটা সান্ত্বনা দিবার জন্যই মুখে চখে পরিতৃপ্ত হইবার অভিনয় করিয়া থাকে। সম্যক্ পরিতৃপ্তির জন্য যেমন, সন্তানোৎপাদনের প্রয়োজনেও তেমন, এই মৈথুন-মিলনে নারী ও পুরুষ উভয়েরই গূঢ়াঙ্গের একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের উত্তেজনা, পরিস্ফীতি ও দৃঢ়তা সংঘটিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাধারণ গৃহী এবং যোগস্থ গৃহীর মধ্যে এই স্থলে পার্থক্য

সঙ্গম-কালে উভয়ের জননাঙ্গের পরিস্ফীতি প্রয়োজন

এইটুকু যে, গূঢ় অঙ্গের উত্তেজনা আসিবার পরে সাধারণ গৃহী সেই ইন্দ্রিয়েরই বশীভূত হইয়া চলিতে থাকে, পরন্তু যোগস্থ গৃহী গূঢ় অঙ্গের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জাগৃতি আসিবার পরে নিজেরা সেই অঙ্গের উত্তেজনার অধীন না হইয়া নিজেদিগকে মহত্তম এক ভাবে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া নিজ নিজ গূঢ় অঙ্গকে নিজেদের অভিপ্রায়ের অনুযায়ী আবশ্যকীয় কাল ব্যাপিয়া পরিচালনা করিয়া যাইতে পারেন। এইভাবে যোগী এবং অযোগী, কেহ উত্তেজিত ইন্দ্রিয়কে নিজের অধীন রাখিয়া, কেহ নিজেই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার অধীন হইয়া, নিয়ত পুত্র-কন্যার জনক-জননী হইতেছেন কিন্তু সকলের পক্ষেই সন্তানলাভের ইহাই চূড়ান্ত সর্ত্ত যে, মাতৃকোষ এবং পিতৃকোষ মাতৃ-জরায়ুর মধ্যে মিলিত হইবে, তবে সন্তান-জন্ম সম্ভব হইবে।

সাধারণ গৃহী ও যোগস্থ গৃহীর পার্থক্য

শুধু ইহাই নহে। ভারতীয় যোগস্থ গৃহি-দম্পতীর সম্ভোগ-জীবনের মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সংযোগও স্বল্পায়াসসাধ্য। দেহকে ভোগ করিয়াও আস্বাদন করিল না, দেহসুখ আস্বাদন করিয়াও ভোগ করিল না, এই যে এক বিচিত্র অবস্থা, ইহাও গৃহী দম্পতীর নিজস্ব অধিকারে। ভারতেও ইহা দুর্ল্লভ, ইহার সহিত পাশ্চাত্যের ত' পরিচয়ই নাই। তাহাদের বর্ত্তমান সভ্যতা তাহাদিগকে ঈশ্বর-বিমুখ করিয়াছে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করিয়াছে, পুরুষের দেহের প্রয়োজনে নারীদেহকে মূল্যবান্ এবং নারীদেহের জন্যই পুরুষদেহকে আবশ্যকীয় জ্ঞান করিতেছে। পুরুষের মন নারীর মনে এবং নারীর মন পুরুষের

যোগস্থ গৃহীর দাম্পত্য-সুখের অতীন্দ্রিয় রূপ

মনে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দেহসুখের জন্যই প্রস্তুত করিতেছে এবং দেহসুখের আত্মহারা অবস্থাকে তাহারা পরমোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক সুখ বলিয়া কল্পনা করিতেছে। কিন্তু দেহ এবং মনের ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়াও আত্মার যে অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র বিলাস, এক আশ্চর্য্য বিহার দৈহিক মিলনকে উপলক্ষ্য করিয়াও লভ্য হইতে পারে, ইহা ভারতের ঋষি যোগদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তাই দৈহিক সম্ভোগ যাহার পক্ষে সম্ভব, সঙ্গত বা শাস্ত্রীয় বিধি-সম্মত কিম্বা লোক-বিধির অনুগত, সে দেহকে সম্ভোগ করিয়াও নির্ব্বিকার থাকিতে পারে, নির্ব্বিকার থাকিয়াও দেহ-সুখ উপভোগ করিতে পারে। একটী ইন্দ্রিয়ের যেখানে সুখ-প্রত্যাশা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সুখ সেখানে লব্ধ হইতে পারে। শরীরের একটী স্থানে যখন রমণ-ক্রিয়া চলিতেছে, তখন সমস্ত শরীরের কোটি কোটি রোমকূপে কোটিগুণ সম্ভোগ-সুখ আস্বাদন সম্ভব এবং এত বড় আস্বাদনের মুখেও নিজেকে একদিকে পরম উল্লসিত এবং অপর দিকে পরম উদাসীন রাখা সম্ভব। ভোগেন্দ্রিয়ের চরম সুখ আস্বাদন করিয়াও ভোগবুদ্ধি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা সম্ভব। একাকী ভোগক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়া কোটি বিশ্বের অনন্ত প্রাণিকুলের সম্ভোগ-সুখকে নিজের হস্ত-মুষ্টির মধ্যে আয়ত্ত করা সম্ভব এবং ভোগক্রিয়াজনিত দেহ-সুখকে বিশ্বের সমস্ত প্রাণীতে বণ্টন করিয়া দেওয়া সম্ভব। নিশ্চয়ই গৃহস্থ যোগীর এমন উন্নত এক অবস্থা আছে, যে সময়ে সে একাকী ভোগক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বিশ্বের জাগ্রত কি নিদ্রিত প্রত্যেকটী প্রাণীর ভিতরে সেই সুখরাশিকে অকাতরে বণ্টন করিয়া দিতে পারে। ধনী যেমন ধনরাশি আহরণ করিয়া

আত্মসুখ পায় এবং সেই ধনরাশি বিশ্বের সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া বিশ্বের সকলকে নিজ-সুখের অংশী করিয়া লইতে পারে, এই ব্যাপারটাও তদ্রূপ। তবে ইহার সূক্ষ্মতা অতীব গভীর এবং সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এই চিন্তাকে বহুবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে যে, নারী বিশ্বের সকলের সম্পদ, Women are a national property. বহু নারী-মনেও বহুবার এই চিন্তার উদয় হইয়াছে যে, প্রতিটি পুরুষ সর্ব্বনারীর সম্ভোগাধিকারে। সমাজ এই চিন্তাকে অনৈতিক বলিয়া শাসন করিয়া দাবাইয়া দিয়াছে কিন্তু ইহা অতীব সূক্ষ্ম অন্য একটা উন্নত চিন্তার স্বচ্ছতাবর্জ্জিত নগ্ন একটী শিশুমূর্ত্তি মাত্র। সেই সূক্ষ্ম চিন্তাটি হইল এই যে, একটী পুরুষ একটী নারীকে এবং একটী নারী একটী পুরুষকে যখন সম্ভোগ করিতে থাকে, তখন সে যোগী হইলে অনায়াসে নিজ-সুখ-প্রাপ্তিকে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া ব্যক্তিগত সম্ভোগ-জনিত সুখকে বিশ্বজনীন করিতে পারে। আমি আহার করিতে বসিয়া যদি আমার আহার-জনিত সুখকে সমগ্র বিশ্বের প্রাপ্তি বলিয়া অন্তরের আকুল আবেদন সহকারে বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তুমি তোমার যৌনসুখপ্রাপ্তিকে কেবল তোমার নিজের প্রাপ্তি মাত্র না জানিয়া বিশ্বের সকলের ইহা সুখপ্রাপ্তি বলিয়া ভাবিয়া কেন ইহাকে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিবে না?

যাহা লিখিলাম, তাহা শক্তিমান্ যোগী গৃহস্থের কথা, ক্ষণসুখকাতর দুর্ব্বলের কথা নহে। শক্তিশালী সদ্গুরুর করাঙ্গুলী-স্পর্শে যেখানে সাধারণ মানুষ দিব্য মানুষে পরিণত হইয়াছে, সেখানে একটী ইন্দ্রিয়ের

সুখ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আস্বাদনকে কেন জাগাইবে না ? যৌন-সম্ভোগ তুমি করিয়াছ এবং ইহাতে চূড়ান্ত সুখ পাইয়াছ বলিয়া মনেও করিতেছ ; কিন্তু তৎকালে রসনায় কি ক্ষীর-শর্করার চিত্ত-চমৎকার আস্বাদন পাইয়াছিলে ? তৎকালে তোমার নাসিকায় কি সহস্র রজনীগন্ধার দিব্য সুগন্ধ পাইয়াছিলে ? তৎকালে কি তোমার কর্ণরন্ধ্রে কোটি বেণু-বীণার সুমধুর ধ্বনি পৌছিয়াছিল ? তৎকালে কি তোমার নয়ন-সমক্ষে কোটি-ভাস্কর-সম উজ্জ্বল, কোটি-চন্দ্রমা-হেন স্নিগ্ধ, অনির্ব্বচনীয় কাহারও রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল ? যদি উত্তর দিতে পার "হাঁ", তবে বুঝিব, তুমি সম্ভোগ করিয়াছ। যদি নিরুত্তর হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া থাক, বলিব "বন্ধু হে, তুমি পণ্ডশ্রম করিয়াছ। কারণ ভারতীয় সম্ভোগের আদর্শ একদেশদর্শী নয়, তাহার একটা অতীন্দ্রিয় রূপও আছে।"

এক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইতেছে পূর্ণ তৃপ্তির প্রমাণ

আমাদের পরমযোগী পূর্ব্বপুরুষেরা মানবের জন্মকে এবং তাহার সহজাত সংস্কার সমূহকে অতুল শুদ্ধতার সম্ভাবনায় বিমণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যেন অতীতের শ্রেষ্ঠ মহতেরা বা তত্তুল্য শক্তিধর তপোধন ওজস্বী সাধক-সাধিকারাই তাঁহাদের ঔরস এবং গর্ভের মাধ্যমে নবতর মানব-তনু ধারণ করিয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন। শিক্ষাদান, লালন পালন, তাড়ন-শাসন প্রভৃতির মধ্য দিয়া নবজাতককে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু আবাল্য নানা সদনুশীলনের মধ্য দিয়া, আকৈশোর

ব্রহ্মচর্য্য পালনের মধ্য দিয়া, সমগ্র জীবন সৎসঙ্গ ও আধ্যাত্মিক সাধনের মধ্য দিয়া, কুস্থান ও কুসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক তপস্যার অনুকূল স্থানে ও অনুকূল অবস্থায় অবস্থান দ্বারা নবজাতকের জীবনের পূর্ণাবয়ব বিকাশ সাধনের আনুকূল্য সৃষ্টির দিকে তাঁহাদের প্রখর লক্ষ্য ছিল। ভারতীয় সামাজিক জীবনের অধিকাংশ অনুষ্ঠান এবং প্রথার সৃষ্টির মূলে নবজাতককে অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষা এবং সর্ব্বতোভাবে অনুকূল প্রতিবেশ-প্রভাব প্রদান করিবার আবশ্যকতা-বোধই সর্ব্বপ্রধান প্রেরণারূপে বিরাজ করিতেছে। শিক্ষা এবং পুরুষানুক্রমিক সৌষ্ঠব-সঞ্চরণ (Education and Heredity) কে নিয়া যেমন করিয়া অন্যত্র দ্বিধা-বিভক্ত যুদ্ধ-শিবির নির্ম্মিত হইয়াছে বা হইবার প্রবণতা দেখা গিয়াছে, ভারতে তাহা হয় নাই ! জন্মের পরে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা-সংস্কারের সহায়তায় মানুষকে গড়িয়া তুলিবার আবশ্যকতা-বোধ ভারতে যেমন তীব্র ছিল, ঠিক তেমনই তীব্র ছিল পুরুষানুক্রমিক সদ্‌গুণ-সঞ্চরণের সম্ভাবনাকে সহজতর ও প্রবলতর করিবার জন্য এক উদগ্র কামনা। পিতামাতার সুস্থ ও নীরোগ শরীরে সন্তানোৎপাদন করিলে পুত্র-কন্যা স্বভাবতঃই সুস্থ ও নীরোগ মন লইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে,—এই সত্যকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা ত' হইল নিতান্ত দৈহিক দৃষ্টিকোণে জন্মতত্ত্বকে বিচার করিবার দৃষ্টান্ত। মানুষের জন্ম কি কেবল একটা দেহেরই আবির্ভাব ? ইহা কি দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করিয়া যাইবার পথে একটী আত্মার অতি বিচিত্র ইতিহাসও নহে ? ইহা কি সাময়িক ভাবে হইলেও, একটী আত্মারও আবির্ভাব নহে ? এই আত্মা কি নির্দ্দিষ্ট

শিক্ষা ও প্রতিবেশ প্রভাব

স্বামিস্ত্রীর সহবাস কেবলই ইন্দ্রিয়-বিলাস নহে, পরন্তু বিদেহী আত্মাকে নবদেহ ধারণের জন্য আবেদন

একটী জড়পিণ্ডের মধ্যে কেবল প্রকৃতির খেয়ালেই আসিতেছেন ? তিনি কি নিজ অতীত কর্ম্মের মহিমায় উৎকৃষ্ট যোনিতে এবং অতীত দুষ্কৃতির প্রভাবে নিকৃষ্ট যোনিতে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রতীক্ষা করেন না ? মাতৃগর্ভে বসিয়া তিনি কি তাঁহার অতীতের চিন্তা এবং ভবিষ্যতের কল্পনা লইয়া ব্যস্ত থাকেন না ? স্বামি-পত্নীর সহবাস কি কেবল বীর্য্য-ক্ষেপণ এবং গর্ভগ্রহণের চেষ্টা মাত্র ? ইহা কি নবশরীর ধারণেচ্ছু বিদেহী আত্মার দলকে আহ্বান করিবার একটা সঙ্কেত নয় ? ইহা কি কেবলই ইন্দ্রিয়-বিলাস ? ইহা কি সহস্র সহস্র দেহ-ধারণে ইচ্ছুক বিদেহী আত্মাদিগকে এই কথা বলিয়াই আহ্বান করা নহে,—"কে আছ কোথায়, নরদেহ ধারণ করিয়া জীবনকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে চাহ, অতীতের অতৃপ্ত কামনা পূরণ করিতে চাহ, অতীতের অসিদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহ, অথবা পূর্ণ সিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া বিদেহী হইয়া থাকিলেও পুনরায় নবতনু ধারণ করিয়া জীব ও জগতের মঙ্গল করিতে চাহ,—এস তাহারা, আমাদের ঔরস ও গর্ভের যোগ্যতানুযায়ী, আমাদের ঔরস ও গর্ভের শুদ্ধতানুযায়ী, আমাদের অন্তরের কামনা, হৃদয়ের বাসনা, ধ্যানের একতানতা এবং তপঃসাধনের স্তর অনুযায়ী নিজেকে যে যোগ্য মনে কর, সে প্রবেশ কর, সে প্রবেশ কর ; জানাইতেছি তোমাকে সুস্বাগতম্"—? নরনারীর যৌন-মিলন প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই নহে কি ? পশুপক্ষীর যৌন-মিলনও ইহাই, কিন্তু তাহারা এই গূঢ় তত্ত্ব জানে না। মানুষ জানে। ভারতের প্রাচীন সাধনার অনুবর্ত্তী নরনারীরা ইহা জানিতেন। তাই তাঁহারা দেহের দিক দিয়া

সুজনন-তত্ত্বকে (Eugenics) অনুসরণ করিবার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার দিক দিয়াও শ্রেষ্ঠ আত্মাকে পুত্রকন্যারূপে পাইবার পথ খুঁজিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানদের নিকট ভগবানের অবতার আবির্ভূত হইবার জন্য মাতৃ-গর্ভের অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন, পার্থিব কোনও পিতার শুক্র-বিন্দুর অপেক্ষা রাখেন নাই। হিন্দুর নিকটে ভগবান বারংবার পিতৃবীর্য্য এবং মাতৃরজের মধ্য দিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, শুক্রাধানকারী পিতা নিজ শুক্রে ভগবানকেই দেখিয়াছেন বা দেখিতে চাহিয়াছেন, গর্ভধারণ-কারিণী মাতা নিজ গর্ভ-মধ্যেই ভগবানকে চাহিয়াছেন বা পাইয়াছেন। শ্রীভগবানের বারংবার জীবত্রাণের জন্য অবতার রূপে ধরাধামে নরদেহে আবির্ভাবের এই বদ্ধমূল সংস্কারটুকুর মধ্যে ভারতীয় সাধকের যৌন-জীবনের একটা বিরাট অলিখিত ইতিহাস লুকাইয়া আছে।

বংশে জন্মিবে শ্রেষ্ঠ সাধকেরা,—এই কল্পনাকে সফল সত্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা মনের এবং দেহের দিক দিয়া যুগপৎ দ্বিবিধ পরীক্ষায় (Experiments and Investigations) ব্রতী হইয়াছিলেন। কোথাও একই দম্পতী একই ব্যাপার নানা রূপান্তরে শত সহস্রবার পরীক্ষা করিয়াছেন, কোথাও এক দম্পতীর পরীক্ষার ফল শিষ্যরূপে অন্য দম্পতীরা জানিয়া লইয়া নিজেরা আবার নব নব পরীক্ষা চালাইয়াছেন এবং নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলকে পুনরায় পুত্রদের শিষ্যদের মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। নানা তন্ত্রে পরিকীর্ণ নানা শাস্ত্রীয় বচন-রাজি হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। মন বা আত্মার দিক দিয়া যে সকল পরীক্ষা বা গবেষণা চলিয়াছিল, তাহা বাদ দিয়া কেবল দেহের দিক দিয়া যাহা অনুশীলিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে কামশাস্ত্র নামক এক পৃথক্ বিদ্যায় পরিণত হইয়াছিল। নিজেদের

সুপ্রাচীন কামশাস্ত্র ও তাহার পুনরুদ্ধার-সম্ভাবনা

প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে তাঁহারা যাহা পাইয়াছেন, তাহার অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশই গ্রন্থমধ্যে গ্রথিত হইয়াছিল। কারণ, প্রায় বিষয়েই মন্ত্রগুপ্তি তাঁহাদের একটা বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। আবার যৎসামান্য যাহা গ্রন্থমধ্যে পরিরক্ষিত হইয়াছে, তাহাও একদিকে যেমন প্রধানতঃ সাধারণ জনমণ্ডলীর ভোগায়তন দেহের প্রসাদ-কল্পেই রক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে তেমন যোগীশ্বর গৃহী তাপসগণের নানাবিধ অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়োপলব্ধ প্রত্যক্ষানুভূতি লাভের বহু পরে সম্পাদিত ও গ্রন্থায়িত হইয়াছে। ফলে যোগীর যোগজ অনুভূতি মৈথুনের মত জান্তব কার্য্যের মধ্যেও যে দিব্য সুবাস পাইয়াছিল, যোগীর আবিষ্কৃত সত্য ভোগীর হস্তে ন্যস্ত হইবার পরে মৈথুনের সেই সৌরভ এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রহে নাই। ফলে ভারতে যে দিব্য এক রতিশাস্ত্র উপজাত হইয়া পশুর জগতে মানুষ সৃষ্টির আয়োজন এবং মানুষের জগতে দেবতা-সৃষ্টির অধ্যবসায় করিয়াছিল, তাহার সুবিপুল বিকাশ-সম্ভাবনা সহসা মধ্যপথে রুদ্ধ হইয়া যায়।

স্থূলেন্দ্রিয়াদির সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে শুদ্ধচেতা যোগীরা ধ্যানের বলেও বহু অজানিত দৈহিক তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং কোথাও বংশানুক্রমে, কোথাও শিষ্যানুক্রমে তাহার অভ্রান্ততার প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া সেই সকল সিদ্ধান্তকে কাম-বিদ্যার অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যা অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গুপ্তাচারে রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করি। অনুমান বলিতেছি কেন? অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধকদের গুপ্ত সাধনের যে সকল বিবরণ তাঁহাদের নিজ মুখ

হইতে শুনিয়াছি, তাহাতে "অনুমান করি" বলা চলে। আশাও করি যে, যেদিন গার্হস্থ্য জীবন একটা গোঁজামিলের জীবন না হইয়া প্রকৃত তপস্যার জীবন হইবে, সেইদিন গার্হস্থ্যাশ্রমী নরনারী নিজেদের সাধনা-সমুজ্জ্বলা প্রতিভার বলে নূতন নূতন তত্ত্ব অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। অন্ধের মত না চলিলে, চক্ষু খোলা রাখিয়া প্রতি কার্য্য করিলে, নিজেদের জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রবৃহৎ যোগাযোগের মধ্যেই তাঁহারা অনেক অজানিত এবং অভাবনীয় নূতন নূতন সত্যের আত্ম-প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় বোধ করিবেন। এই সকল মূলসূত্র সম্পর্কে সাধারণ ভাবে একটু ইঙ্গিত করিয়াই মাত্র যাইতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় ঋষি শুক্রবিন্দুর ভিতরে শুক্রাধিকারীর জীবন, যৌবন, স্বাস্থ্য এবং তাঁহার ভাবী সন্তানের প্রাণকে দেখিয়াছেন। কিন্তু শুক্রবিন্দুর ভিতরে লক্ষ লক্ষ শুক্রকীটকে দেখিয়াছেন কিনা, বলা কঠিন। বর্ত্তমান-বিজ্ঞান যেই বিন্দু-পরিমিত

পাশ্চাত্য দেখিল শুক্রকীট, ভারত দেখিল জীবাত্মা

শুক্রের ভিতরে বিশ লক্ষ হইতে বিশ কোটি পর্য্যন্ত জীবন্ত শুক্রকীটকে কিলিবিলি করিতে দেখিয়াছে, তাহার ভিতরে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি অনন্তকোটি প্রাণ দেখিয়াছিলেন। অণুবীক্ষণ তাঁহাদের ছিল না কিন্তু মনোবীক্ষণ তাঁহাদের অভ্রান্ত ছিল। তাই কোটি কোটি শুক্রকীটের পৃথক্ পৃথক্ দেহ তাঁহারা দেখিয়াছেন কিনা বলা কঠিন কিন্তু প্রাণরূপে কোটি কোটি জীবাত্মার উপস্থিতিকে তাঁহারা স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অনন্ত কোটি প্রাণ এক একটী করিয়া পৃথক্ জড়দেহ লইয়া শিশু-বেঙ্গাচির মত তাহাদের পুচ্ছ নাড়িয়া নাড়িয়া ক্রমশঃ মাতৃজঠরের দিকে কেমন করিয়া আগাইয়া যায়, তাহা তাঁহারা কোথাও বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না কিন্তু যতক্ষণ শুক্র তাহার

পিতৃশুক্রকোষ-মধ্যেই আবদ্ধ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। যেই মুহূর্ত্তে বীর্য্যবিন্দু শুক্রকোষ হইতে স্খলিত হইয়া মূত্রনালীতে পড়িল, এবং কামগ্রন্থিনিঃসৃত পুরুষ-শরীরস্থ রসের সংস্রব পাইল, তন্মুহূর্ত্তে তাঁহারা শুক্রকে কোটি কোটি প্রাণের আধার বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। দেহ হইতে দেহান্তরে জীবাত্মার যে গমনাগমন, তাহা তাঁহারা ধ্যান-প্রভাবে অনুভব করিয়াছেন। একবিন্দু বীর্য্যে কতগুলি শুক্রকীট বাস করে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অনাবিষ্কার হেতু তাহা তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই কিন্তু শুক্রকোষদ্বয়-(Seminal Vesicles) হইতে স্খলিত বীর্য্য (Semen) মূত্রনালীতে (Urethra) পতিত হইবার মুখে কামগ্রন্থি (Prostate Gland) ও কাউপারস্ গ্রন্থি (Cowper's Gland) হইতে নিঃসারিত, মূত্রপথের পিচ্ছিলীকরণের দ্বারা শুক্র-বিন্দুকে সহজে লিঙ্গনালী দিয়া দ্রুত বহির্গত হইয়া যাইবার সহায়তা বিধানের জন্যই স্বাভাবিক নিয়মে উৎপাদিত রসের সহিত সংস্পর্শ পাইবামাত্র এই যে কোটি কোটি শুক্রকীট একসঙ্গে তন্দ্রাঘোর অতিক্রম করিয়া একটী নিমেষের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে এবং মূত্রনালীকে অতিক্রম করিয়া দ্রুত মাতৃ-জঠরে প্রবেশের প্রত্যাশা লইয়া দৌড়-প্রতিযোগিতার জন্য কোমর কাছে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সম্মুখে তাহা ধরা পড়িয়াছে। অণ্ডকোষ-মধ্যে রক্ত হইতে পৃথক্কৃত হইবার কালে যেই শুক্রে প্রাণের ছিল না প্রমাণ, ভবিষ্যতে ক্ষয়িত হইবার জন্য শুক্রকোষে আসিয়া জমা হইয়া থাকিবার কালে যে শুক্রে প্রাণের ছিল না এক কণা চিহ্ন, অত্যধিক উত্তেজনার ফলে শুক্রকোষদ্বয় কুঞ্চিত

কামগ্রন্থির রস-সংস্পর্শে শুক্রমধ্যে কোটি শুক্রকীটের যুগপৎ জীবন-সঞ্চার

হইয়া হইয়া * মৌচাকের মধুক্ষরণের ন্যায় শুক্র ক্ষরিত করিয়া শুক্রকোষ হইতে বাহির করিয়া দিবার সময়ে যে শুক্রের মধ্যে ছিল না একটী মাত্র শুক্রকীটেরও জীবন-স্পন্দন, স্বল্পমাত্র নিম্নগামী হইয়া কামগ্রন্থির ও কাউপারস্ গ্ল্যাণ্ডের রসের সহিত তাহার স্পর্শলাভ মাত্র হঠাৎ প্রাণ জাগিয়া উঠিল। অন্ধ প্রেরণায় একবিন্দু শুক্রমধ্যে বিশ কোটি ঘুমন্ত রাজপুত্র-রাজকন্যারা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া মাতৃ-জঠর প্রাপ্তির আশায় অন্ধকারে বিপুল লম্ফ দিল, কেহ ভাগ্যদোষে মৃত্তিকায়, কেহ শয্যায়, কেহ বস্ত্রে, কেহ মাতৃদেহের বহিরঙ্গে, কেহ যোনি-কূপের (Vaginal Tube) নিতান্তই বহিঃসংলগ্ন প্রদেশে, কেহ চূড়ান্ততম দূরদেশে, অত্যধিক সৌভাগ্যবান্ কেহ বা একেবারে জরায়ুর অভ্যন্তরে ছিটকাইয়া পড়িল। তারপরে আরম্ভ হইল ইহাদের প্রাণান্তকর দৌড়-প্রতি-যোগিতা। উদ্দেশ্য,—কে আগে গিয়া যে-কোনও একটা মাতৃডিম্বের (Ovum) ভিতরে নিজের জন্য নিশ্চিন্ত আশ্রয় রচনা করিতে পারে। একজন, কদাচিৎ একাধিক, শুক্রকীট মাতৃডিম্বে প্রবেশ করিবামাত্র মাতৃ-জরায়ুতে এমন সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হইল যে, যেই শুক্রকীটটী বা শুক্রকীটদ্বয় অথবা শুক্রকীটত্রয় বা ততোধিক শুক্রকীট প্রায় একই সময়ে এক একটী করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মাতৃডিম্বে আশ্রয় পাইয়াছিল, দশ মাস দশ দিনের জন্য তাহার বা তাহাদের পুষ্টির জন্য আহারীয় এবং তৃপ্তির তথা পরিরক্ষণের জন্য উপযুক্ত উত্তাপ উহারই ফলে সৃষ্ট ও প্রদত্ত হইতে লাগিল। পরন্তু এই সময়ের মধ্যে যাহারা মাতৃডিম্বের নাগাল পায় নাই, প্রাণপণ করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হইয়া, মাতৃ-জঠরের ক্রমবর্দ্ধমান উত্তাপ ও

* শুক্রক্ষয়ের দেহতত্ত্ব জানিবার জন্য "সংযম-সাধনা" নবম সংস্করণ ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্রুতবিকারশীল নানা রাসায়নিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ফলে প্রতপ্ত ও দগ্ধ হইয়া উনিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বইটি শুক্রকীট হতাশায় প্রাণ দিল। পিতৃ-

নরক

পুংযন্ত্রের মূত্রনালীর দুর্গন্ধময় পথভ্রমণ, মাতৃ-জননেন্দ্রিয়ের ততোধিক ঘৃণ্কারজনক যোনিপথ পর্য্যটনে নরদেহ ধারণ করিবার ব্যাকুল আগ্রহে মরিয়া হইয়া পঙ্ক-সাগর সন্তরণ,—সবই হইল ব্যর্থ, সবই হইল নিরর্থক। জগতের কেহ জানিল না যে ইহারা মরিবার কালে কাঁদিয়াছিল, কেহ জানিল না যে ইহারা মাতৃযোনিতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে প্রাণভরা ভরসা নিয়া নবদেহ নবজন্ম পাইবার প্রচণ্ড প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল, কেহ জানিল না যে পিতৃদেহ হইতে স্খলদবস্থায় কত কল্পনার কত রঙ্গীণ স্বপ্ন ইহারা দেখিতেছিল। জীবাত্মার এই আশাপ্রত্যাশাময় দুঃখকর যাত্রাকেই রূপকাবলম্বনে শাস্ত্রে "নরক" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যাহাকে আধুনিকতম আণুবীক্ষণিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখিলেন, জড় ও প্রাণহীন শুক্র-কীটের দেহে সহসা প্রাণোন্মাদনার সঞ্চার বলিয়া, ভারতের গৃহস্থ যোগী অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীতই ধ্যানবলে তাহাকে দেখিলেন নানাস্থানে দেহপরিত্যাগকারী অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নে তাড্যমান কোটি কোটি কর্ম্মফলভাগী জীবাত্মা বলিয়া। তাঁহারা একবিন্দু বীর্য্যকে বিশ কোটি সন্তান-জনন-সমর্থ শুক্রকীটের সমষ্টি বলিয়া জানিতেন না কিন্তু এই একবিন্দু বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া কোটি কোটি জীবাত্মা যে পুনরায় দেহ পরিগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের সেই সংগ্রাম-মুখর প্রতিযোগিতা যে পিতৃলিঙ্গের মধ্যপথ হইতে শুরু হইয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গ্রীস

ভারতে লিঙ্গপূজা এবং যোনিপূজা প্রবর্ত্তনের অন্যতম হেতু কি?

প্রভৃতি নানা দেশে যে কারণে লিঙ্গ-(Phallus)-কে পূজার উপকরণ বা প্রতীক করা হইয়াছিল, ভারতবর্ষের লিঙ্গপূজা সেই কারণ হইতে উদ্ভূত নহে। সন্তানোৎপাদন-রত যোগী জনক যখন ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞার আলোকে নিজ লিঙ্গ-মধ্যে যুগপৎ কোটি কোটি জীবাত্মার আবির্ভাব ও স্বপ্তোত্থান প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টিতে লিঙ্গ একটা কদর্য্য অঙ্গ, কুৎসিত প্রত্যঙ্গ বা অশ্লীল শরীরাংশ বলিয়া আর কি করিয়া প্রতিভাত হইতে পারে? সন্তানোৎপাদনরতা, যোগজ উন্নত উপলব্ধি-সম্পন্না, ধ্যানদৃষ্টি জননী যখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বলে নিজ যোনিমধ্যে কোটি কোটি মাতৃস্নেহাতুর জীবাত্মার করুণ ক্রন্দন শুনিলেন, তখন তাঁহার নিকটে স্ত্রী-শরীরের গোপনতম অঙ্গ একটা জঘন্য অঙ্গ, একটা ঘৃণ্কারজনক প্রত্যঙ্গ বা একটা নিরতিশয় ঘৃণনীয় শরীরাংশ বলিয়া কি করিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে? ভারতে লিঙ্গপূজা ও যোনিপূজা প্রধানতঃ এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির শিকড় হইতেই গজাইয়াছিল।

সুতরাং সুস্পষ্ট হইতেছে যে, লক্ষ্য এবং উপযোগিতার দিক্ হইতে পাশ্চাত্য রতিশাস্ত্রের সহিত ভারতীয় রতিশাস্ত্রের একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। যাবৎকাল না পাশ্চাত্য জীবন ভারতীয় আধ্যাত্মিক-তায় দীক্ষিত হইবে, তাবৎকাল অনাগত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া এই পার্থক্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে।

রতিশাস্ত্রের পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভারতীয় আদর্শের মধ্যে লক্ষ্যগত পার্থক্য

পাশ্চাত্যের প্রতিটী মানুষই একরূপ নহে, ভারতেরও নহে। তথাপি সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্যদের অধিকাংশের চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমরা তাহাকেই নাম দেই পাশ্চাত্য

আদর্শ। অধিকাংশ ভারতীয়ের চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে ঋষি-জীবনের একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ছাপ রহিয়া গিয়াছে। যাঁহাদের মন ফেরঙ্গ উৎকটতায় একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় নাই, তাঁহাদের সহস্র সাহেবিয়ানার মধ্যেও প্রাচীন ঋষির আশা ও আকাঙ্ক্ষা সুযোগ পাইলেই উঁকি মারিয়া যায় এবং সকলের একরূপ অজ্ঞাতসারেই তাঁহাদের দেহে মনে এক নবীনতার শিহরণ জাগাইয়া দিয়া প্রাচীন ভারত অভয় কণ্ঠে ডাক দিয়া বলে,—"অয়মহং ভোঃ, এই আমি আছি, আমি মরি নাই, আমি মরিতে পারি না, আমি কখনও মরিব না, তোমাদের অস্থিমাংসে মেদমজ্জায় আমি বারংবার আমার অস্তিত্বের প্রমাণ জাগাইয়া যাইব, আমি অমর।" ইহাকেই আমরা নাম দেই ভারতীয় আদর্শ। নরনারীর দাম্পত্য-মিলনকে ভারতীয় এই আদর্শ অপ্রয়োজনীয় মনে করে নাই, কিন্তু শরীরের যেই যেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলন ও সন্নিধি সন্তানজননের জন্য প্রয়োজন, তাহাদিগকে কেবল পার্থিব দৃষ্টিতেও দেখে নাই। আর এই মিলনকে কেবল দৈহিক ব্যাপার বলিয়াও মনে করে নাই, ইহাকে উভয়ের মনোমিলন মাত্র বলিয়াও স্বীকার করে নাই, পরন্তু ইহাকে উভয়ের আত্মায় আত্মায় সম্পর্ক স্থাপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং এই আত্মীয়তার অনুশীলনকে জগতের কোটি কোটি অদৃশ্য আত্মার কুশলের সহিতও যুক্ত করিয়াছে। এই আদর্শ পাশ্চাত্যে নাই।* স্থূলসত্ত্ব ইহমুখ পাশ্চাত্যের নিকটে দেহ পাইয়াছে প্রথম মর্য্যাদা, মন পাইয়াছে দ্বিতীয় সম্মান, নিজের বা পত্নীর সুখ সম্পাদনই ইহাদের চিন্তার চরম পরিধি, কিন্তু নিজ ইন্দ্রিয়-সুখের মধ্য দিয়াও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি আত্মার বাসনাপূরণ বা কামনার পরিতর্পণ তাঁহাদের কল্পনার অতীত ব্যাপার। ভারত ব্রহ্মাণ্ডের

* "প্রবুদ্ধ যৌবন" তৃতীয় সংস্করণ ৬৭ পৃষ্ঠা হইতে ৭৩ পৃষ্ঠা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

প্রতি ধূলিকণায় যেই ব্রহ্ম দেখিয়াছিল, সম্ভোগরত নরনারীর লিঙ্গে বা যোনিতে সেই ব্রহ্মের অনুপস্থিতি ধারণা করা তাহার সাধ্যাতীত। ফলে ভারত-দম্পতী জনন-যন্ত্র-সহায়ে জৈব কর্ত্তব্য পালনের কালে জননাঙ্গে বিশ্বাত্মাকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং নিজ নিজ দেহের অবশ্যম্ভাবী প্রহর্ষের মধ্যে বিশ্বাত্মার সন্তোষ উপলব্ধি করিয়াছে। যাহা বিশ্বের জন্য, তাহাই শুভ এবং সুন্দর; যাহা একাকী নিজের জন্য, তাহাই অশুভ ও অসুন্দর; এই বোধকে সে দাম্পত্য জীবনের গূঢ় কার্য্য সমূহের মধ্যেও জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। ভারতে জন্মিয়াও যাঁহারা ভারতীয় নহেন, এমন কেহ কেহ হয়ত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জীবনের মধ্যে এই এক অনবদ্য আদর্শ অতি গোপনে কার্য্য করিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভব না করিতে পারিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা সত্য।

ইহা সত্য বলিয়াই ভারতে প্রাগ্‌বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে অত্যাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল এবং বিশ্বাস করিয়াছিল যে, এমন অমোঘ বীর্য্যেই শ্রেষ্ঠ সন্তান সমুৎপাদিত হয়, যাহা দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ, যাহা অতিশয় প্রগাঢ়, যাহা সজীব এবং যাহার উপরে মনের সাত্ত্বিকী ক্রিয়াশীলতার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। যে দৈহিক মিলন অল্পকাল-স্থায়ী এবং একান্তই কামবুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত, তাহাতে দেহের শ্রেষ্ঠ শুক্রাংশ ক্ষরিত হয় না, শুধু সেই অংশটুকুই ক্ষরিত হইয়া যায়, যাহা কামাদি চিন্তা দ্বারা কতকটা ক্ষয়োন্মুখ পূর্ব্ব হইতেই হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সহজে-ক্ষয়প্রবণ, স্বল্পবীর্য্য শুক্র অধিকাংশ সময়েই সন্তান-উৎপাদনে সমর্থ হয় না, হইলেও তাহাতে নিস্তেজ, দুর্ব্বল ও দুর্ম্মেধা সন্তানই জন্মিয়া থাকে। যাহা প্রাক্তন কামচিন্তার দ্বারা ক্ষয়োন্মুখ হইয়া রহে নাই এবং যাহা

কিরূপ বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদিত হয়

সামান্য উত্তেজনায় ক্ষরিত হইবার জিনিষ নহে, তেমন বস্তুকে * গর্ভে স্থাপন করিতে না পারিলে শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভের আশা বাতুলতা মাত্র। স্বামী যেখানে আত্মসুখোৎপাদনের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য প্রদান করেন না, পরন্তু স্বকীয় সুখাস্বাদনকে সম্পূর্ণরূপে গৌণ ব্যাপার রূপে গ্রহণ করিয়া দীর্ঘসময়ব্যাপী সহবাসান্তে স্বকীয় শুক্রকে স্ত্রীর জরায়ু-মধ্যে বা জরায়ু প্রান্তে নিক্ষেপ করিবার দিকে লক্ষ্য দেন এবং (স্ত্রী সৎসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় স্বকীয় চিত্তকে উন্নত তত্ত্বে নিবিষ্ট রাখিবার দরুণ সম্ভোগ-সুখকে আস্বাদনে নিতান্ত ব্যাকুলা না থাকিলেও) সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর দিক হইতেই দৈহিক পরিতৃপ্তিকে আবশ্যক জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়ে পূর্ণতা দানের সঙ্কল্পে স্বামী যথাসম্ভব অনুদ্বিগ্ন ও অচঞ্চল মনে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে দেহকে নিজ দাম্পত্য কর্ত্তব্যে নিয়োজিত রাখেন, সেই সব স্থলেই শুক্রের শ্রেষ্ঠ অংশ পত্নীর জরায়ুতে আহিত হইবার অধিক সুযোগ পায়। স্বামী যেখানে দীর্ঘসময় ব্যাপিয়া সহবাস পরিচালন করিবার যোগ্যতা প্রদর্শন করে নাই, সেখানে পত্নীর শরীর-মধ্যে উপযুক্ত উদ্দীপনার অভাবে সঙ্গম ব্যর্থ হয়। স্বামী যেখানে নিজের অন্তরের আবেগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঙ্কল্পের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়া দেহকে তাহার আরব্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিয়াও অবিহ্বল প্রযত্নে চলিতে থাকেন, সেখানে পত্নীর শরীরের প্রতি-রোমকূপে অনির্ব্বচনীয় জৈব-রসাস্বাদন ঘটিবার সময়ে যুগপৎ শুক্রাধান করিয়া সন্তানের আবির্ভাবকে সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় নিয়া উপনীত করেন। পত্নীর এই চরম-সুখাস্বাদনাবস্থা (Climax) তখন কেবল একটা জৈব সুখমাত্রেই

* চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে একমত যে, Prostatic Juice বা কামগ্রন্থির রস-ক্ষরণে সন্তান-জনন হয় না, Seminal Secretion বা শুক্রকোষ হইতে শুক্রক্ষরণ প্রয়োজন।

সীমাবদ্ধ থাকে না, সূক্ষ্মানুভূতি-প্রবণা অনেক নারীর জীবনে এই সুখক্ষণ জান্তব অনুভূতির চূড়ান্ত পর্য্যায়ের সহিত অপার্থিব অনুভূতিরও একটা প্রাথমিক আমেজকে মিশ্রিত করিয়া দেয়, যাহার ফল এবং প্রভাব সমগ্র জীবনের উপর দিয়া অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে। যেই জান্তব ক্রিয়াকে সর্ব্বশাস্ত্র বর্জ্জনের দিয়াছেন উপদেশ, তাহারই মধ্যবর্ত্তিতায় এবং তাহার চূড়ান্ত অনুভূতির অবস্থায় দেহমনের জান্তব গতি ও স্ফূর্ত্তি সহসা গণ্ডী-চ্ছেদন করিয়া অতীন্দ্রিয় সৌম্যাবস্থায় যে যাইতে পারে, এই বিষয়ে দুই একটী বিরল জীবনের নিগূঢ় অভিজ্ঞতাই সম্ভবতঃ তান্ত্রিক যুগে মৈথুনকে ব্যাপকভাবে পরমেশ্বর-সাধনার সাধন বা সহায়ক রূপে গ্রহণ করিতে প্রণোদনা দিয়াছিল। কিন্তু স্বামীর যৌন অধ্যবসায়ে দৃঢ়তা ও সুদীর্ঘ স্থৈর্য্য ইহাতে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের গুপ্ত মত আলোচনায় মনে হয় যে, সম্ভবতঃ এই জন্য আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা নিম্নলিখিত কয়েকটী অথবা ইহাদের কোনও কোনওটী কিম্বা ইহাদের প্রত্যেকটী উপায় অবলম্বন করিতেন। যথা,—

জান্তব ক্রিয়ার অতীন্দ্রিয় ফল

(১) জননাঙ্গের যে পরিমাণ দৃঢ়তা ও স্ফীতি না আসিলে সম্ভোগ-কার্য্য পুরুষের পক্ষে অসম্ভব এবং নারীর পক্ষে অপ্রীতিকর, তাহার অভ্যুদ্‌গমের জন্য ধার্ম্মিক ভাব হইতে অবিচ্যুত কিন্তু পারস্পরিক প্রীতিবর্দ্ধক নানা প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ আচরণ বা আচার উঁহারা পালন করিতেন।

প্রাচীনেরা জনন-কালে কি কি করিতেন

(২) দেহকে দেহের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দিয়া এবং তাহাকে তাহার কার্য্যেই নিয়োজিত রাখিয়া উভয়েই মনকে স্বকীয় সঙ্গীর বা

সঙ্গিনীর দেহাতীত সত্তায় বা স্বকীয় দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গে স্থির করিতেন এবং একটী ইন্দ্রিয়ের সুখকে ধ্যানবলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়া সম্ভোগ করিতেন।

(৩) স্বামী তাঁহার পত্নীকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী জ্ঞানে তাঁহার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনকেই একমাত্র লক্ষ্য করিতেন এবং নিজেকে বিশ্বপতির হস্তধৃত যন্ত্র মাত্র বিবেচনা করিয়া এই দৈহিক ব্যাপারটার সম্পর্কে মনের ঘৃণা, লিপ্সা, দ্বেষ ও আসক্তি সমভাবে বর্জ্জন করিতেন। আবার পত্নীও স্বামীকেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর জানিয়া তাঁহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সংঘটনকেই নিজের একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেকে তাঁহার পরিতৃপ্তি সাধনের সহায়ক যন্ত্র মাত্র মনে করিয়া নিজের চূড়ান্ত সম্ভোগ-সুখ-মুহূর্ত্তেও নিজ সুখ দ্বারা পতি-সুখই বিধান করিতেছেন বলিয়া অনুভব করিতে প্রয়াসিনী হইতেন।

(৪) অত্যধিক ইন্দ্রিয়োচ্ছ্বাস-হেতু মনের একমুখ ধ্যান-গতি স্তব্ধ বা বিহ্বল হইবার সম্ভাবনা দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্টায়াম নামক কিঞ্চিদ্‌বলসাধ্য প্রাণায়াম অবলম্বন পূর্ব্বক শ্বাসের চাঞ্চল্য প্রশমিত করিয়া কামকে হাতের মুঠায় আনিয়া সঙ্গম-কালের দৈর্ঘ্য সম্পাদন করিতেন।

(৫) পতি যোনিমুদ্রা দ্বারা গুহ্যদেশ আকুঞ্চন পূর্ব্বক ক্ষয়োন্মুখ বীর্য্যের বহির্ম্মুখিনী গতি সাময়িক ভাবে স্তব্ধ করিয়া দিতেন এবং পত্নী যোনিমুদ্রার অনুশীলনের দ্বারা সাময়িকভাবে শ্রম-বিরত স্বামীকে আত্মিক রতিরসের আস্বাদন দিতে থাকিতেন।

আরও কতকগুলি কার্য্য তাঁহারা করিতেন, যাহা ব্যক্তিগত ভাবে এক এক ক্ষেত্রে খুবই সময়োচিত হইলেও সর্ব্বজনীন ভাবে উল্লেখের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। তাই তাহাদের উল্লেখ

আর এইস্থানে করিলাম না। কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত জনন-প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কারের আলোকেও যে অবৈজ্ঞানিক নহে, ইহা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বিবেচনা করিতেছি। বীর্য্যক্ষরণের শারীর কারণ দৈহিক প্রক্রিয়া, মানসিক কারণ কামাতুরতা। এই দুই কারণের যে-কোনও একটীকে অবলম্বন করিয়া বীর্য্যধাতু ক্ষরিত হইতে পারে। কিন্তু দৈহিক প্রক্রিয়া এবং কামাতুরতা এই দুইটী কারণই একত্র মিলিত হইলে অতি দ্রুত শুক্র-নির্গম হইয়া যায়। পরন্তু একটি কারণকে স্বীকার করিয়া অন্য কারণটিকে যদি চেষ্টা দ্বারা নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহা হইলে শুক্রনির্গম বিলম্বে হয় এবং তাহার ফল শুভ হয়। কিন্তু সন্তান-জনন-ব্যাপারে দৈহিক প্রক্রিয়ার নির্ব্বাসন অসম্ভব। অপিচ, কামবুদ্ধির নির্ব্বাসন সাধক-সাধিকার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। "জগতের মঙ্গল-কল্পে আমি মঙ্গল-নিলয় শ্রীভগবানের কৃপায় এই দাম্পত্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেছি—"ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং মঙ্গল-নিলয়কৃপয়ৈব জনন কর্ম্মণি প্রবৃত্তঃ"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জনন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কামবুদ্ধি স্বভাবতঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। ক্রিয়া-নিষ্পত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেকটী আন্দোলনের তালে তালে মনে মনে গুরুগম্ভীর নাদে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকিলেও কামবুদ্ধি খর্ব্ব হইতে বাধ্য।

শুক্র-নির্গমে বিলম্ব ঘটাইবার উপায়

"ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং মঙ্গলনিলয়কৃপয়ৈব জননকর্ম্মণো নিবৃত্তঃ"—জগতের মঙ্গলকল্পে আমি মঙ্গলনিলয় শ্রীভগবানের কৃপায় এই জনন-কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলাম"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শুক্রনিষেক করিলে কামবুদ্ধির স্বভাবসঞ্জাত অবসাদ লুপ্ত হইতে বাধ্য।

সকাম ভাবেই হউক বা নিষ্কাম ভাবেই হউক, শুক্র-নিষেকে শারীরিক অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিজেকে ত্যাগবুদ্ধি-প্রযুক্ত রাখিয়া জগন্মঙ্গলোদ্দেশ্যে শুক্রনিষেক করিলে তাহা অনেক ক্ষেত্রে শারীর অবসন্নতা হইতে প্রমুক্ত থাকে। মূত্র-নিষ্ঠীবনাদি পরিত্যাগে যেমন শারীর দৌর্ব্বল্য নাই, এই ক্ষেত্রেও ব্যাপার তাহা দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে শুক্রনিষেক সাধকের দৃষ্টিতে কোনও জান্তব ক্রিয়া নহে, ইহা দৈব কর্ত্তব্য বা অপার্থিব প্রয়াস মাত্র। * এতদতিরিক্ত, মনকে দেহাতীত তত্ত্বে অথবা দেহের ঊর্দ্ধাংশে স্থির করিয়া প্রাণায়াম-সাহায্যে অগ্রসর সাধক-সাধিকারা মৈথুনকালীন কামভাব অনায়াসে খর্ব্ব করিতে পারেন।

মন যখন দেহের যে যন্ত্রে থাকে, তখন সে যন্ত্র সামান্য শ্রমে ক্লান্ত হয়। লেখা-পড়ার সময়ে পুস্তকের দিকে মন না রাখিয়া চক্ষু বা মস্তিষ্কের দিকে মন রাখিলে চক্ষু বা মস্তিষ্ক সহজে ক্লান্ত হয়। প্রাণায়াম-কালে ভ্রূমধ্যে মন না রাখিয়া ফুস্‌ফুসে রাখিলে সহজে শ্রান্তি আসিয়া পড়ে। ব্যায়ামের সময়ে দেহের মাংসপেশীগুলির দিকে মন দিলে যে অল্প সময়-মধ্যে ব্যায়াম হইয়া যায়, একথা প্রত্যেক ব্যায়ামাভ্যাসীরই পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। সন্তান-জননকালেও মন যদি জনন-যন্ত্রেই অবস্থান করে, তাহা হইলে সামান্য পরিমাণ দৈহিক সঞ্চালনেই জনন-যন্ত্র তাহার উত্তেজনার চরমে পৌঁছে এবং অতি অল্প সময়ে শুক্রনির্গমন করিতে বাধ্য

জনন-কালে মন জননাঙ্গে রাখার অপকারিতা

* মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, "স্ত্রী-সম্ভোগ করিবার কালে কেহ যদি বীর্য্যস্তম্ভন না করিয়া ধার্ম্মিক ও সাধুচরিত সন্তানের উৎপত্তির আকাঙ্ক্ষায় শুক্রপাত করে, তাহা হইলে উহার ফলে তাঁহার সন্তানোৎপত্তি ঘটুক কি না ঘটুক, যে সন্তান জন্ম-গ্রহণের পরে সমস্ত জীবন ভগবানের কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়া উৎপীড়নকারীদেব হস্তে ধর্ম্মেরই জন্য প্রাণ দিয়াছে, সেইরূপ সুসন্তান লাভের পুণ্য তাহার নামে লিপিবদ্ধ হয়।" এই বিষয়ে আমাদের মত এই যে, সত্য সত্য এইরূপ চিন্তা দম্পতীর মনে তৎকালে থাকিলে দম্পতীর কামভাব থাকিতে পারে না এবং তাহাদের ঘরে কামুক, লম্পট, পরদারাভিমর্ষণ-কারী দুশ্চরিত্র সন্তান জন্মিতেও পারে না।

হইয়া অবসাদগ্রস্ত হয়। ব্যায়ামকারীর পক্ষে ব্যায়ামকালে মাংসপেশী-গুলিতে মন রাখা হিতকর, কিন্তু সন্তান-জননকারীর পক্ষে জননকালে জননেন্দ্রিয়ে মন রাখা ক্ষতিকর। এই সময়ে মন জনন-যন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিলে জননাঙ্গের স্বাভাবিকী শ্রান্তি আসিতে বিলম্ব হয়, সুতরাং ভগবৎ-প্রাপ্তির পক্ষে যাহা পরম সহায়ক, যোগী-জনাচরিত সেই ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামাদি-সমন্বিত মানসিক কৌশল-সমূহকে জনন-ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া গৃহী সাধক প্রকৃতই লাভবান্ হন। ইহা কল্পনার বা কুসংস্কারের প্রশ্রয় নহে। জনন-কালে মনকে নামজপ, ইষ্টচিন্তা প্রভৃতি যৌগিক কৌশলের সহায়তায় ভগবানের পায়ে ফেলিয়া দিতে পারিলে, জন্মদান-কার্য্য কামবর্জ্জিত হইতে পারে।

মনকে যত উৎকৃষ্ট তত্ত্বে রাখা যায়, সন্তানের তত অধিকতর কুশল হয়। "তত্ত্ব" বলিতে অনেক কথা বুঝা যায়। ব্রহ্মও একটী তত্ত্ব, মহাপুরুষের জীবনও একটী তত্ত্ব, জগৎ-কল্যাণও একটী তত্ত্ব, স্বদেশসেবাও একটী তত্ত্ব। এমন কি নিজ সুখের বা তৃপ্তির পানে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া কাম-সঙ্গীর বা সঙ্গিনীর সুখ বা তৃপ্তির প্রতি প্রতিদান-লাভ-বুদ্ধি-হীন লক্ষ্য প্রদানও স্থল-বিশেষে একটী তত্ত্ব। সর্ব্বকালীন আচরণে যে-নরনারী যে-তত্ত্বটীর অনুশীলন করিয়াছেন, জনন-কালে তাঁহার পক্ষে সেই তত্ত্বটীতে মনঃসন্নিবেশন কর্ত্তব্য। তত্ত্বে মনঃসন্নিবেশনকালে দেহ-মধ্যস্থ স্থান-বিশেষ ঐ সন্নিবেশনের কেন্দ্রস্বরূপ হইতে পারে, দেহাতিরিক্ত বহির্দ্দেশকেও আশ্রয় করা যাইতে পারে। ইহাও

জননকালে মনকে কোথায় রাখিবে ?

ভাগ

চিরাচরিত অভ্যাস-সাপেক্ষ। কারণ, যিনি প্রতিদিন ভগবদুপাসনাকালে দেহের একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে অথবা বহির্দ্দেশস্থ একটী নির্দ্দিষ্ট আলম্বনে মন স্থির করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, জননকালে তাঁহার পক্ষে হঠাৎ কেন্দ্র বা আলম্বন পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় বিফলতা আসিবেই। পরন্তু, জীবনব্যাপী চেষ্টায় যে ভাগ্যবান দম্পতী একটি তত্ত্বকে ধরিয়া একটী কেন্দ্রকে লইয়া ভগবদুপাসনা-কালে বা অন্য সময়ে মনঃসন্নিবেশনের অভ্যাস করিয়াছেন, জননকালে তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। দৃষ্টান্ত যেমন, অভ্যাসবলে নৈপুণ্যলাভ করিলে পূর্ণকুম্ভ শিরে ধারণ করিয়াও নর্ত্তকীরা স্বচ্ছন্দে নৃত্য-গীতাদি করিতে পারেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও কলসী হইতে মন অন্যত্র যায় না। কলসী হইতে মন অন্যদিকে ধাবমান হইলে তৎক্ষণাৎ কলসীর পতন অনিবার্য্য। অথচ, ইহা লইয়াই কঠিন কঠিন রাগরাগিণীর শাস্ত্রসম্মত আরোহণ অবরোহণ চলিতেছে, কঠিন তালে পদসঞ্চালন হইতেছে।

অভ্যাসের শক্তি

এই স্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দেহাতীত আলম্বন অপেক্ষা দেহমধ্যস্থ কেন্দ্রসমূহই সাধক-সমাজে একটু বেশী আদর পাইয়াছে। দেহাতিরিক্ত বহির্দ্দেশীয় বস্তুতে বা বিষয়ে ধ্যান জমাইতে তাঁহারা যতটা রুচিসম্পন্ন, এই দেহকেই সর্ব্বদেবতার নিবাস ও সর্ব্বতীর্থের পুণ্যপীঠ জ্ঞান করতঃ নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী এক একটি বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে মনঃস্থির করিবার ধারাবাহিক প্রয়াসে তাঁহারা তার চেয়ে বেশী আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—

দেহাতীত আলম্বন ও দেহমধ্যস্থ কেন্দ্র

"যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"

পরন্তু,—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি, তে সন্তি দেহমন্দিরে।"

অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডে যত গুণ আছে, সব দেহ-মন্দিরে আছে।

শিবসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্ত-দ্বীপ-সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্র-পালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে।"

মানবদেহ সর্ব্বতীর্থের আকর ও সর্ব্বদেবতার নিবাসভূমি

অর্থাৎ, এই যে তোমার ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব জড়দেহ, তাহা নিতান্তই জড় নহে এবং তুচ্ছও নহে। ইহাতে সপ্তদ্বীপসমন্বিত মেরু রহিয়াছে, রহিয়াছে কত কত নদনদী, কত কত সাগর, উপসাগর, মহাসাগর। ইহাতে কত কত রহিয়াছে পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য, কত রহিয়াছে মরুভূমি, মালভূমি, উপত্যকা, কত রহিয়াছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল, কত রহিয়াছেন সংশিতব্রত মুনি, তত্ত্বজ্ঞ ঋষি, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ বিগ্রহ-স্বরূপ কত বিভূতি, কত রহিয়াছে গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র, ইউরেনাস, নেপচ্যুন, কত রহিয়াছে পুণ্যতীর্থ ও পীঠস্থান, কত রহিয়াছেন পীঠদেবতা। ইহাতে রহিয়াছেন ভ্রাম্যমান চন্দ্র-সূর্য্য, যাঁহাদের গতি ও স্থিতির মধ্য দিয়া অবিরাম চলিয়াছে কত সৃষ্টির সমারোহ, কত প্রলয়ের তাণ্ডব-নর্ত্তন, কত জন্ম, কত মৃত্যু, কত বিকাশ, কত বিলয়, কত আবির্ভাব, কত তিরোধান। ইহারই ভিতরে রহিয়াছে মহাশূন্য

পরব্যোম, আকাশ, বহ্নি, সলিল, মৃত্তিকা। তিন লোকে যাহা কিছু আছে স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তু, সবই রহিয়াছে এই দেহে, মেরুকে বেষ্টন করিয়া তাহাদের সম্পর্কিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার অনুশীলন হইতেছে।

একদিকে যেমন ভারতীয় দার্শনিক দেহটাকে নিতান্তই একটা মাটির খাঁচা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন এবং দেহ-সুখে অনাস্থা করিয়া দেহাতীত পরম সত্তায় আনন্দের করিতেছেন অনুসন্ধান, অপর দিকে তেমন দেহের প্রত্যেকটী অণুপরমাণুর মধ্যে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-বিলয় অনুভব করিয়া যোগী এই নশ্বর দেহকে দিব্যদেহের মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। ইহা হইতেই তান্ত্রিক যোগীর ষট্‌চক্রভেদ, ইহা হইতেই অখণ্ড-যোগীর যৌগিক পরিভ্রমণের সৃষ্টি ও সন্মান। দেহকেই ব্রহ্মাণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া ইহারই মধ্যে যোগীরা ত্রিজগতের বিভাগ করিয়াছেন। নাভি হইতে তন্নিম্নে তামসিক জগৎ বা পাতাল, নাভির ঊর্দ্ধে ও কণ্ঠের নিম্নে রাজসিক জগৎ বা মর্ত্ত্য এবং কণ্ঠ হইতে তদূর্দ্ধে সাত্ত্বিক জগৎ বা স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল

মনের তামসিক অবস্থায় মানবের মন নিয়ত জননেন্দ্রিয়ের সমীপস্থ হইয়া থাকে বলিয়া নিতান্ত তামসিক ভাবাপন্ন সাধকের পক্ষে যোগীরা যোনিমণ্ডলে বা উপস্থমূলে মনঃস্থৈর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কথিত হয়, কলিতে মানুষের মন যোনিগত হইয়া থাকে। কলি বলিতে এখানে মনের তামসিক আবিলতা বুঝিতে হইবে। সত্য-যুগেও অনেক মানুষের মন যোনিগত হইত। ভোগ-বুদ্ধি লইয়া নিজের বা অপরের জননাঙ্গের চিন্তাই তামসিক অবস্থার প্রধান লক্ষণ। এই অবস্থায় যোনিমণ্ডলে বা উপস্থমূলে উন্নততম সাত্ত্বিক চিন্তার প্রগাঢ়তা একই সঙ্গে

সত্যযুগ ও কলিযুগ

দুই প্রকার সুফল প্রদান করে। প্রথম সুফল এই যে, মন যোনিগত বা লিঙ্গগত হওয়া মাত্র যে কামমূলক কুচিন্তা প্রবাহিত থাকিত, তাহা স্তব্ধ হইয়া যায় এবং মন যোনিতে বা লিঙ্গে অভিনিবিষ্ট হইলেও তৎকালে উন্নততম, প্রকৃষ্টতম, শুদ্ধতম তত্ত্বের অনুশীলন অতিশয় সহজ হইয়া যায়। দ্বিতীয় সুফল এই যে, যোনি কিম্বা লিঙ্গকে চিরন্তন কাল ধরিয়া যে কামজ আচরণ-সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, তদপেক্ষা শুদ্ধতর ও সুন্দরতর আচরণের সহিত ইহাদের সংস্রব-কল্পনা সহজ হইয়া পড়ে। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয় তাহাদের কুখ্যাত জঘন্যতা পরিহার করে। উপস্থ ও গুহ্যদ্বার এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকুকে যৌগিক পরিভাষায় যোনিমণ্ডল বলা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের পক্ষে কামাদ্রি (Clitoris) হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত সবটুকুই যোনিমণ্ডল বলিয়া পরিগণিত হয়। তান্ত্রিক ষট্‌চক্রভেদীরা এই স্থানেই মূলাধার নামক চক্রের কল্পনা করিয়া থাকেন। ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি এইখানেই তাঁহার তামস নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কামনা বাসনার বিষয়বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া অঘোর অচেতন কর্ম্মশক্তিহীন নিষ্ক্রিয়তায় পড়িয়া আছেন,—সাধক "জাগৃহি জননি, জাগৃহি" বলিয়া এইখানেই তাঁহার তপস্যায় রত হন। যৌগিক পরিভ্রমণকারী অখণ্ড-সাধক এইখানেই মনঃসংযোগ করিয়া গুহ্যমূলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সুপ্ত-সত্তাশক্তিকে ঠেলিয়া মেরু-বংশের মধ্য দিয়া ভ্রূমধ্যে টানিয়া নেন। তান্ত্রিকের যাহা কুলকুণ্ডলিনী, অখণ্ডের তাহাই সত্তাশক্তি বা স্বয়ম্ভাতি প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা নিজের আলোকে নিজে উদ্ভাসিত, সাধকের জগন্মঙ্গল সঙ্কল্প সহ এই প্রজ্ঞা বা সত্তাশক্তি বাহিরের ত্রিভুবন পর্য্যটন হইতে বিরত হইয়া মেরুদণ্ড ও

মূলাধার চক্র

কুলকুণ্ডলিনী বনাম সত্তাশক্তি বা স্বয়ম্ভাতি প্রজ্ঞা

হস্তপদাদির মধ্যবর্ত্তী অস্থি-মজ্জার ভিতর দিয়া শরীরের ভিতরেই ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছে। এই দৃষ্টিতে গৃহস্থ বা ত্যাগী সকল অখণ্ডই এক এক জন পরিব্রাজক। অখণ্ডের নিকটে পরম-প্রেষ্ঠের দ্বৈত-কল্পনা অবান্তর। সুতরাং এই ব্যাপারে সে আত্মশক্তির সহিত ব্রহ্মশক্তির পটভূমিগত পার্থক্যের অবতারণা না করিয়া "আত্মাতেই সব এবং সব কিছুতেই আত্মা" এই বোধ লইয়া "আমি দেহ হইতে পৃথক্ এবং দেহ আমার জগৎকল্যাণকর্ম্মের সিদ্ধি-সৌকর্য্যার্থ অস্ত্র, যন্ত্র বা প্রহরণ মাত্র" এই সঙ্কল্প লইয়া চলিতে থাকে। পরন্তু তান্ত্রিক যোগী পরম-প্রেষ্ঠকে শিব এবং শক্তি এই দ্বিবিধ সত্তায় খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়া ষট্‌চক্রভেদ-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া সহস্রবার-স্থিত পরমশিবের সহিত মূলাধারস্থিত ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনীর মিলন-সাধনে প্রয়াসী হন। অখণ্ডের পরিভ্রমণে এবং তান্ত্রিক

ষট্‌চক্রভেদ ও পরিভ্রমণ

ষট্‌চক্রভেদে পার্থক্য মাত্র এইটুকু। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের (Physiology and Anatomy-র) দৃষ্টিতে অখণ্ডের পরিভ্রমণ অধিকতর বাস্তব। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের বিচারের কোনও প্রয়োজন নাই,—যিনি যেই পথ ধরিয়াছেন, তিনি সেই পথে অবিচলিত নিষ্ঠায় অপরাজেয় পৌরুষে লাগিয়া থাকিলেই তাঁহার পথ শ্রেষ্ঠ। পথের শ্রেষ্ঠতার অন্য প্রমাণ-প্রয়োগ নিরর্থক। কি ষট্‌চক্রভেদে, কি অখণ্ডের পরিভ্রমণে মূলাধার ও গুহ্যমূল ও তৎসন্নিহিত প্রত্যঙ্গ অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

পুরুষের উপস্থমূলে কামগ্রন্থি (Prostate Gland), আর স্ত্রীলোকদের উপস্থমূলে জরায়ু (Uterus)। ষট্‌চক্রভেদীরা উপস্থমূলেই

স্বাধিষ্ঠান নামক চক্রের কল্পনা করিয়া থাকেন। কুলকুণ্ডলিনী বা সত্তা-শক্তি গুহ্যমূলে তথা যোনিমণ্ডলে ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও জীবের ভোগেন্দ্রিয়ের সুখভোগের শক্তিকেন্দ্র রহিয়াছে এই স্বাধিষ্ঠানে বা লিঙ্গমূলে। এই স্থানে উন্নততম চিন্তার ধ্যান ও

স্বাধিষ্ঠান

অনুধ্যানের দ্বারা আত্মসুখের লিপ্সাকে বিশ্ব-সুখের লিপ্সায় রূপান্তরিত করা যায়,—যাহাকে পাশ্চাত্য যৌনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা নাম দিয়াছেন Sublimation. তাঁহারা Sublimation কে জানিয়াছেন কিন্তু এই উপায়টীকে জানেন নাই।

যাহাদের মন তমো-রাজসিক অর্থাৎ একবার মন অতি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে ধাবিত হয় আর একবার তাহা অপেক্ষা কম নিকৃষ্ট সুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়,—এমন ব্যক্তিদের মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য নাভিমূল বিহিত হইয়াছে। উপস্থ-সহায়ে যেই সকল সুখভোগ করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই নিকৃষ্টতম বলা হয়। রসনা দ্বারা উদরপূরণ করিয়া যে সুখ আস্বাদিত হয়, তাহাকে অত নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয় না। কেন হয় না? তাহার কারণ এই যে, জননাঙ্গের দ্বারা

রসনেন্দ্রিয় অপেক্ষা জননেন্দ্রিয় নিকৃষ্ট কেন?

কোনও সুখ আস্বাদন করিলে পুনরায় সেই সুখ আস্বাদনের জন্য যে পরিমাণ উন্মাদনা জন্মে, একবারের উদরপূরণ-জনিত তৃপ্তি পুনরায় তদ্রূপ তৃপ্তিলাভের জন্য মানুষকে সেই পরিমাণ ক্ষিপ্ত করে না। ক্ষণসুখ যেখানে যেই পরিমাণ তীব্রতা সহকারে লালসা বর্দ্ধন করে, সেইখানে সেই সুখাস্বাদনের সহায়ক ইন্দ্রিয় সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। দিবারাত্রি জান্তব সুখের চিন্তায় আচ্ছন্ন লোকের পক্ষে মূলাধার বা স্বাধিষ্ঠানে

মণিপুর

মনোনিবেশ এই জন্যই বিহিত। পরন্তু, যাহাদের তামসিক আবিলতার মধ্যে রাজসিকতাও উঁকিঝুঁকি মারে, তাহাদের জন্য নাভিমূল মনঃসংযমের পক্ষে উৎকৃষ্টতর স্থান। এই স্থানেই মণিপুর নামক চক্র কল্পিত হইয়া থাকে।

রাজসিক ব্যক্তির পক্ষে হৃৎপদ্ম মনঃসংযমের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। নিদারুণ-তামসিকতা-বর্জ্জিত সাধারণ সাধ-আকাঙ্ক্ষা রাজসিক ব্যক্তির প্রচলিত লক্ষণ। সাহস কিম্বা দুঃসাহস, আত্মবিশ্বাস কিম্বা অহঙ্কার,—এই সকল হইতেছে রাজসিক ব্যক্তির সাধারণ লক্ষণ।

তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তির পার্থক্য

সে যাহা-কিছু চাহে, নিজের জন্যই চাহে। পরের জন্য তাহার কোনও আকুতি নাই, তবে, নিজ-সুখ লাভের পথে অপরের যদি সুখ-লাভ হইয়া যায়, তবে তাহাতেও আপত্তি নাই। অপরের সুখের প্রতি এইরূপ ঔদার্য্যপূর্ণ স্বার্থপর ব্যক্তিরা রাজসিক। তামসিক ব্যক্তির এই ঔদার্য্যের বালাই নাই। সে নিজেই জগতের সকল সুখ লুটিয়া লইবে, অপরকে তাকাইয়া দেখিবার সুখাধিকারটুকুও সে দিবে না। তামসিক ব্যক্তি ভগবানকে ডাকে "দ্বিষো জহি,—শত্রুকে নাশ কর" বলিয়া। রাজসিক ব্যক্তি ভগবানকে ডাকে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি" বলিয়া কিন্তু "দ্বিষো জহি" বলিবার রুচি পায় না। এমন ব্যক্তিদের জন্য হৃৎপদ্মে

অনাহত পদ্ম

মনঃসন্নিবেশ প্রকৃতই উপযোগী। হৃদয়ের আবেগ যাহাদের অত্যধিক, ভাবুকতা অপেক্ষা ভাবপ্রবণতা যাহাদের বেশী, তাহাদিগের জন্য ইহা সর্ব্ব-জন-সম্মত ধ্যান-কেন্দ্র। হৃৎপদ্ম বলিতে স্নায়ু, রক্ত, মাংসাদির বিচার করিতে গেলে হৃৎপিণ্ড (Heart) বুঝায়, কিন্তু যোগীর হৃদয় তাহা নহে। অনুরাগ, স্নেহ,

ভালবাসা প্রভৃতি সুখকরী বৃত্তির উদয় হইলে বক্ষের অভ্যন্তরে যে-প্রদেশে সুখময় বোধ হয় এবং দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, বিরাগাদি উপস্থিত হইলে বিষাদময় বা ক্লিষ্ট বোধ হয়, সেই প্রদেশেরই যৌগিক নাম হৃদয়। ষট্‌চক্রভেদীরা এই স্থানেই 'অনাহত পদ্মের' কল্পনা করিয়া থাকেন। বিনা আঘাতে স্বাভাবিক ভাবে এখানে মহানাম শ্রুত হয় বলিয়া ইহার নাম অনাহত-পদ্ম।

রজঃসাত্ত্বিকের পক্ষে কণ্ঠমূল শ্রেষ্ঠ ধ্যান-কেন্দ্র। এই স্থানেই যোগীরা বিশুদ্ধ নামক চক্রের কল্পনা করিয়াছেন। রাজসিকতার গণ্ডী ছড়াইয়া

বিশুদ্ধ চক্র

আসিয়া সাত্ত্বিকতার বিশুদ্ধতার পরম প্রভাব এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইল বলিয়া ইহার নাম বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধচক্রে মনঃসন্নিবেশনকারীরা বাগ্মর বা বাগ্মী হইয়া থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সাত্ত্বিক ব্যক্তির পক্ষে ভ্রূমধ্যই ধ্যানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভ্রূমধ্য বহুনামে পরিচিত। যথা,—নাসাগ্র, তৃতীয় নয়ন, ত্রিবেণী-সঙ্গম, দ্বিদল-পদ্ম, আজ্ঞা-চক্র ইত্যাদি। গীতায় নাসাগ্রে মনঃস্থির করিবার উপদেশ আছে,—যথা—"সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং"। সাধারণতঃ নাসিকাগ্র বলিতে লোকে যাহা বুঝে, তাহা হইতেছে নাকের ডগা। নাকের ডগায় দৃষ্টি রাখিলে অনেকের শিরোরোগ হয়। তবে, নাকের ডগায় দৃষ্টি দিতে গিয়া যদি ব্যতিরেক-ক্রিয়ায় দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে আসিয়া যায়, তাহা হইলে আলম্বন হিসাবে নাকের ডগাও তুচ্ছ করিবার মতন স্থান নহে। বৈষ্ণবদের রসকলি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। প্রকৃত নাসাগ্র ভ্রূমধ্য। কেননা, নাকের নিম্নদিক হইতে হিসাব করিলে

আজ্ঞাচক্র

ভ্রূমধ্যই নাসাগ্র হয়,—নাকের গুম্ফের উপরিভাগকে তাহার Base বা ভূমি কল্পনা করিয়া তাহার Vertex

বা শিরঃকোণ ঠিক ভ্রূমধ্যেই পড়ে। যোগীরা ইহাই বুঝেন। এই প্রসঙ্গে গীতা-বাক্য প্রণিধান-যোগ্য,—"ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্" ইত্যাদি। মহাদেব ভ্রূমধ্যে মনঃস্থির করিয়াই জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই মদনভস্ম উপাখ্যানে রূপকে বলা হইয়াছে। ভ্রূমধ্যই ব্রহ্মজ্ঞের তৃতীয় নয়ন বা দিব্যচক্ষু। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী শক্তি-স্রোত তাহাদের ত্রিত্ব-ত্যাগ করিয়া এই স্থানে অভিন্ন সত্তায় আসিয়া মিলিত হয়, তাহাই গঙ্গা যমুনা সরস্বতী রূপকে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত ত্রিবেণী এলাহাবাদে নয়, যার যার ভ্রূমধ্যেই ত্রিবেণী বিরাজ করে। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"ঈড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী। ঈড়া-পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী ॥ ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে। তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥" অর্থাৎ "ঈড়া জানিবে ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলাকে জানিবে যমুনা নদী, আর ঈড়া-পিঙ্গলার মধ্যে অবস্থিত সুষুম্নাকে জানিবে সরস্বতী নদী বলিয়া। এই তিন নদী যেথানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাকে জানিবে ত্রিবেণী, (তাহাই তোমার ভ্রূমধ্য)। এই স্থানেই করিবে স্নান, ইহা হইতেই সর্ব্বপাপ হইতে তুমি প্রমুক্ত হইবে।" তাঁহারা আরও বলিয়াছেন,—"ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ। আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে ॥" অর্থাৎ স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে দেবী, এইটা তীর্থ, ঐইটা তীর্থ, এইরূপ বলিয়া বলিয়া তামসিক ব্যক্তিরা দেশের পর দেশ পর্য্যটন করে, কিন্তু (নিজ ভ্রূমধ্যে যে ত্রিবেণীরূপ তীর্থ-বিরাজ করে, সেই)

তৃতীয় নয়ন

ত্রিবেণী

আত্মতীর্থকে জানে না। তাহাদের আবার মোক্ষলাভ কি করিয়া হইবে বা হইতে পারে?" ফলিতার্থ এই যে, প্রকৃত সাধক এলাহাবাদের ত্রিবেণীকে অনাদর করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ ত্রিবেণীতেই সমাদর প্রদর্শন করেন। ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশ করিলে যে অপূর্ব্ব রূপ নিবিষ্ট সাধকের দর্শনে আসে, দ্বিদল কথাটী তাহারই ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সৃষ্ট। রামায়াৎ বলেন,—"রাম-সীতাকে একত্র দেখিলাম", শাক্ত বলেন,—"শিবদুর্গাকে দেখিলাম", বৈষ্ণব বলেন,—"রাধাকৃষ্ণকে দেখিলাম", বৈদান্তিক বলেন,—"জীব ও ব্রহ্মকে দেখিলাম", সাংখ্য-যোগী বলেন,—"প্রকৃতি-পুরুষকে দেখিলাম", অখণ্ড-সাধক বলেন,—"নিজেকে দেখিলাম আর দেখিলাম স্বকীয় লীলাকে",—সকলেই অভেদ দর্শন করেন অথচ অনুভূতিকে স্মৃতির পটে আঁকিয়া রাখিবার প্রয়োজনে দ্বিত্বের একটা ক্ষীণাতিক্ষীণ আভাস অনুভব করেন, কেননা সম্যক্ অদ্বৈত relative (আপেক্ষিক) নহে বলিয়া অর্থাৎ কাহারো পরোয়া রাখে না বলিয়া ব্যাখ্যার অযোগ্য। উক্ত রূপ কোন চিত্রপটে আঁকা রূপ নহে, উহা অবর্ণনীয় এবং অকল্পনীয়। এই স্থানে মনোলয়ের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় বলিয়াই ইহার নাম আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞা বলিতে কেবল আদেশই বুঝায় না, সব কিছুকে আবেষ্টন করিয়া যে পূর্ণজ্ঞান, তাহার নাম আজ্ঞা। দাস্যভাবের সাধকেরা বলেন,—"এখানে প্রভুর আজ্ঞা শুনিতে পাই", সোহহং ভাবের সাধকেরা বলেন,—"এখানে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করি", অখণ্ড-সাধক উপলব্ধি করেন,—"এখানে দ্বৈততত্ত্ব অদ্বৈতের মধ্যে আপন হারাইয়া গিয়াছে, এখানে অদ্বৈততত্ত্ব দ্বৈতের বিরুদ্ধে শাসনের খড়্গ উত্তোলনে অসম্মত হইয়াছে, সকল মতের সকল পথের আপাত-বিরোধ এক সর্ব্ব-সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে আসিয়া মিলিয়াছে।"

দ্বিদল

জননকালে স্বামিপত্নীর মন জনন-যন্ত্রের মধ্যে থাকিলে সন্তান কামুক হয়। তৎকালে স্বামিপত্নীর মন কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে থাকিলে সন্তান সহজে কামজয়ে সমর্থ হয়। জননকালে স্বামিপত্নীর মন বক্ষে থাকিলে সন্তান সাহসী এবং অহঙ্কারী হয়। তৎকালে স্বামিপত্নীর মন ভ্রূমধ্যে থাকিলে সন্তান ব্রহ্মবাদী ও সর্ব্বকল্যাণকৃৎ হয়। কামুক ব্যক্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়েরই পক্ষে সন্তান-জনন সম্পর্কিত শারীরিক প্রক্রিয়া এক কিন্তু মনোনিবেশের কেন্দ্র-পার্থক্যের দরুণ সন্তান বিভিন্ন চরিত্রের হইয়া থাকে। কারণ, পতিপত্নীর মৈথুন বহু বিদেহী আত্মাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের জন্য টানিয়া আনিলেও মৈথুন-কালীন মনোভাবের অপরিচ্ছন্নতা বা স্বল্পতার অনুপাতে দুষ্কৃতিমান্ বা সুকৃতিসম্পন্ন আত্মাই শুক্রকীট-মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। পতি-পত্নীর মধ্যে একের মন নিম্নগামী এবং অপরের মন উচ্চগামী হইলে, যাহার মনের গতি অধিকতর প্রবল, সন্তান তাহারই মানসিক সাদৃশ্য পায়, কিন্তু অপরের মনোগতির প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে না।

জননকালে মনঃসন্নিবেশনের কেন্দ্র ও তৎ-ফলাফল

নিম্নগামিনী মনোগতিকে উর্দ্ধগামিনী করিতে প্রাণায়ামের শক্তি অসাধারণ। প্রাণায়াম প্রধানতঃ শরীরের উর্দ্ধাংশের ও মধ্যাংশের ক্রিয়া। তাই প্রাণায়াম-কালে মন বাধ্য হইয়াই দেহের নিম্নাংশকে ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধমুখ হয় এবং তাহারই ফলে বীর্য্য-ক্ষয়ের প্রবণতা হ্রাস পায়। আবার শ্বাসের চাঞ্চল্য নাশপ্রাপ্ত হইলে মনের চাঞ্চল্য নাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই কারণেও বীর্য্যের চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। "হঠযোগ প্রদীপিকা" বলিয়াছেন,—

প্রাণায়ামের সার্থকতা

"চলে বাতে চলং চিত্তং, নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।"

অর্থাৎ,—"বায়ু চঞ্চল হইলে চিত্ত চঞ্চল হয়, আবার বায়ু স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়।" বীর্য্যক্ষয় এবং ক্ষয়াবরোধের সহিত মানসিক চঞ্চলতা ও চাঞ্চল্যনিরোধের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাণবায়ু, মন এবং বীর্য্য এই তিনটীই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলে, একে অপরের গতি বা স্থিতির অনুসরণ করে। যাহার প্রাণবায়ু চঞ্চল, তাহার মন চঞ্চল হইবেই, বীর্য্য ক্ষয়প্রবণ হইবেই, যাহার মন অস্থির, তাহার বীর্য্য ক্ষয়প্রবণ হইবেই, প্রাণবায়ু চঞ্চল হইবেই। আবার, যাহার বীর্য্য ক্ষয়িত হইতেছে, তাহার মন ও প্রাণবায়ু চঞ্চল না হইয়াই পারিবে না। এই তত্ত্বটি যোগীরা যেদিন আবিষ্কার করিলেন, সেই দিন হইতেই আধ্যাত্মিক সাধন-রাজ্যের যেন শত শত রুদ্ধ দুয়ারের কপাট যুগপৎ খুলিয়া গেল। নানা সম্প্রদায় নানা উপায় প্রয়োগে কেহ বা বীর্য্যের স্থিরতা, কেহ বা মনের স্থিরতা, কেহ বা প্রাণের স্থিরতার সাধন করিয়া পরমার্থসিদ্ধ হইতে লাগিলেন। কদাচিৎ দুই একটী গভীর প্রতিভার অধিকারী তিনটীরই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিলেন।

প্রাণবায়ু, মন ও শুক্রের পরস্পর সম্বন্ধ

যাঁহারা প্রাণের স্থিরতা সাধন করিয়া তদবলম্বনে পরমকল্যাণলাভে যত্নবান্ হইলেন, প্রাণায়ামের অধিকাংশ কৌশল তাঁহারাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা মনের স্থিরতা দ্বারা পরমকল্যাণ লাভে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, প্রাণায়ামের কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম কৌশল স্বভাবতঃই তাঁহাদের কাছে ধরা পড়িয়া গেল। ফলে ধীরে ধীরে প্রাণায়াম-সাধনার পরস্পর-বিরোধী দুইটী পৃথক্ শ্রেণী দাঁড়াইয়া গেল। এক

প্রাণায়াম পদ্ধতিসমূহের আবিষ্কার

শ্রেণীর সাধকেরা প্রাণবায়ুর উপরে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে যথেচ্ছ পরিচালন ও বিধারণ করিতে লাগিলেন, অপর শ্রেণীর সাধকেরা প্রাণবায়ুর উপর হইতে ইচ্ছাশক্তিকে গুটাইয়া আনিয়া শুধু ফলাভিসন্ধিহীন নিঃস্পৃহ মনকে তাহার উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই দুই শ্রেণীর সাধকেরা প্রাণায়াম কথাটীকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। উভয়েই বলিলেন,—"শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়াম ঃ—শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম" (পাতঞ্জল দর্শন), কিন্তু "গতিবিচ্ছেদ" বলিতে তাঁহারা দুই প্রকার বুঝিলেন। এক শ্রেণীর সাধকেরা বলেন,—"গতি-বিচ্ছেদ কথাটীর মানে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তদুভয়কে নিয়মবিশেষের অধীন করা"। অপর শ্রেণীর সাধকেরা বলিলেন,—"গতি-বিচ্ছেদ কথাটা বলিতে, শ্বাস গ্রহণের পরে প্রশ্বাস না পড়িলে এবং প্রশ্বাস ত্যাগের পরে শ্বাস না গৃহীত হইলে প্রাণবায়ুর যে স্বাভাবিক স্থিতি হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে।" ফলে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর মতে কুম্ভক শব্দের অর্থ, "বলপূর্ব্বক বায়ুধারণ"। দ্বিতীয় শ্রেণীর মতে কুম্ভক শব্দের অর্থ "বিনা প্রযত্নে, বিনা চেষ্টায়, বিনা অবরোধে, স্বাভাবিক কৌশলে প্রাণবায়ুর স্থিরতা সম্পাদন।" কেহ কেহ বা উভয় মতেরই আবার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিলেন এবং স্থলবিশেষে প্রথমোক্ত মতকে এবং অপর স্থলে দ্বিতীয়োক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়া উভয় প্রণালীর সংমিশ্রণে বৈচিত্র্যময় প্রাণায়াম-পন্থা প্রচলিত করিলেন।

প্রাণায়ামের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা

কুম্ভকের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা

প্রাণায়াম কথাটা লইয়া এইরূপ বহুমত থাকার দরুণে প্রাণায়ামের ইষ্টানিষ্টতা সম্বন্ধে সাধারণের মনে বহু প্রকার ধারণাই আছে। কিন্তু

প্রাণায়ামের ইষ্টানিষ্টতা

প্রাণায়ামের শত সহস্র প্রণালীর মধ্যে একটী যখন আর একটীর মতন নহে, তখন প্রাণায়ামের উপকারিতা বা বিপজ্জনকতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোনও নির্দ্দিষ্ট মত পোষণ করিয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। প্রাণায়ামের এমন অনেক প্রণালী আছে, সামান্য অনিয়ম হইলে যাহার দ্বারা উন্মাদ, হাঁপানি, উরঃক্ষত, যক্ষ্মা প্রভৃতি কঠিন রোগ জন্মিতে পারে। এমন অনেক প্রণালীও আছে, যাহাতে সামান্য অনিয়মে ক্ষতি হয় না, কিন্তু বেশী অনিয়ম হইলে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আবার এমন প্রণালীও আছে, যাহাতে অনিয়ম যতই হউক না কেন, প্রাণায়ামহীন ব্যক্তি ঐ অনিয়ম করিলে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইত, প্রাণায়ামকারী ঠিক ততটুকুই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, প্রাণায়াম অভ্যাসের দরুণ নতুন কোনও ক্ষতি হইবে না। এমন প্রাণায়াম আছে, যাহা অভ্যাসের দরুণ ক্লেশকর প্রতিক্রিয়ারও আশঙ্কা প্রচুর, অথচ সুফল কম। এমন প্রাণায়াম আছে, যাহা অভ্যাসে দারুণ ক্লেশ থাকিলেও প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা কম এবং সুফলও কম। এমন প্রাণায়াম আছে, যাহাতে দারুণ ক্লেশ থাকিলেও এবং প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা প্রবল হইলেও সুফল অবর্ণনীয়। এমন প্রাণায়ামও আছে, যাহাতে ক্লেশ যথেষ্ট, প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা তিলমাত্র নাই, কিন্তু সুফল নগণ্য। এমন প্রাণায়াম-প্রণালী আছে, যাহাতে প্রতিক্রিয়া কম, সুফল কম এবং ক্লেশ কম। এমন প্রাণায়াম-প্রণালীও আছে, যাহাতে প্রতিক্রিয়ার ভয় নাই, ক্লেশ নাই অথচ সুফল অবর্ণনীয়। মোটকথা, প্রাণায়াম মাত্রেই হিতকারী বা অহিতকারী নহে, বিভিন্ন প্রণালীর প্রাণায়ামের কৌশল এবং ফল বিভিন্ন।

সাধনের উদ্দেশ্য এবং সাধক-জীবনের অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রাণায়াম-

প্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। যে ব্যক্তি দেহকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে চাহে, আর যে ব্যক্তি আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করিতে চাহে, তাহাদের উভয়ের প্রাণায়াম-প্রণালী এক হইতে পারে না। প্রথম সাধকের এবং অগ্রসর সাধকের প্রাণায়াম-প্রণালীও সকল সময়ে একরূপ নহে। অনুভূতির রাজ্যে যে যত সূক্ষ্ম সম্পদ কুড়াইতে পারিতেছে, তাহার প্রাণায়াম-প্রণালী তত সূক্ষ্ম হইবে। সন্তান-জননকালে দেহের আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বলসিদ্ধ কুম্ভকযুক্ত প্রাণায়াম এতদবস্থায় অতি দুঃসাধ্য এবং কোনও কোনও স্থলে বিপজ্জনক। আবার, আন্দোলনশীল দেহে প্রাণবায়ুর দ্রুততা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া এস্থলে তাহার উপর আংশিক বল এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগও আবশ্যক।

উদ্দেশ্য অনুসারে প্রাণায়াম-প্রণালীর বিভিন্নতা অনিবার্য্য

অধিকন্তু, কামচর্চ্চার কালে একমাত্র প্রাণায়ামই মনকে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন রাখিতে সম্যক্ সমর্থ নহে। এইজন্যই গার্হস্থ্য-যোগানুশীলনকারী আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চেষ্টাকৃত-কুম্ভক-বর্জ্জিত ধীরমন্থর-শ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত বিশিষ্ট প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টনামের সাধনা করিতেন এবং দৈহিক সঞ্চালনকে উপভোগাগ্রহের অনুগত না রাখিয়া প্রাণায়ামের অনুকূল এবং মন্ত্রাক্ষরের সম্যক্ অনুগত রাখিতেন।

জননকালে বিশিষ্টায়াম নামক প্রাণায়াম

জনন-কালে কোন্ মন্ত্র তাঁহাদের স্মরণীয় হইত বা কোন্ মন্ত্রাক্ষরের সহিত কিরূপ সঙ্গতি রাখিয়া দেহান্দোলন পরিচালিত হইত? এই বিষয়ে বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ে বিভিন্নতর রীতি অনুসৃত হইত। তাঁহাদের এই গুপ্ত জীবনের সংগুপ্ততর তথ্য হয়ত বাহিরে প্রকাশিত

জনন-কালে কোন্ মন্ত্র স্মরণীয়

হয় নাই। সম্প্রতি দুই চারিজন দুঃসাহসিক অনুসন্ধানকারী বাউল-শ্রেণীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া এতজ্জাতীয় কতক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, পল্লী-সমাজে শিষ্য-সংগ্রহকারী এক শ্রেণীর গুপ্ত ধর্ম্মাচার্য্যদের কথোপকথন হইতেও কতক আভাস উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কোনও কোনও সম্প্রদায় রমণকালেও দীক্ষাপ্রাপ্ত ইষ্টনামকেই স্মরণ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় পন্থা বলিয়া গণনা করিয়াছেন। কোনও কোনও আড়ম্বর-বহুল তান্ত্রিক সমাজে নানা দুর্ব্বোধ্য বা অজ্ঞাতার্থ মন্ত্র উচ্চারণের উৎসাহও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য যে পরমেশ্বর-স্মরণ, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যাহারা "মহাযোন্যৈ নমোঽস্তুতে" বলিয়া কারণ-বারি সেবন করিয়া রমণ-কার্য্যে রত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও মানসিক প্রক্রিয়ার ভিতরে একটা তীব্র চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় যেন নারী-যোনিকে নারী-যোনি বলিয়াই মনে না হয়, ইহাকে যেন জগদ্‌যোনি জগন্মাতার সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবা যায়, যাহাতে নরপুঙ্গবকে জগৎস্রষ্টার অভেদ প্রতীক রূপে প্রতীতি ও প্রত্যয় আসে। সুতরাং মূল লক্ষ্য যখন ঈশ্বরপ্রাণতা, তখন ইষ্টমন্ত্রই যে কুলীনতর হইবেন, ইহা ভাবা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নহে।

নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বে মনঃসন্নিবেশন একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার। প্রাণায়াম তাহার তুলনায় স্থূলতর। যোনিমুদ্রা প্রথমাভ্যাস-কালে ততোধিক স্থূল। তবে পরস্পর পরস্পরের সহযোগে ক্রমশঃ স্থূলতাবর্জ্জিত হইয়া সূক্ষ্মত্ব লাভ করে, গুহ্যদ্বারকে দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ-পূর্ব্বক মনঃসন্নিবেশ করিলে সাধন-সঞ্জাত সূক্ষ্ম শ্রুতি-শক্তির বলে যে গভীর ওঙ্কার-ধ্বনি গুহ্যমূল হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত মেরুবংশের মধ্য দিয়া অবিরাম স্রোতে শ্রুত হয়, তাহা শ্রবণের চেষ্টার নামই যোনিমুদ্রা। যোনিমুদ্রার দ্বারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই

যোনিমুদ্রা

নিরতিশয় উদ্দাম লৈঙ্গিক উত্তেজনা আশ্চর্য্যরূপে সামান্য সময়ের মধ্যে প্রশমিত হইয়া যায়। *পুং-জননাঙ্গে তুষার-গলান শীতল জল ঢালিয়াও যে ফল পাওয়া যায় না, সামান্য সময় যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত অভ্রান্ত অকাট্য সিদ্ধান্ত।

এই জন্যই গৃহস্থ যোগীরা নির্দ্দিষ্ট কয়েকবার দৈহিক সঞ্চালনের পরে অথবা অত্যধিক অনুভূতি-শীতলতার মুহূর্ত্তে দেহচেষ্টা নিবৃত্ত করিয়া যোনিমুদ্রাযোগে অধঃপতিত চেতনাশক্তিকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া ভ্রূমধ্যে সংস্থাপিত করিতেন। এইভাবে স্বকীয় সামর্থ্যের অনুযায়ী যতবার সম্ভব ক্ষয়াবরোধ করিতে যত্নবান্ থাকিয়া দেহচেষ্টার যাবতীয় ফলাফল সম্যক্ শ্রীভগবানের হস্তে সমর্পণ করিতেন। † পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসমূহে তাঁহারা ভোগবুদ্ধি বর্জ্জন করিতেন এবং নিজেদিগকে পরম-দেবতার প্রতিনিধি জানিয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভোগের চর্চ্চাকে ত্যাগের গরিমায় মহান্ ও নিষ্কামতার সুষমায় সুন্দর করিতে চেষ্টিত থাকিতেন। ‡

* যোনিমুদ্রার ফলে কেন উত্তেজনা প্রশমিত হয়, তাহার বিস্তারিত কারণ "সংযম-সাধনা" গ্রন্থে চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

† রমণীর সান্নিধ্যে পুরুষের ও পুরুষ-সান্নিধ্যে রমণীর মন হইতে যাবতীয় উত্তেজনা ও বিকার প্রশমিত করিবার জন্যই যোনিমুদ্রার আবিষ্কার। এই হিসাবেই যোনিমুদ্রা কুমার-কুমারী, সংযমী গৃহী ও গৃহিণীর ভিতরে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু রমণ-কালীন যোনিমুদ্রার ব্যবহার যে কিরূপ ফলপ্রদ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকারের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত প্রদান অসম্ভব ব্যাপার। সন্তান-জনন সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়টুকু লইয়া বিভিন্ন গৃহস্থ যোগী ব্যক্তির বিভিন্ন মত জানা গিয়াছে। সুতরাং এই অনুচ্ছেদটুকু মাত্র পাঠকের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে ইন্ধন দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। অপচয়িত-সামর্থ্য ব্যক্তির পরিপূর্ণ সামর্থ্য বিধানে সন্দীপনী-মুদ্রার উপযোগিতা বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সন্দীপনী মুদ্রার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। "সংযম-সাধনা" দ্রষ্টব্য।

যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একথা স্বীকার করিতেন যে, সন্তানজনন ব্যাপারটা কতকটা পুরুষকারের আয়ত্ত। বর্ত্তমান দম্পতিগণকে আমরা এই কথাটুকু মনে করাইয়া দিতে চাহি যে, পুত্রকন্যার জনন সম্বন্ধে তাহাদিগকে আজ সচেতন হইতে হইবে এবং সন্তানের জন্মকে দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া মনে না করিয়া পুরুষকারের আয়ত্ত ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে-সকল স্বামিপত্নী সন্তানের জন্মের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে নবাগতের আবির্ভাব ব্যাপারটী দৈবাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু যাহারা সবই জানে, সবই বুঝে, তাহাদের সন্তান-জননকে দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিব কেন? দুর্ভাগ্যবশতঃ আজিকার যুগে বিবাহের বহু পূর্ব্বেই বালক ও বালিকারা অপরিণামদর্শীর অপবিত্র মুখ হইতে বিবাহিত জীবনের গূঢ়তম বিষয়গুলির সবিস্তার অপব্যাখ্যা শুনিয়া

সন্তান-জনন ব্যাপারটাকে পুরুষকারের আয়ত্ত বলিয়াই গণনা করিতে হইবে

‡ বাংলা ১৩৩৭ সাল হইতে বিগত পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া তপস্যার মনোবৃত্তিসম্পন্ন গৃহী পাঠকেরা এই গ্রন্থের সাতটী সংস্করণ পাঠ করিয়াছেন। এই সকল পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই গ্রন্থে লিখিত ইঙ্গিতসমূহের উপরে প্রত্যক্ষ অনুশীলনের পরীক্ষাও চালাইয়াছিলেন। এই সকল পরীক্ষণ-প্রিয় ধীর-চেতা গৃহস্থ সাধকগণের নিকট হইতে যেই সকল পত্র ও বিশ্লেষণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এতই বিচিত্র যে, কোনও ক্ষুদ্র-পরিসর গ্রন্থেও তাহার সম্পাদন, পরিবেশন বা বর্ণনা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ এই জাতীয় অনুশীলনের ফল কাহার উপরে কিরূপ বর্ত্তাইয়াছে, তাহা শ্লীলতা রক্ষা করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ সম্ভব নহে বলিয়াই প্রকাশ করা সঙ্গতও নহে। কিন্তু সকলেরই পরীক্ষার মধ্যে এই একটী সত্য ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অবগত হইয়াছি যে, স্বামী যখন নিজ প্রয়োজনকে উপেক্ষা বা অপ্রধান করিয়া পত্নীর প্রয়োজনকে লক্ষ্য বা প্রধান করিয়া লইয়াছেন এবং নিজের বা পত্নীর জননাঙ্গে মনকে একেবারেই না দাঁড়াইতে দিয়া অল্প হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ বা অত্যধিক ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই সময়েই তাঁহার রতি-সামর্থ্য এবং বীর্য্যবত্তার অকল্পনীয় ও অসাধারণ পরিচয় হইয়াছে।

জন্ম-রহস্যের যবনিকা দূরে সরাইয়া দিতে পারিতেছে। যাহা প্রাকৃতিক প্রহেলিকা, তাহা আর তাহাদের নিকট প্রহেলিকা নহে এবং গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, তরলভাবে কথিত, শ্রুত এবং আলোচিত হওয়ার ফলে জগতের গভীরতম একটা তত্ত্ব সকল গুরুত্বে বঞ্চিত ও গাম্ভীর্য্যে রিক্ত হইয়া রশ্মিমুক্ত অবাধ উদ্দাম গতিতে কামের পথে চলিবার জন্য মানুষের বাতগ্রস্ত চরণদ্বয়কেও নিয়ত প্রোৎসাহিত করিতেছে। ইহাই যখন অবস্থা, তখন সন্তানের আবির্ভাবের কারণকে অতি-বার্দ্ধক্য-কাতর জরাজীর্ণ বিধাতাপুরুষের উপেক্ষাশীর্ণ দুর্ব্বল স্কন্ধের উপর ন্যস্ত না করিয়া বিবাহিতকে নিজের স্কন্ধেই লইতে হইবে। জীবনের সকল অংশ হইতেই যদি ভগবানকে মনে প্রাণে নির্ব্বাসিত করিয়া থাক, তবে আজ সন্তানের জন্মের দায়কে চির-উপেক্ষিত চির-অনাদৃত ভগবানের ঘাড়ের উপরে তুলিতে যাইও না। আজ তোমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, সন্তানের আবির্ভাবের মূলে তোমাদের পুরুষকারই দায়ী এবং পুরুষকার-প্রয়োগের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার উপরে সন্তানের জন্মের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নির্ভর করে।

সম্ভোগ তোমরাই কর, সন্তান-জন্মের দায়িত্ব বিধাতার ঘাড়ে চাপাও কেন ?

ইহা বুঝিয়া দীর্ঘ প্রযত্নে অপরিসীম উৎসাহ সহকারে বিবাহিত নারী ও পুরুষকে এমন বিশুদ্ধ চিন্তার, বিশুদ্ধ বাক্যের এবং বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে, যেন সন্তানজনন-মুহূর্ত্তে তাহাদের দেহ প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলেও হৃদয়টী অনাসক্ত প্রেমে, মনটী সন্তানের দিব্য স্বরূপে এবং আত্মা আত্মস্থতার অবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠায় লগ্ন রহিতে পারে। সন্তান-জনন সম্পর্কিত দৈহিক ব্যাপার-গুলিতে রত হইয়া মনকে ভোগ-বুদ্ধির অতীতে রাখা

জননকালে দেহ প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলেও মনকে দিব্য চেতনায় ডুবাইতে হইবে

বা কামসুখলুব্ধতা হইতে মুক্ত রাখা সহজ কথা নহে, ইহা সত্য। কিন্তু স্বামীর পক্ষে এই প্রয়াসের মধ্যে নিষ্কামতায় প্রথম সঞ্চারণা ঘটাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, আত্মসুখপ্রাপ্তির দিক হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া সঙ্গিনীকে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রদানের জন্য কায়মনে চেষ্টান্বিত হওয়া। এই ব্যাপারে দৈহিকভাবে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর চেষ্টার উপরে নির্ভরশীলা বলিয়া তাহার পক্ষে নিষ্কাম হওয়া শুধু মানসিক অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে। প্রথম সঙ্গমেই সন্তান জন্মিল, এরূপ ঘটনা কর্দ্দম-ঋষি-তুল্য পতি এবং দেবহূতি-তুল্যা পত্নী ব্যতীত অন্য স্থলে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রাথমিক সঙ্গমগুলিতে এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে পরে নিষ্কাম সঙ্গমকে একটা অভ্যাসগত সাধারণ ব্যাপারে পরিণত করা খুব অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় সম্পূর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠভাবে সন্তান-জনন। দুই একদিন সংযমের সাধনা করিয়া কাহারও সেইরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ হইতে পারে না অথবা কাছাঢিলা চেষ্টায় সাফল্য সঞ্চয়ের আশা করা যাইতে পারে না। চেষ্টাটী কঠোর হওয়া চাই এবং চেষ্টা-পথে প্রাক্তন-কর্ম্ম-সংস্কারহেতু দুই একবার পদস্খলন হইলেও হতাশ বা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী না হইয়া গভীরতর উৎসাহে পুনরায় অগ্রসর হওয়া চাই। দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের পরিমাণ বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, যাহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে একবার প্রবেশ করিয়াছে, কাপুরুষের ন্যায় পলায়নপর না হইয়া সকল সীমাবদ্ধতা ও জটিলতার মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে নিজ নিজ জীবনের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে বিকশিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতে হইবে এবং সন্তানসন্ততির জন্মকে নিজ নিজ সাধনার দ্বারা কল্যাণবহ করিয়া তুলিতে হইবে। হইতে পারে,

গৃহীর গার্হস্থ্যকে কাপুরুষের ন্যায় ত্যাগ অনুচিত

উন্নতিলিপ্সু স্বামীর পক্ষে উপযুক্তা স্ত্রী এবং উন্নতিপ্রার্থিনী স্ত্রীর পক্ষে উপযুক্ত স্বামী লাভ হয় নাই, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র নিরাশ না হইয়া তপঃসাধনার বলে সকল বাধাবিঘ্নকে পদদলিত ও চূর্ণীকৃত করিতে হইবে। যোগ্যের সহিত যোগ্যার মিলন বা যোগ্যার সহিত যোগ্যের সমাগম চিরকালই একটা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার। সর্ব্বদাই মণির সহিত কাঞ্চন-সংযোগ ঘটে না। কোষ্ঠি-বিচার করিয়া রাজ-যোটক দেখিয়া যাহাদের মিলন ঘটান হইল, তাহাদের পূর্ণ মিলনে কোথায় যে রহিয়া গেল ফাঁক, তাহা বাহিরের লোকের বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না। অমিলনের অন্তরঙ্গ জ্বালা যখন ইহাদিগকে দগ্ধিয়া মারিতেছে, বাহিরের লোকেরা তখন হয়ত দেখিয়া বাহবা দিতেছে,—"আহা, ইহারা কত সুখী!" প্রাগ্‌বৈবাহিক ঘনিষ্ঠতা দ্বারা একে অন্যকে পুরাদমে চিনিয়া বিবাহিত হইবার পরেও দেখা গিয়াছে এবং যাইতেছে যে, একজন অপর জনের যোগ্য নহে, অনুপূরক নহে, পরিপূরক নহে, বলবিধায়ক নহে, বিকাশের সহায়ক নহে। তৎক্ষেত্রে বর্ত্তমান মিলনকে নাকচ করিয়া দিয়া নূতনতর মিলনকে আইনসিদ্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা সম্প্রতি হইয়াছে বটে কিন্তু তখনও সেই একই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, পুরাতন পাদুকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন পাদুকা যে গ্রহণ করিল, তাহার হয়ত পায়ের পুরাতন জায়গার ব্যথাটা প্রশমিত হইয়া গেল কিন্তু অন্য এক নূতন স্থানে যে পায়ের মধ্যে সে খোঁচা খাইতেছে না এবং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া নূতন ব্যথাটা সে বেমালুম গোপন করিয়াই যাইতেছে না, তাহা তুমি জানো কি? পত্যন্তর গৃহীত হইতে পারে, পত্নী-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে কিন্তু যোগ্য-যোগ্যার মিলন যে তাহাতেও হইবেই, ইহার স্থিরতা কি? তাই বিবাহিত

যোগ্যাযোগ্যায় মিলন চিরকালই সুদুর্ল্লভ

হইবার পরে একে যাহাতে অপরের যোগ্য হইতে পারে, তাহার জন্য একটা অকপট সাধনা চালাইতে হইবে। যৌন-সুখকে গৌণ করিয়া অন্যতর বৃহত্তর মহত্তর লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে তথাকথিত অযোগ্য ও অযোগ্যার মিলন হইতেও অকল্পনীয় শুভফলের আবির্ভাব ঘটিতে পারে এবং সর্ব্বতোমুখ প্রয়াসে তাহাই করিতে হইবে। যে মানুষ বিবাহিত জীবনটাকে একটা ইতর সুখের ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, ভগবৎ-সাধনার শক্তিতে আজ তাহাকে কামগন্ধহীন ভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত চেষ্টায় শুদ্ধ মানুষের জন্মদান করিতে হইবে। এ যোগ্যতা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে অসংখ্য জনের ছিল, এ যোগ্যতা লাভ করা আজিকার গৃহীর পক্ষেও একান্ত অসাধ্য নহে। ভগবন্নিষ্ঠা সকল অসাধ্য সাধন করে, ভগবন্নিষ্ঠাই সন্তান-জননকে কামের ক্লেদ-দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত করিবে। বিবাহিত ভারত আজ জাগ্রত হউক, সকল আত্ম-অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধতায় জলাঞ্জলি দিয়া সাধন-সমরে বীরবিক্রমে অবতীর্ণ হউক, নিজেদের দেবভাবকে জীবসুলভ পশুপ্রবৃত্তির উপরে কর্তৃত্ববান্ হইতে সামর্থ্য দান করুক। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের নরনারী অপেক্ষা ভারতবাসীর এই বিষয়ে সাংস্কৃতিক আনুকূল্য অধিক রহিয়াছে।

পারস্পরিক অযোগ্যতাকে তপস্যার বলে দূর করিতে হইবে

নারী পুরুষের দ্বারা আকৃষ্ট হইবে, পুরুষ নারীকে প্রবল বেগে টানিয়া আনিয়া বুকে ধরিবে, ইহা ঈশ্বরদত্ত এক অত্যাশ্চর্য্য রহস্যময় ব্যাপার। পশুপক্ষীর মধ্যেও এই আকর্ষণ রহিয়াছে, কিন্তু ইহা একটী

নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য

পুরুষ-পশুকে একটী স্ত্রী-পশুর সহিত যাবজ্জীবনের সম্বন্ধে আবদ্ধ করে না। পক্ষীদের মধ্যে কোন কোন স্থলে একবারের সংসর্গজ সম্বন্ধ বহুকালের সংসর্গজ সম্পর্কে রূপান্তরিত হইলেও মানুষ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মানুষ যাহাকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণ করিল, তাহাকে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পাইতে চাহে। তাহাদের অন্তরের আকুতি এবং প্রাণের ব্যগ্রতা তাহাদিগকে উভয়ের দেহ-ধ্বংস ঘটিয়া যাইবার পরেও যাহাতে এক থাকিতে পারে, সেই প্রার্থনায় আকুল করিয়া তোলে। ইহারই ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছে এক অতীন্দ্রিয় প্রেমের ইঙ্গিত, যাহা পশুপক্ষী কখনও ধরিতে পারিল না। কে কাহাকে আকর্ষণ করিতেছে? শরীর কি শরীরকে ডাকিতেছে? রক্তমাংসই কি রক্তমাংসকে টানিতেছে? তাহাই যদি হইত, তবে বারংবার রক্তমাংসের পিপাসা মিটাইবার পরেও কেন তৃষ্ণা জাগিয়া ওঠে? কে রহিয়াছে উভয়ের ভিতরে, যে নিয়ত এককে অপরের পুনঃপুনঃ সন্নিহিত করিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র? কেন এই ব্যগ্রতা? পশুপক্ষী একবারও নিজেকে এই প্রশ্ন করে নাই। ভারতের বাহিরে নরনারী খুব সম্ভবতঃ নিজেদিগকে এই দৃষ্টিকোণ হইতে দর্শন করিবার পদ্ধতিবদ্ধ কোনও চেষ্টা করে নাই। অথচ এই প্রশ্নটী করিবার যোগ্যতার ভিতরেই সর্ব্বপ্রাণীর উপরে মানুষের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করিতেছে। মানুষের এই যে শ্রেষ্ঠতা, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সকল নরনারী চলিবে, তাহারাই বিশ্বের ভাবী সভ্যতার জন্মদান করিবে। ভারতের পৃষ্ঠদেশে সদ্‌গুরুর এই পাঞ্জা পড়িয়াছে, জাগ্রত ভারত তাহা ভুলিও না।

আদর্শ দম্পতীর কি কি আবশ্যক

জীবন-সাধনার সিদ্ধিপথে আদর্শ দম্পতীর অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা একান্ত আবশ্যকীয়। যথা,—

(ক) পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ ও সহানুভূতি।
(খ) উভয়ের বয়সের নৈকট্য।
(গ) তুল্যবংশীয়তা।
(ঘ) রুচিসাম্য।
(ঙ) এক-প্রকৃতিকতা।
(চ) উভয়ের একলক্ষ্যতা।
(ছ) উভয়ের এক সাধন-ধর্ম্ম।
(জ) একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা।
(ঝ) একের স্বাধীনতার প্রতি অপরের সম্মানবোধ।
(ঞ) আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য।

এই সকল অনুকূল অবস্থার সবগুলি না জুটিলেও কতকগুলি জুটিলেই বিবাহিত নরনারীর জীবনে যথার্থ সুখ লভ্য হইতে পারে এবং তাহাদের জীবন দ্বারা দেশ, সমাজ ও জগৎ উপকৃত হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) স্বামিপত্নীর গভীর অনুরাগের অভাব হইলে তাহাদের সন্তানের মনের ও মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে বহু স্বতোবিরোধিতা সৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ দম্পতীর গৃহি-জীবনও সুখের হয় না। এইজন্যই যাহাতে উভয়ের শত দোষত্রুটি থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে সুগভীর প্রীতির ও

একের জন্য অপরের সহানুভূতির অল্পতা না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য উভয়কেই প্রযত্নশীল থাকিতে হইবে। স্বামী যে পত্নীর এবং পত্নী যে স্বামীর একান্ত আপন, এই কথাটী দেহের বুদ্ধিতে না বুঝিয়া আত্মার দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে এবং একের জন্য অপরকে স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহাই যথার্থ অনুরাগ সৃষ্টির মূল। একের সর্ব্বস্ব দিয়া অপরের সর্ব্বস্ব পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই যখন দেহের ভাষায় রূপ পায়, তখন তাহা হয় দৈহিক রমণ বা স্বামিস্ত্রীর সহবাস। কিন্তু ইহাই যখন আত্মার ভাষায় রূপ পায়, তখন ইহা হয় স্বামিস্ত্রীর পরিপূর্ণ ঐক্যস্থাপন। স্ত্রী বা স্বামী যখন স্বামী বা স্ত্রীকে সসীম এই দেহের সংজ্ঞা দিয়া আপন ভাবিতে চেষ্টা করে, তখন আদান-প্রদানের জমাখরচের হিসাবটা এত প্রখর হইয়া উঠে যে, আপাতদৃষ্ট ঐক্য, প্রেম, সেবা, স্নেহ, অনুরাগ ও আকুলতা হঠাৎ একদিন ঠুন্‌কো কাঁচের চুড়ীর মত পট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং কে কাহার জীবনে কতটুকু সুখের মধু ঢালিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া কে কাহাকে বিবাহ করিয়া কাহার কতটুকু সুখ-সম্ভাবনা হ্রাস করিয়াছে, তাহাই প্রতিদিন মনের-পর্দ্দায় জাগিয়া উঠে। তখনই একের প্রতি অপরের সহানুভূতি কমিয়া যায়। কিন্তু আত্মার দৃষ্টিতে স্বামী বা স্ত্রী যখন স্ত্রী বা স্বামীকে ভাবিবার, বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা করে, তখন সেই অনুশীলন হইতে অমৃত-পয়োধিতে অবগাহন করিবার পথ খুলিয়া যায়। উহাই সার্থক বিবাহিত-জীবন,—যেই জীবনে সুখ আছে, প্রতিক্রিয়া নাই ; দুঃখ আছে, হাহাকার নাই ; বিঘ্ন আছে, সহিষ্ণুতা

পরস্পরের অনুরাগ ও সহানুভূতি

দেহের বুদ্ধিতে নহে ; আত্মার দৃষ্টিতে অনুরাগ চাই

নাই ; দায়িত্ব আছে, দুর্ব্বলতা নাই ; সঙ্কট আছে, গতিচ্ছেদ নাই ; সঙ্গীত আছে, উচ্ছ্বাস নাই ; চাপল্য আছে, যতিভঙ্গ নাই। ইহাই শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ নিজ সুখের জন্য শ্রীরাধার অনুরাগী নহেন, তাঁহার সমস্ত প্রেম কেবল শ্রীরাধারই সুখের জন্য,—শ্রীরাধা নিজ সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিণী নহেন, তাঁহার প্রেমবারিধি উথলিয়া ওঠে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সুখের জন্য। মন্দিরে মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের পূজা হইল, শিব-পার্ব্বতীর পূজা হইল কিন্তু ঘরে ঘরে প্রতি স্বামী এবং প্রতি স্ত্রীর মধ্যে যে রাধা-কৃষ্ণ এবং শিব-পার্ব্বতী অনন্তকাল ধরিয়া আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন,—তাহার দিকে কেহ দৃষ্টি দিল না। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সহানুভূতির অভাবের ইহাই মূল কারণ। সহানুভূতির অভাবই সংসারের সকল কলহ ও অশান্তিকে জন্মদান করে এবং একের আত্মার প্রতি অপরের মমত্ববোধের অভাবই সহানুভূতিহীনতা সৃষ্টি করে। স্বামী বা পত্নী যদি পত্নী বা স্বামীর দেহটাকেই নিজের আপন-জন মনে করে এবং দেহের কাছ হইতেই নিজের সকল প্রাপ্য আদায় করিতে চাহে, তাহা হইলেই যথার্থ মমত্ব-বোধের উন্মেষের ব্যাঘাত জন্মে এবং এই অসত্যের মূলেই অনুরাগহীনতা অঙ্কুরিত হয়। যে-পত্নী স্বামীর দেহ পতনের পরেও তাহার আত্মার অমোঘ স্পর্শকে অনুভব করেন, যে-স্বামী পত্নীর পরলোক-গমনের পরেও তাঁহাকে নিয়ত হৃদয়-মধ্যে ধারণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিব। অপরের ভালবাসা, পাশব প্রকৃতির মোহাকর্ষণ মাত্র। যে ভালবাসার শক্তিতে পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি দেহে, মনে ও আত্মায় একনিষ্ঠ থাকেন, যে ভালবাসার প্রেরণায় একের মঙ্গলের জন্য অপরে জীবন দিয়াও "কিছুই করিলাম না" বলিয়া

যথার্থ ভালবাসা

আক্ষেপ করেন, আমরা স্বামিপত্নীর মধ্যে সেই অপার্থিব দিব্য প্রেমের নিত্যবন্ধন দেখিতে চাই। যে ভালবাসাকে পুরুষ বা নারী সমগ্র জীবনে মনে মনেও একবার অস্বীকার করিতে পারে না এবং যে ভালবাসাকে লাভ করিয়া আর কিছু লাভ করিবার জন্য অন্তরাত্মা আকুল অধীর হয় না, আমরা সেই ভালবাসাকে ভারতীয় দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহি।

(খ) স্বামিপত্নীর বয়সের নৈকট্য তাহাদের বন্ধুভাবের বর্দ্ধনের জন্যই আবশ্যক। বয়সের অত্যন্ত পার্থক্য থাকিলে, সখ্যভাবের সঞ্চারে অত্যন্ত

উভয়ের বয়সের নৈকট্য

অধিক বিলম্ব হইয়া যায়, কখনও বা প্রকৃত সখ্যের সৃষ্টিই হয় না। বর্ষীয়ান্ স্বামীর পক্ষে তরুণী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ এই কারণেই সমাজ হইতে অপ্রচলিত হইয়া যাওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক স্বামীর পক্ষে অধিকবয়স্কা পত্নী গ্রহণ তেমন ভাবে চল নাই, ইউরোপে তাহা অবাধ ভাবেই চলিয়াছে। * ভারতবর্ষে কোন কোন অঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যেই মাত্র এইরূপ বিবাহ দৃষ্ট হয় কিন্তু উন্নত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহার প্রচলন কম। বয়োধিকা নারীকে মাতৃসমা জ্ঞান করা এই দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির একটি সাধারণ বিশেষত্ব। তবে, নব্য শিক্ষিত-দের মধ্যে যাহারা বিবাহকে যৌন আকর্ষণের উপরে ভিত্তিমান্

* পৌত্রের বয়সী বর পিতামহীর বয়সী কনেকে বিবাহ করিয়াছে, আমেরিকা হইতে এইরূপ সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত সেই দেশেও সমাদৃত বলিয়া মনে হয় না।

তরুণের বৃদ্ধা ভার্য্যা

করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নীর পাণিগ্রহণের দুই একটী বিরল দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তের বহুল অনুসরণে দেশের কল্যাণ হইবে না। এদিকে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ আমাদের দেশের একটা জাতীয় কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনা যায়, প্রথমা-পত্নী-জাত অপোগণ্ড শিশুদের অকালমৃত্যু নিবারণের ধর্ম্মবুদ্ধিতেই বর্ষীয়ান্ নরশার্দ্দূল দ্বিতীয়বার একটি দুগ্ধ-পোষ্যা বালিকা-পত্নী সংগ্রহ করেন। সন্তানের প্রতি

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা

নিরতিশয় দরদ বশতঃ ইহারা নিজেদের অপরাপর আত্মীয়দের উপরে পর্য্যন্ত শিশু-পালনের ভার দিতে পারেন না, অথচ বিবাহেচ্ছুকা নিঃসন্তানা বিধবা-অনাথার পাণিগ্রহণ করিয়া সৎসাহস বা ন্যায়-বিচারের পরিচয় দিতেও প্রস্তুত নহেন। দেশ, সমাজ ও কালের গতি বিচার করিতে গেলে, অনেক ক্ষেত্রেই বিধবার পুনর্বিবাহের প্রয়োজন আছে। বিগতদার পুরুষেরা বিধবা-বিবাহে অনিচ্ছুক না থাকিলে এই সকল বিধবা সহজে পতি পাইতে পারে এবং ইহার ফলে বিধবা-জীবন-ঘটিত কতকগুলি সামাজিক সমস্যার আশু এবং স্বাভাবিক মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে।

বিপত্নীকের বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা

বিপত্নীক ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ করিলে উভয়ের মিলনের পরবর্ত্তী প্রথম অধ্যায়ের উচ্ছ্বাস-পূর্ণ জীবনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, যাহা বিপত্নীকের কুমারী-বিবাহে সম্ভব নহে। মুখে প্রকাশ করুক আর না করুক, কুমারী মেয়েরা বিপত্নীকের সহিত বিবাহিত হইলে নৈতিক দৃষ্টিতে স্বামীকে কতকটা হেয় বলিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যেন দেখিয়া থাকে। ইহা পূর্ণ মনোমিলনের পক্ষে বাধা-

স্বরূপ হয়। সন্তানহীনা বিধবা বিপত্নীকের সহিত বিবাহ দ্বারা মিলিত হইলে সপত্নীর সন্তানদিগকে যত সহজে আপন বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, কুমারী কনে তাহা পারে না। কুমারী মেয়ে বিবাহের পরে সংসারের সব-কিছুই নূতন দেখিতে চাহে, আগেকার একটা বিবাহের জীর্ণ ভগ্নাবশেষগুলি তাহার ভিতরে মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ সৃষ্টি করে। এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে, বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ যদি অবশ্যই হয়, তবে বিধবার পাণিগ্রহণই সঙ্গত কার্য্য। কিন্তু পুরুষেরা অনাঘ্রাতা পুষ্পের জন্যই ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া থাকে, একবার চিন্তা করিয়া দেখে না যে, নববিবাহিতা কুমারী-পত্নী যদি আসিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"হে স্বামি, তুমি ত' ইতঃপূর্ব্বেই অপর নারীর দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইয়া আছ, তুমি আমার দ্বারা গ্রহণযোগ্য কি করিয়া হইতে পার",—তখন এই কথার কি জবাবটী দেওয়া সম্ভব হইবে। নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব এই শ্রেণীর পুরুষদিগের পাণিগ্রহণেচ্ছাকে নিরঙ্কুশ করিয়া রাখিয়াছে। বিপত্নীক পুরুষের কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণে নির্ল্লজ্জ নিঃশঙ্ক অবস্থার জন্য দায়ী সমাজ এবং সমাজপতিগণ। সতীত্ব সম্পর্কে পুরুষ ও নারীর নৈতিক বিচারের মাপকাটি সমাজের দৃষ্টিতে এক নহে। পুরুষ বহুনারী বিবাহ করিলে তাহার "সতীত্ব" (?) যায় না, কিন্তু নারীর বহু পতি থাকিলে দ্রৌপদীর দোহাই দিয়াও তাহার নিস্তার নাই। বিধবার পুনর্বিবাহে দোষদর্শন করা হইয়া থাকে কিন্তু বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ দোষের বলিয়া গণিত হয় না। নৈতিক বিচারের মানদণ্ড আলাদা বলিয়াই পুরুষ এই ব্যাপারে নিঃশঙ্ক হইতে সাহস পাইয়াছে। নতুবা বিপত্নীকের পক্ষে বিধবা-বিবাহই সঙ্গত ব্যবস্থা। এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা অল্প বলিয়া এই ব্যাপারে

বিপত্নীকের কুমারী বিবাহে সঙ্কোচহীনতার কারণ

পুরুষের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার সম্মুখে নারী অসহায়া। অপর দিকে স্ত্রী-স্বাধীনতা সত্ত্বেও "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" নানা কারণেই য়ুরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। ফলে, বিবাহিত ও বিবাহিতার বয়ঃপার্থক্য দম্পতীর মনোমিলনের একটা বিরাট প্রাকৃতিক বিঘ্নরূপে বিরাজ করিতেছে। তবে, সখ্য-ভাব-সঞ্চারে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ অপেক্ষা তরুণের বৃদ্ধা ভার্য্যা গ্রহণ অধিকতর নিরর্থক এবং বিড়ম্বনাপূর্ণ। স্বামি-পত্নীর মধ্যে শুধু যে সখ্যভাবই প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ অনেকটা গুরু ও শিষ্যার ন্যায়। সাধারণতঃ পুরুষ-প্রকৃতি নারীকে দিয়া নিজের মাধুর্য্যের দিকটা পূর্ণ করিয়া লইতে চাহে। স্বভাবসৃষ্ট এই অন্তঃপ্রেরণাকে তাহার স্বধর্ম্মের অনুসরণে কৃতার্থ হইতে দিবার জন্য স্বামি-পত্নীর মধ্যে বয়সের নৈকট্য থাকিয়াও পত্নীর বয়স স্বামীর বয়স অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক। য়ুরোপে জনসাধারণের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে স্বামী এবং স্ত্রীর বয়সে নৈকট্য অত্যধিক, সেখানে কন্যা-সন্তান অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে এবং যেখানে স্বামীর বয়স স্ত্রী অপেক্ষা অনেকটা বেশী, সেখানে পুত্র-সন্তানই সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হয়। এই সম্পর্কে সংগৃহীত তালিকা (Statistics)-দৃষ্টে এই ধারণার সত্যাসত্য নির্ণয় এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। স্বামীর বয়ঃ-আধিক্য পুত্র-সন্তান উৎপাদনের পক্ষে একমাত্র কারণ না হইয়া সম্ভবতঃ অন্যতম কারণ হইবে। য়ুরোপের সর্ব্বজন-প্রচলিত একটী ধারণার সহিত ভারতীয় ব্যবস্থার মিল থাকার দরুণ একথা মনে করাই সঙ্গত যে, স্বামীর বয়স স্ত্রীর বয়স অপেক্ষা কতক বেশী হওয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণের দিক দিয়াই আবশ্যক।

বয়সের কতটুকু পার্থক্য দরকার

আমরা নারীর ষোল হইতে আঠার বৎসর বয়সে, পুরুষের চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী এবং বিবাহের পূর্ব্বে উভয়েই যাহাতে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ও সাধন-সামর্থ্য লাভ করিয়া বিবাহিত জীবনকে শুভময়, কর্ম্মঠ ও আনন্দোজ্জ্বল করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থার অনুরাগী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও জটিলতা উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন কেবল স্বামীর উপার্জ্জনেই সংসার চলে না, স্ত্রীর পক্ষেও কিছু অর্থার্জ্জন প্রয়োজন হয়। এখন কেবল স্কুলের পড়াতেই পুত্র-কন্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, গৃহশিক্ষক রাখিতে অক্ষম সংসারের মাতাকেও পুত্রকন্যার পুঁথি নিয়া বসিতে হয়। শুধু স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর চেহারা দেখিয়াই বরপক্ষ কনে পছন্দ করে না, কন্যা কতগুলি কার্য্যকরী বা অকার্য্যকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার ফিরিস্তিও দাখিল করিতে হয়। ফলে, পড়িতে পড়িতেই মেয়েগুলির বয়স অনায়াসে বিশ-বাইশ পার হইয়া যায়। সুতরাং আঠারো-বিশে বিবাহ আমাদের পছন্দসই হইলে কি হইবে, তাহা পার করিবার অনেক দিন পরেই পরিণয়-কার্য্যটি সম্ভব হয়। এই অবস্থাতে বয়সের কোনও নির্দ্দিষ্ট "ফরমূলা" অনুসরণ করা সম্ভব নহে। তবু, বিবাহ-কালে বর ও কন্যার বয়সের কয়েক বৎসর পার্থক্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বেশী বয়সে বিবাহ

বেশী বয়সে বিবাহ হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের "রোমান্স" বা চিত্তচমৎকারিণী হৃদয়-দ্রাবিণী অনির্ব্বচনীয়-আকর্ষণ-বিধায়িনী অবস্থাটা নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহ একটা বাস্তব সত্য হইলেও এই জীবনটার মধ্যে একটা স্বপ্নালু আবেশের অবসর আছে। বয়সের কিঞ্চিৎ পার্থক্য না থাকিলে এই স্বপ্নাবেশের স্থিতিকাল অল্পতর হয়, বিবাহিত জীবন তাহার

"রোমান্স" বা চিত্তচমৎকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। যেখানে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর এবং কন্যা অন্য নারী বা পুরুষে মন সমর্পণ করে নাই, সেই স্থলে বিবাহ যেই বয়সেই হউক না কেন, বিবাহ "রোমান্‌স্"-বর্জ্জিত হয় না। এই কারণেই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে সমাজ-মধ্যে সর্ব্বদাই এমন বাতাবরণ সৃষ্টি করিতে থাকা, যাহাতে বিদ্যার্জ্জন-প্রয়োজনে বয়স বাড়িতে থাকার কালে দেশের একটী পুত্র বা একটী কন্যাও স্খলিতচরিত্র, বিগতাদর্শ বা ভ্রষ্ট-জীবন না হইতে পারে।

তুল্যবংশীয়তা

(গ) স্বামিপত্নীর তুল্যবংশীয়তার সুফল এক মুখে বলিবার নহে কিন্তু তুল্যবংশীয়তা বলিতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি না যে, নীচ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের কন্যার বা পুত্রের মিলনে তুল্যবংশীয়তা রক্ষিত হইল। স্বামী ও পত্নী হয়ত একজাতীয় বা একসমাজভুক্ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু যে-যে বংশে উভয়ে জন্মিয়াছেন, সেই বংশদ্বয়ের উৎকর্ষের বিশিষ্টতা একরূপ হওয়া চাই। গোত্রদ্বারা তুল্যবংশীয়তা বিচার করিতে গেলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত তুল্যবংশীয়তার সুফল হইতে ভবিষ্যদ্‌বংশীয় পুত্র বা কন্যাকে বঞ্চিত করিতে পারি। ক্রূরকর্ম্মা কোনও শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় পাত্রের সহিত মধুকর্ম্মা কোনও ভরদ্বাজ-গোত্রীয় পাত্রীর মিলন সামাজিক দৃষ্টিতে তুল্যবংশীয়তা হইতে পারে, কিন্তু এই মিলনের ফলজাত পুত্র বা কন্যা তুল্যবংশীয়তার সুফল পাইবে না। তৎক্ষেত্রে সৎচর্চ্চা-বিশিষ্ট সদন্তঃকরণশালী মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় বা আলম্ব্যায়ন-গোত্রীয় পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে সেই বিবাহের ফলে পুত্রকন্যা অধিকতর লাভবান্ হইত। এইজন্যই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের কাঠক-সংহিতায় (৩০।১) উক্ত হইয়াছে,—"কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং, কিম্ পৃচ্ছসি মাতরম্

শ্রুতং চেদস্মিন্ বেত্তং, স পিতা স পিতামহঃ,—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আবার পিতামাতার সন্ধান লওয়া কেন? যদি তাঁহার মধ্যে জানিবার মত শ্রুত (ব্রহ্মজ্ঞান) থাকে, তবে সেই শ্রুতই তাঁহার পিতা, সেই শ্রুতই তাঁহার পিতামহ।" দুইটি বংশ যদি সমাজের প্রচলিত সমাজের দৃষ্টিতে একান্ত উচ্চ ও নিতান্ত নীচ হইয়াও থাকে, কিন্তু এই দুই বংশে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ যদি সমান ভাবেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, তবে এই দুই বংশের পুত্রকন্যার মিলনে ভাবী সন্তান তুল্যবংশীয়তার সুফল সুনিশ্চিত পাইবে। এই দৃষ্টিতে আমরা অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষপাতী।

অসবর্ণ বিবাহ

তবে সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে, ভিন্ন-জাতীয় বা ভিন্ন-সমাজভুক্ত দুইটি বিভিন্ন বংশের পুরুষানুক্রমিক সাধনা ও তাহার উৎকর্ষ প্রায়ই একরূপ হয় না, একটা মারাত্মক গরমিল কিছু থাকেই থাকে। এই দৃষ্টিতে আমরা অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধবাদী।

তুল্যবংশীয়তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

তুল্যবংশীয়তার একটা সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও আছে, দম্পতীর ব্যক্তিগত জীবনেও যাহা একান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বিবাহ কেবল পাত্র-পাত্রীর মিলনই নহে, ইহা দুইটি বিভিন্ন বংশের সকল আত্মীয়-কুটুম্বগণের মধ্যে এক ব্যাপক আত্মীয়তা-স্থাপন। বিবাহের দ্বারা পাত্রপাত্রী অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিল, আবার ইহা দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে দুই বংশের সকল আত্মীয়েরাও পরস্পরের আত্মীয় হইলেন। যেখানে বিবাহের ফলে দুই বংশের আত্মীয়-পরিজনেরা কুটুম্বিতার বন্ধনে বাঁধা পড়েন না, সেখানে হয় বরটী, নয় কনেটী নিজ নিজ আত্মীয়-বান্ধবদের কাছে পর হইয়া যায়। ফলে, তাহার দাম্পত্য জীবন যতই সুখের

হউক, বুকের ভিতরে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইয়া রহে। তাহার সন্তান-সন্ততি এক পরিজন-হীন নিঃসঙ্গতার তিক্ত স্বাদে জীবনকে অসুখময় দেখে। ইহার পরিণামে এক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক আত্মসুখ-পরায়ণ বংশাবলিসৃষ্টির পটভূমিকা রচিত হয়। এই দিকে তাকাইয়াও আমরা অসবর্ণ-বিবাহকে অনেক ক্ষেত্রে অভিনন্দিত করিতে সমর্থ হইতেছি না।

পুরুষ-পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য-সঙ্করণের বাধা

বর্ত্তমান সময়ে একসমাজভুক্ত বিভিন্ন দুইটী বংশের মধ্যেও পুরুষ-পরম্পরালব্ধ বৈশিষ্ট্যের তুল্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। কারণ, অনেক কাল যাবৎই প্রায় কোনও বংশেই একটি বিশেষ সাধনা নিজের জন্য স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছে না। বিবাহ ও নারীজাতি সম্বন্ধে ব্যক্তিমাত্রেরই ইতর-জনোচিত অতি কুৎসিত মনোভাবই এই দৈন্যের জন্য দায়ী। বর্ত্তমান বিবাহিত যুবক-যুবতীরা নিজ নিজ জীবনের মধ্য দিয়া একটি বিশিষ্ট সাধনাকে জয়যুক্ত করিতে চেষ্টান্বিত হইয়া কল্যাণ-প্রভাব-জাত নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়া এই দৈন্যকে দূর করিবার প্রথম সূচনা করিবেন এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ অভিসন্ধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম-সমূহ এই সকল আগামী বালক-বালিকাগণের সংশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য-সঙ্করণের বাধা-সমূহকে নিরাকৃত এবং আনুকূল্য-সমূহকে প্রবর্দ্ধিত করিবেন, আমরা এইরূপই আশা পোষণ করিতেছি এবং নিদ্রাযোগে আশার সুখস্বপ্ন দেখিয়াই তুষ্ট না রহিয়া নিজেদের সামান্য শক্তি-সামর্থ্যের সবটুকুকেই এই আশার চরিতার্থতা সম্পাদনে প্রয়োগ করিতে নিয়ত যত্নবান্ রহিয়াছি। আমাদের এই চেষ্টা দশ-বিশ

বৎসরে সফল হইয়া যাইব, এমন অসম্ভব কল্পনা আমরা করি না। হয়ত আমাদিগকে দুই-চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমে এই একটী কর্ম্মধারা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হয়ত কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন, কত নব নব সভ্যতার বন্যা আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইবে। হয়ত কত বিশ্বাস-ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকা আমাদের পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইবে। কে আমাদিগকে সহায়তা দিল, কে আমাদের বিরুদ্ধতা করিল, তাহাও হয়ত বিচার করিবার অবসর আমাদের মিলিবে না। আমাদিগকে ইহারই মধ্য দিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কোথাও ধর্ম্মের প্রশ্নে, কোথাও জাতির প্রশ্নে, কোথাও গোষ্ঠীর প্রশ্নে, কোথাও বা ভাষার প্রশ্নে কত অনাহূত অত্যাচার, অবান্তর আন্দোলন, অবাস্তব উন্মাদনা, অসম্ভব পরিকল্পনা, অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয়, কল্পনাতীত উৎপীড়ন আমাদের উপর দিয়া চলিবে, তবু আমরা মেরুদণ্ড নত করিব না,—সমান উদ্যমে, সমান উৎসাহে, সমান বিক্রমে নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইব।

অবশ্য, একথাও স্বীকার্য্য যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসমূহকে যোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিপোষণের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ভিক্ষা-সংগ্রহের আবশ্যিকতা। দান সংগ্রহ না করিলে প্রতিষ্ঠান চলিবে কি করিয়া?

পরমুখাপেক্ষা বর্জ্জন

আবার দান সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠান চালাইলে প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী, ছাত্র ও পোষ্যবর্গের মধ্যে স্বাবলম্বনী বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেই বা কি করিয়া? শত মুদ্রা, সহস্র মুদ্রা, লক্ষ মুদ্রার দাতারা কি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ইচ্ছাগুলিকে প্রতিফলিত দেখিবার

লোভ রাখিবেন না? মানুষের মনের দিকে তাকাইয়া প্রতিষ্ঠান চালাইতে গেলে প্রতিষ্ঠান কি পদে পদে স্বধর্ম্মচ্যুত হইবে না? রাজানুগ্রহ লাভ করিতে না পারিলে অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্য প্রসার লাভ করিতে পারে না কিন্তু রাজানুগ্রহও কখনো সর্ত্তহীন হয় না। ফলে, রবীন্দ্রনাথের মত দিক্‌পাল পুরুষ যে প্রতিষ্ঠান গড়েন, তাহাও রাষ্ট্রভাণ্ডারের অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্ত্তন করে। তাই যত ক্ষুদ্র হউক, আমাদের প্রয়াস বাহিরের পানে অর্থাগমের জন্য তাকাইবে না, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শ্রমের মধ্য দিয়া কি ভাবে তাহার ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়া নিজ কাজ করিয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখিবে। ফলে, হয়ত দশ-বৎসরে-সাধ্য কাজ সমাপ্ত করিতে শত বর্ষ লাগিবে, তবু আমরা নিরুদ্যম হইব না। আমাদের দৃষ্টি, "তিনশত বৎসরের পরে"। দুই শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতবাসীরা কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, আজিকার ভারতবর্ষ কিরূপ হইবে? আজিকার ভারতবর্ষও তেমন ধারণায় আনিতে পারে না যে, তিন শত বৎসরের পরে ভারতবর্ষের রূপ কি হইবে। কোনও

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন অচিরস্থায়ী

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনই অনন্তকাল ধরিয়া একটা দেশে একই প্রতিষ্ঠায় ও ব্যাপকতায় বিরাজ করিতে পারে না। তাহার রূপান্তর, অবস্থান্তর ও স্থানান্তর ঘটেই। সুতরাং অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি নিরপেক্ষ থাকিয়াই আমাদের কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। বংশানুক্রমিক গুণ-সঞ্চারণের লক্ষ্যকে প্রধান রাখিয়া রাষ্ট্রিক পরিবেশকে কতকটা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। মনুষ্য-মেধার সাংস্কৃতিক বিকাশকে পরমলক্ষ্য করিয়া চলিতে হইলে ইহাই শ্রেয়ঃ পন্থা। সহস্র প্রকারের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এবং পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও কখনো

আনুকূল্যের মধ্য দিয়া কখনো বা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া আমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, গোষ্ঠী, ভাষা, আচার, প্রথা এবং রাষ্ট্রের বিচিত্র পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এত বিরোধ বা বিরূপতা থাকা সত্ত্বেও একটী অতুলনীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য তাহার মধ্য দিয়াও রহিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। সেই ঐক্য মনুষ্য-মেধার এবং মানবীয় মনন-শীলতার এক অগণ্ডীবদ্ধ সীমাহীন অফুরন্ত বিকাশকে লক্ষ্য করিয়াই নিজ নীরব পথ অতিবাহন করিয়াছে। সৃষ্টিছাড়া একক থাকিতে হইলেও সেই পথই আমাদের পথ,—কেবল পথ নহে,—চিরন্তন পথ, সনাতন পথ, শাশ্বত পথ।

মনুষ্য-মেধার সাংস্কৃতিক পরমবিকাশ

(ঘ) দম্পতীর রুচির পার্থক্য সুখাবহ বা কল্যাণকর নহে। কিন্তু রুচির পার্থক্য দূর করা খুব কঠিনও নহে। আত্মোন্নতির ইচ্ছা যদি উভয়েরই প্রবল হয় এবং একের প্রতি অন্যের ভাল-বাসা যদি গভীর হয়, তাহা হইলে একে অন্যের সুরুচিকে অনুকরণ করিয়া এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কুরুচি পরিহার করিয়া অনায়াসে রুচির সাম্য বিধান করিতে পারেন। যে স্থলে উভয়ের রুচি দূষিত, সে স্থলে উভয়ে উভয়কে আত্মসংশোধনে সহায়তা দিয়া উৎকৃষ্টতর রুচিসম্পন্ন হইতে পারেন। পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংশোধন ব্যাপারে উভয়কে নিয়ত প্রকৃষ্টতম জীবনাদর্শের ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলেই রুচি-সাম্যের দ্বারা জীবনের মূল্য ও মহিমা বর্দ্ধিত হইবে। নতুবা উভয়ের জীবনযাপন-প্রণালী যদি কুরুচি দ্বারা প্রণোদিত হইল, তাহা হইলে রুচিসাম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে

রুচিসাম্য

কল্যাণ হইল না। আহারে বিহারে, কথায় বার্ত্তায়, চালে চলনে উভয়কেই উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত-সমুহের দ্বারা আত্মসংশোধনে যত্নশীল হইতে হইবে।

সাধারণতঃ ইহাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, বিবাহের পরে স্ত্রী স্বভাবতঃই ধীরে ধীরে নিজ রুচি পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বামীর রুচিসমূহের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। স্বামী স্বভাবতঃ নিজের অভ্যস্ত রুচিতে দৃঢ়রূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই কারণেই প্রাচীনকালে একজন ব্রাহ্মণ-পুত্র ক্ষত্রিয়-কন্যাকে বিবাহ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, কিন্তু একজন ক্ষত্রিয়-তনয় ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণি-পীড়ন করিলে তাহা সাধারণতঃ দোষাবহ বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে যে ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি বিবাহ করিলেন, তাহা ঋষি-শাপে সম্ভব হইল। সহজ পথে অসম্ভব ছিল বলিয়াই কৈফিয়ৎ স্বরূপে বৃহস্পতির পুত্র কচের অভি-সম্পাতকে আমদানী করা প্রয়োজন হইল। অথচ, ব্রাহ্মণ অগস্ত্য যে ক্ষত্রিয়-কন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করিলেন, ব্রাহ্মণ জমদগ্নি যে ক্ষত্রিয়-কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন, তাহার জন্য পুরাণকারকে কোনও কারণ-নির্দ্দেশ করিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। উচ্চরুচিসম্পন্না কন্যা নীচরুচিসম্পন্ন বরের অনুকরণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্তা হউক, ইহা প্রাচীন সমাজপতিগণের অভিপ্রেত ছিল না।

প্রতিলোম বিবাহ

উচ্চসংস্কারসম্পন্ন মহৎ কুলের কন্যাকে অনেক সময়ে হীনতর-সংস্কার-সম্পন্ন সাধারণ কুলের পাত্রকে ব্যক্তিগত গুণাধিক্যের দরুণ পতি রূপে নির্ব্বাচন করিতে দেখা যায়। অনুমান করা হয় যে, পতির ভিতরে যে সকল সদ্‌গুণ বা উচ্চভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, হয়ত তাহার বংশাবলির লোকদের মধ্যেও তাহার প্রাচুর্য্য সম্ভব হইবে। কার্য্যকালে যখন তাহা হয় না, তখন মহৎ কুলের

আধুনিক স্বয়ম্বর

কন্যাকে আস্তে আস্তে পতির পরিজনদের চরিত্রানুশীলন করিতে হয়। অশনে, বসনে, আচারে, ব্যবহারে, বচনে, মননে আস্তে আস্তে রুচ্যন্তর ঘটিতে থাকে। এই রুচি-পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকে না হইয়া হইতে থাকে প্রায়শঃই অবনতির দিকে। তদুপরি উৎকৃষ্ট পরিবেশ হইতে আসিয়া অপকৃষ্ট আবহাওয়াতে পতিত হওয়ার দরুণ একটা অন্তর্জ্জ্বালা বা আত্মগ্লানিও চলিতে থাকে। বৈশ্য-বংশে বিবাহিতা দুই চারিটী ক্ষত্রিয়-কন্যার ভিতরে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দুই চারিজনের পক্ষে যাহা সত্য, তাহা আরও বহুজনের পক্ষে সত্য হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। প্রাচীন সমাজে যে অনুলোম বিবাহে পরোক্ষ সম্মতি এবং প্রতিলোম বিবাহে প্রত্যক্ষ প্রতিষেধ ছিল, তাহার স্বপক্ষে সদ্‌যুক্তি হয়ত এইখানে মিলিবে।

আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ববর্ণের মধ্য হইতেই রুচির বৈশিষ্ট্য প্রায় দূর হইয়াছে। এক্ষণে কাহারও রুচি দর্শনে তাহার জাতি অনুমান সম্ভব হয় না। এই কারণে স্বামীর প্রভাব-হেতু স্ত্রীর উন্নতি হইবে, এইরূপ আশা দুরাশার পংক্তিভুক্ত হইয়াছে। তাই, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই কর্ত্তব্য হইতেছে, একজন দ্বারা অপর জনের রুচির উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া।

রুচি ব্যাপারটা দৈহিক, মানসিক এবং বাচিক ত্রিবিধ হইয়া থাকে। কেহ অপরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে, কেহ বা ইহার বিপরীত। কেহ পচা মাছ খাইতে ভালবাসে, কেহ মৎস্যাসক্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করে। কেহ সিনেমা-ষ্টারদের চিন্তা করিতে ভালবাসে, কেহ ভালবাসে দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে। কেহ ভদ্র কথাও কুভাষায় বলিতে ভালবাসে, কেহ নিরতিশয় কুকথাও ভদ্রভাষায় পরিবেশন করিতে

দাম্পত্য জীবনে নানা উৎকট উৎপাত

আগ্রহী। রুচির এই যে বৈষম্য, তাহা যখন স্বামিস্ত্রীর মধ্যে হয়, তখন প্রথম প্রথম ইহা সহনীয় হইলেও পরে ইহা নিদারুণ মানসিক অশান্তি ও কলহের সূচনা করে। নিতান্ত সোজাবুদ্ধির স্বামিস্ত্রীদের মধ্যেও পরস্পরের মনোরঞ্জনে অক্ষমতা এমন উৎকট রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে যে, তাহারই উৎপাতে দাম্পত্য জীবনের সুখ বিব্রত হইয়া পড়ে এবং শান্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। এই সকল ক্ষেত্রে অবিলম্বে অনুসন্ধান প্রয়োজন যে, এই অশান্তির মূল কি? যদি যৌন অক্ষমতা ইহার মূল হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সহায়তা নেওয়া উচিত। অনেক স্থলে একমাত্র মানসিক চিকিৎসার দ্বারা বা ব্যক্তিগত সঙ্কল্প-সাধনের (auto-suggestion) বলে এই অক্ষমতা বিদূরিত হইতে পারে। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা হেতু যদি একজন আর একজনের সম্পর্কে বিরূপ, অনাসক্ত, উদাসীন, অবহেলা-পরায়ণ বা ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তবে পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন করিতে হইবে। যদি মুখের বা শরীরস্থ অন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্গন্ধহেতু স্বামী পত্নীর আদর হইতে এবং পত্নী স্বামীর সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতা ও চিকিৎসার দ্বারা তাহা দূর করিয়া মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কেহ অপ্রিয় কথা বলিতে ভালবাসে, কেহ বা মিষ্টভাষী। এইরূপ স্থলে মধুভাষিতার চেষ্টাকৃত অভ্যাস করিয়া উভয়ের রুচিসাম্য-বিধান করিতে হইবে। উভয়ের রুচির মধ্যে যেইটুকু সুরুচি, তাহাই উভয়কে সযত্নে অনুসরণ করিতে হইবে,—যাহা কুরুচি, তাহা উভয়কে সমপ্রযত্নে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৬) তুল্যবংশীয়তা স্বামিপত্নীর মধ্যে যদিও বা অতি কষ্টে মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু একপ্রকৃতিকতা বাস্তবিকই অতি দুর্ল্লভ।

একপ্রকৃতিকতা

ভিন্ন রুচির স্বামিপত্নীর মধ্যে রুচিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন না হইলেও ভিন্ন প্রকৃতির স্বামিপত্নীর মধ্যে প্রকৃতি-সাম্যের প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার। বরের পিতামাতা এবং কন্যার পিতামাতা একই উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দীর্ঘকাল (অন্ততঃ এক বৎসরকাল নিশ্চিতই) সংযম-সাধনা পূর্ব্বক বর এবং কন্যার জন্মদান করিলে তেমন বর ও কন্যার প্রকৃতির স্বাভাবিক সাম্য আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সন্তান-জনন সম্ভব হইলেও অপর এক দম্পতীর সঙ্কল্পের সহিত নিজের সঙ্কল্পের মিল রাখিয়া সন্তান-জনন করিবার চেষ্টা বহুলরূপে প্রচলিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে না। এই জন্যই যত সুনির্ব্বাচিত হইয়াই নরনারীর বিবাহ হউক না কেন, স্বামিপত্নীর প্রকৃতির পার্থক্য কিছু থাকিবেই। একই পিতার ঔরসে ও একই মাতার গর্ভে জন্মিয়াও যখন ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকে, তখন ভিন্ন ভিন্ন জঠর-প্রসূত স্বামী ও স্ত্রী নামধারী দাম্পত্য জীবদ্বয়ের প্রকৃতির পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে, ইহা একপ্রকার অবধারিত ব্যাপার। সুতরাং এই বৈষম্যটাকে গায়ের জোরে চূর্ণ করিতে না চাহিয়া ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই গৃহীর জীবনকে অন্যতর উপায়ে সুখনিকেতন করিতে হইবে। আংশিক প্রকৃতিসাম্যদ্বারা বিবাহ নির্ব্বাচিত হইলে আধ্যাত্মিক উপায়ের দ্বারা পার্থক্যটুকুর অনিষ্ট-কারিতা সম্যক্ নিবারণ করা যায়। এইরূপ উপায়সমূহ "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

স্বামিপত্নীর প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বাভাবিক

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বরকন্যা যে-ভাবে নির্ব্বাচিত হয় এবং বিবাহ যে-ভাবে নির্দ্ধারিত হয়, তাহাতে বরকন্যার আংশিক প্রকৃতি-

সাম্যও একটা দৈবাধীন ব্যাপার মাত্র। সাধারণতঃ এদেশে পাত্র-মনোনয়নে পাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রায় কোনও মূল্য নাই বলিয়া এবং যেখানে কিছু বা মূল্য আছে, সেখানেও সাধারণতঃ পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা-দীক্ষা সংযত চিন্তা ও সংযত জীবনের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল নহে বলিয়া, বর-কন্যার মিলনের মধ্যে, পরিণয়োৎসবের মঙ্গল-শঙ্খের সুমধুর ধ্বনির মধ্যে মানসিক বিরোধের একটা বেসুরা প্রতিবাদ থাকিয়া যায়। কারণ, যেখানে বিবাহিত জীবনের ভালমন্দ বুঝিতে অক্ষমা বালিকাকে হঠাৎ একদিন একটী অজানা অচেনা আগন্তুকের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হয়, সেখানে বালিকার মনে প্রচণ্ড ভয়, শঙ্কা ও আতঙ্কই জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। কাহারও কাহারও এই আতঙ্কটা পরে প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রী হইয়া স্বামীকে মনে মনে ভয় করে না, এমন নারীই বা কয়টী মিলিবে? সাম্য ছাড়া ত' মিলন হয় না! বাঘে আর ছাগলে ত' বন্ধুত্ব জন্মে না! প্রেম সমানে সমানেই হয়, অসমানে হয় না। স্বামী এবং স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য আবশ্যক, একথা পূর্ব্বে আমরা অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। বয়সের পার্থক্য থাকার অপর একটা কারণ এই যে, নারীর দেহ পুরুষদেহ অপেক্ষা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সান্তানিক যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু এই পার্থক্য মনের মিলের ব্যাঘাত করে না, অন্ততঃ স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে। যদিও মনের মিল আর একপ্রকৃতিকতা এক কথা নহে, তথাপি মনের মিল যে একপ্রকৃতিকতা সাধনের পরম সহায়, একথা নিঃসন্দেহ। সুতরাং পাত্রপাত্রীর মনের মিলন বুঝিয়া সম্বন্ধ-নির্ব্বাচন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুমোদিত। কিন্তু এখানেও গোল বাধিয়াছে। যে পাত্রী

বর্ত্তমান বিবাহ-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা

স্বয়ম্বর-বিবাহের অসম্পূর্ণতা

নিজের মনকে চিনে না, সে যতই লেখাপড়া শিখিয়া থাকুক না কেন, অপরের মনের সহিত নিজের মনের মিলন সে কেমন করিয়া ধরিবে ? যাহার মন নিজের আয়ত্ত নহে, যে নিজের মনের সঠিক হিসাব রাখিবার কৌশল জানে না, মনকে বশে রাখিবার, ঘষিয়া মাজিয়া মলমুক্ত করিবার অনুশীলন যে করে নাই, শতপথগামী, প্রমত্ত, ব্যভিচারী মনকে সংযমের রশ্মিতে বাঁধিয়া রাখিবার যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে যে পদ্ধতিবদ্ধভাবে চেষ্টা করে নাই, কাহার সহিত তাহার মন মিলিল, আর কাহার সহিত মিলিল না, ইহা সে কিরূপে বুঝিবে ? আজ যাহাকে মনের মিলন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে শুধু চ'খেরই ক্ষণস্থায়ী নেশা নহে, যাহাকে খাঁটি সোণা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে গিল্টি-করা পিতল নহে, যাহাকে হীরক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে ক্ষণভঙ্গুর কাচই নহে, তাহার নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে ?

এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যের" দ্বারা। অসবর্ণ বিবাহ বা একই সমাজের বিভিন্ন পরিবারের প্রথার বিরুদ্ধে কন্যাদান বা স্বয়ম্বর-বিবাহ স্বাধীন রুচিমত চলিতে পারে, কিন্তু পরস্পরের মনোমিলনবর্জ্জিত বিবাহ কি করিয়া সুখকর হইবে ? তাই বিবাহিত দম্পতীর পারস্পরিক শক্তিসাম্যে প্রয়োজিত পুরুষকারের দ্বারা দৈবের এই নির্ব্বন্ধের দুঃখ ও বৈষম্যগুলির হাত এড়াইয়া চলা যাহাতে সম্ভব হয়, তাহা করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সহিত মানুষের পার্থক্যের মূল কারণসমূহ তাহাদের মনের প্রাক্তন সংস্কার এবং প্রচ্ছন্ন প্রবণতাসমূহের মধ্যেই রহিয়াছে। স্বামী ও স্ত্রীর মনের সেই সকল প্রাক্তন সংস্কার এবং প্রচ্ছন্ন প্রবণতাগুলিকে ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ ও নির্বিষ করিতে পারিলে প্রকৃতির বৈষম্য তাহাদের কল্যাণকে পরাভূত

করিতে সমর্থ হয় না। "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যের" দ্বারা প্রকৃতি-বিরোধের এই মূল বিষকে নির্জ্জীব করা হয় এবং এই পরিশোধিত বিষ দ্বারাই অমৃততুল্য-মহৌষধের ফললাভ হয়, যেহেতু প্রকৃতি-পার্থক্য তখন বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া মিলনের মধ্যেই অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। যেখানে স্বামিপত্নীর মধ্যে অনুরাগ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেখানে প্রকৃতির বৈষম্য-টুকু "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যে"র দ্বারা পরিশোধিত হইয়া গৃহিজীবনের লীলা-মাধুর্য্যকেই বর্দ্ধিত করে। কিন্তু যেখানে প্রকৃতির সাম্য নাই, মনের মিল নাই, মতামতের সাদৃশ্য নাই, পারস্পরিক প্রেম নাই, একে-অন্যে সহানুভূতি নাই, ধৈর্য্য ধরিয়া নিয়মিতভাবে "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যের" অনুশীলন করিলে সেখানেও বজ্রদগ্ধ তরুতে নববসন্তের কোমল কিশলয় অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে, মরুপ্রান্তরে প্রেমের মন্দাকিনী সুমধুর কুলুনাদে প্রবাহিত হয়।

আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য

নারী যখন "পতি-ভাব"টার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা করেন, স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তখন তাঁহার মানসিক সংস্কার ও প্রবণতাগুলি স্বামীর সংস্কার ও প্রবণতাগুলির সহিত নিজ পার্থক্য রক্ষা করিয়াও অকল্যাণ-প্রসবের ক্ষমতা হারায় এবং কল্যাণ-বর্দ্ধনের সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু ইহাতে স্বামী স্বয়ং কোনও উৎকর্ষকে প্রাপ্ত হন না। এমন সতী নারীর স্বামী হওয়ার দরুণ যদি তাঁহার কোনও সুকৃতি লাভ হয়, তবে তাহা পত্নীর আশীর্ব্বাদে মাত্র। প্রকৃত কথা কহিতে কি, আমরা যে সত্যবান্ বা নল রাজাকে একটা পৃথক্ সম্মান দিয়া থাকি, তাহা শুধু তাঁহাদের

পতিভাবের নিকটে নারীর আত্মসমর্পণ

ত্রিলোক-পূজিতা সহধর্ম্মিণী সাবিত্রী ও দময়ন্তীর অক্ষয় পুণ্যে। সাবিত্রী ও দময়ন্তী না থাকিলে সত্যবান্ বা নলরাজা অপরাপর শতশত রাজা-মহারাজদেরই ন্যায় থাকিতেন, বিশেষ একটা-কিছু বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। সতীর স্বামী শিব এবং সীতার স্বামী রামচন্দ্র যে সত্যবান্ ও নলরাজা অপেক্ষা একটা পৃথক্ সন্মান পাইয়া থাকেন, তাহার এক কারণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অলোক-সামান্যত্ব এবং অপর কারণ তাঁহাদের পত্নীর প্রতি অতুলনীয় প্রেম। সতীর শব স্কন্ধে লইয়া নিখিল ভুবন ভ্রমণের মধ্য দিয়া মহাদেবের যে অতীব মর্ম্মস্পর্শী প্রেমের পরিচয় রহিয়াছে, তাহাই তাঁহাকে একান্ন পীঠের ভৈরব রূপে পূজিত করিয়াছে। সতীর দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে তিনি যদি পুনরায় কুমার-সম্ভব-প্রয়োজনে উমার পাণি-পীড়ন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি একপরায়ণতার দরুণ অধিকতর পূজ্য হইতেন। কিন্তু এই একটি খুঁতও শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের ভিতরে পরিদৃষ্ট হয় নাই। পিতৃসত্য-পালনার্থ বনে গমনের দ্বারা তিনি রাজা-প্রজা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন, যে সীতার বিরহে অবস্থান তাঁহার পক্ষে প্রাণাত্যয়-ক্লেশবৎ অসহনীয়, প্রজারঞ্জনার্থ তাঁহাকে বনবাসে দিয়া তিনি দেশস্থ পুরুষ প্রজাগণের দাবী পূরণ করিলেন। কিন্তু বহুপত্নীর প্রতিপালক রাজা দশরথের আত্মজ হইয়াও পুনর্বিবাহে কোনও সামাজিক, কৌলিক বা লোকপ্রথাগত বাধা না থাকা সত্ত্বেও, তিনি সীতা ব্যতীত আর দ্বিতীয়া নারীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত কল্পনা না করিয়া কি নারী কি পুরুষ সকলের পূজার পাত্র হইলেন। ফলতঃ রামায়ণ একদিকে যেমন সীতার অপূর্ব্ব পতি-প্রেমের কাহিনী বলিয়া "সীতায়ন" আখ্যা পাইলেও অশোভন হইত না, অপর দিকে তেমন রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেমের কাহিনী

বলিয়া "রামায়ণ" নামেই অন্বর্থনামা হইয়াছে। কিন্তু রামের মত পতি কয় জন মিলে? সীতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া লক্ষ লক্ষ নারী নিজ জীবনে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু রামচন্দ্রকে তাঁহার প্রকৃত প্রেমমাখা মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া কয়জন পুরুষ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইল? রাম যে রাজ্যলোভে সীতাকে বনবাসে দেন নাই, এই কথাটী কয়জন পুরুষ বুঝিল? তাৎকালিক ধারণানুযায়ী রাজ-ধর্ম্মের বেদী-মূলে নিজের স্বার্থকে উৎসর্গ করিয়া যে নিজের প্রতি নিজে নৃশংসতা সাধিয়া রামচন্দ্র সীতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন, এই যুক্তি কয়জনে উদ্ভাবন করিতে পারিল? ফলে, নারী পতি-ভাবের সাধনায় নিজেকে বিকাইয়া দিয়া মহত্ব লাভ করিলেন সত্য কিন্তু এই মহাসম্পদ হইতে স্বামী বেচারারা বঞ্চিতই থাকিয়া গেল। অবতার-রূপে শ্রীরামচন্দ্রের হাজার হাজার পূজামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনের একনিষ্ঠা পূজকগণের জীবনে আদর্শ-রূপে স্থান পাইল না। আজ রাষ্ট্রশাসকগণকে হিন্দু পুরুষের একপত্নীত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আইন রচনা করিতে পর্য্যন্ত হইয়াছে। কারণ, স্ত্রীর পক্ষে এ দেশে স্বামিপূজা যেমন বদ্ধমূল শিষ্টাচার, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীপূজা তদ্বৎ নহে। তন্ত্রশাস্ত্র কুলাচারী সাধককে স্ত্রীর প্রতি উপাস্যাভাব আরোপ করিতে উপদেশ করিলেও সেই উপদেশ তেমন ভাবে পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। তাহার প্রথম কারণ এই যে, তন্ত্রধর্ম্মে সকলে সমভাবে আস্থাবান্ নহে। দ্বিতীয় কারণ, তান্ত্রিক সাধনায় ব্যভিচার ও কদাচারের দুরন্ত প্রশ্রয় আছে। তৃতীয় কারণ, তন্ত্রধর্ম্ম গৃহী সাধকদের উদ্ভাবিত ও অনুশীলিত ধর্ম্ম;

পত্নীর প্রতি পতির উপাস্যভাব

সংসার-বিমুখ, ভোগসুখে অনাস্থাকারী সন্ন্যাসীরা ইহার প্রচারক নহেন। অথচ ভারতীয় হিন্দুজাতির স্বাভাবিক নেতৃত্বটা অধিকাংশ সময়ে যেন সন্ন্যাসীর হাতেই রহিয়াছে। বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, রামানুজ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী। হিন্দুজাতি গৃহীর শাসন মানেন নাই, তাহা নহে। নানক, কবীর এবং আধুনিক রামমোহন রায় সকলেই গৃহী ছিলেন। কিন্তু তথাপি ইহা অতি স্পষ্ট সত্য যে, সন্ন্যাসী ধর্ম্ম-প্রচারকেরা যত সহজে বা যত সময়ে যাহা করিতে পারিয়াছেন, গৃহী ধর্ম্মপ্রচারকেরা তত সহজে বা তত সময়ে তাহা করিতে পারেন নাই। তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ তেমন ভাবে প্রতিপালিত না হইবার পক্ষে ইহা বড় তুচ্ছ কারণ নহে। চতুর্থ কারণ এই যে, যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের অনুরাগী এবং তদনুযায়ী সাধনকারী, তাঁহাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসরণ না করিয়া আচারকেই মূল বলিয়া ভাবিয়াছেন, নারিকেলের শস্যে উপেক্ষা করিয়া ছোবড়া চিবাইয়াছেন এবং তামসিক প্রকৃতির লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিকটে ছোবড়ার অতুলনীয় মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করিয়া শস্যের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ও অজ্ঞতা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রের কোনও কোনও আচার যতই কুৎসিত হউক, তন্ত্রের উপদেশে সত্য আছে। ইংরাজী শিখিয়া কুসংস্কারাবদ্ধ মাতালের প্রলাপ-বচন বলিয়া তন্ত্রকে আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, আমাদের যুক্তি-তর্কের দাপটে

তন্ত্রোক্ত অনুশাসন প্রতিপালিত হইল না কেন?

সন্ন্যাসীর প্রভাব

তান্ত্রিকাচারীর বীভৎসতা

তন্ত্রের উপদেশে সত্য আছে

তন্ত্র হয়ত প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ পাইবে না, কিন্তু উহাতে যাহা সত্য, তাহার মৃত্যু নাই। যে ভাবেই হউক, মস্তক প্রদক্ষিণ করাইয়া অন্ন-গ্রাস ভোজনের মত করিয়া হইলেও যাহা প্রকৃত সত্য, তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তালগাছের সাথে একটা জীবন্ত মানুষকে ফাঁসী লটকাইয়া দিলে তাহার জড় দেহটা মরিয়া যায় সত্য, কিন্তু যে আত্মা ঐ দেহটীকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হয় না। একটী দেহের পতনে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া আত্মা নিজেকে পুনরায় বিকশিত করেন। ঠিক তেমনি যে সত্য তন্ত্রশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতে চাহিয়াছিলেন, যদি তন্ত্রাচারীদের উদ্দেশ্য-বিস্মৃতি হেতু সেই শাস্ত্রকে ফাঁসী লটকাইয়া লীলাসাঙ্গ করিতে বাধ্য করিতে আমরা পারি, তাহা হইলেও সেই সত্য পুনরায় নূতন শাস্ত্রের মধ্য দিয়া অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। তন্ত্রের বহু সত্যের মধ্যে একটা বড় সত্য এই যে,—"নারীও পূজার্হা। পুরুষ যেমন নারীর উপাস্য, নারীও তেমন পুরুষের উপাস্যা। পুরুষ যেমন নারীর ব্রহ্ম-প্রতীক, নারীও তেমন পুরুষের ব্রহ্ম-প্রতীক। চিত্তের যাবতীয় সাত্ত্বিকী বৃত্তির উপচারে নারী যেমন পতিদেবতার অর্চ্চনা করিবেন, পুরুষের পক্ষেও পত্নীদেবতা তেমনই অর্চ্চনীয়া।" আদিকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত সকলেই নারীর পতিপূজার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পুরুষের পত্নীপূজার কথা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে এক তন্ত্র ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। কেহ বলিয়াছেন রাখিয়া, কেহ বলিয়াছেন ঢাকিয়া, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র শঙ্কাসঙ্কোচের ধার ধারেন নাই, যাহা বলিবার, লজ্জা-সরম ডালি দিয়াই বলিয়াছেন।

সত্যের ধ্বংস নাই

তন্ত্রের সত্য

তন্ত্রের সকল কথা আমরা মানি আর না মানি, প্রকারান্তরে হইলেও এই কথাটা আমাদিগকে মানিতেই হইবে। কারণ, নারীকে পূজা না করিয়া পুরুষই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ভক্ত প্রেমভরে পাথরের বিগ্রহকে পূজা করিয়া লাভবান্ হইলে নিজেই হয়, প্রস্তরের তাহাতে কি যায় আসে? এতদিন ধরিয়া স্ত্রীজাতি পতিদেবতাকে পূজা করিয়া আসিয়াছেন,—পতিই সতীর গতি, পতিই সতীর প্রাণ, পতিই পুণ্য, পতিই গুরু, এই সকল সংসংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্ত্রীজাতি যদি আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন, তবে নিজেই করিয়াছেন। পতি-ভাবটার কাছে আত্মসমর্পণ করিবার এই চেষ্টার ফলে তাঁহারা শতগুণশক্তিশালিনী সহিষ্ণুতা, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন। যদিও পুরুষ-জাতি স্ত্রীজাতিকে সচল রতি-মন্দিরের অতিরিক্ত কিছু মনে করে না, তথাপি নারী পরদাররত স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিয়াছেন, প্রতিদান পাইবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া উপদংশক্লিষ্ট বা কুষ্ঠ-জর্জ্জর স্বামীর সেবা অক্লান্ত অধ্যবসায়ে করিয়াছেন, যে স্বামীকে বর্জ্জন করিলে অন্তর্য্যামীর বিচারে স্ত্রী অনুমাত্র অপরাধিনী হন না, সেই বর্জ্জনীয় স্বামীর দুঃখদ সঙ্গকেও পরিহার না করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, পতিভাবটার কাছে আত্মসমর্পণের ফলে স্ত্রীজাতি প্রকৃতই কত বড় হইয়াছেন। যে দেয়, সে বড়, না যে দুহাত পাতিয়া লয়, সে বড়? যে ভালবাসে, সে বড়, না যে ভালবাসা পায়, সে বড়? যে সেবক, সে বড়, না যে সেবা গ্রহণ করে, সে বড়? ভক্ত বড়, না ভগবান্ বড়? বিচার করিয়া দেখ,

নারীপূজার অভাবে পুরুষের ক্ষতি

স্ত্রীজাতির মহত্ত্বের প্রমাণ

নারীজাতি পুরুষ-জাতি অপেক্ষা কত বড় হইয়া গিয়াছেন। নিজেকে বড় ভাবিয়া ভাবিয়া এভাবে পুরুষজাতি কেবল বঞ্চিতই হইয়াছে, তা'হার মহত্ত্বের ভাণ্ডার রিক্তই রহিয়া গিয়াছে। নারীকে দাসীর জাতি বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে পুরুষ হইয়াছে বলদর্পিতের ক্রীতদাস, আর জোর করিয়া পতিপূজা আদায় করিতে চাহিয়া পরিণত হইয়াছে নিরুদ্যম নপুংসকে। স্ত্রীজাতির চিরগুরুগিরির অটল সিংহাসনে আসীন হইয়া নিয়ত সে শুধু হুকুমের পর হুকুম চালাইয়াছে, অবাধ্যতার কল্পনামাত্রে উদ্যত দণ্ডে নারীর মস্তক চূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু নিজে কখনও গুরুত্ব অর্জ্জনের চেষ্টাটুকুও আবশ্যকীয় মনে করে নাই। হইতে চাহিয়াছে সে স্ত্রীজাতির পরমেশ্বর, কিন্তু ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অপরিসীম প্রাণের টান, তাহার অনুশীলন করে নাই। ফলে, পুরুষের মনুষ্যত্বের মধ্যে একটা সুবিশাল অভাব, রিক্ততা ও শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে।

নারীকে দাসীর জাতি মনে করিবার প্রতিফল

এই শূন্যতা বিদূরিত করিবার জন্যই সূক্ষ্মদর্শী যোগীরা "আধ্যাত্মিক শক্তি-সাম্যের" উপায় সমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বহিরাচারের মধ্য দিয়া নহে, আন্তরিক প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া, পরস্পরকে পরস্পর পূজা করিয়া সমভাবে কল্যাণবন্ত হইবার পন্থা-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(চ) লক্ষ্যের একতানতাই দাম্পত্য জীবনের সকল সুখ, সৌভাগ্য ও সার্থকতার মূল। কিন্তু কি স্বামী কি পত্নী কাহারও পক্ষেই জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় সহজ কথা নহে। একমাত্র যুক্তি-তর্কের সাহায্যে কাহারও লক্ষ্য নির্ণীত হইতে পারে না, হৃদয়ের গতিবেগ বুঝিয়াই লক্ষ্য-নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধন দ্বারা যাহার চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় নাই, হৃদয়ের

দম্পতীর একলক্ষ্যতা

গতিবেগ তাহার পঙ্কিল থাকে। সেই পঙ্কিল প্রবাহে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া লক্ষ্যনির্ণয়ের বা লক্ষ্যলাভের চেষ্টা বিড়ম্বনাই বটে। ভগবানকেই জীবনের একমাত্র পরিচালক জানিয়া তাঁহাকেই নিজেদের সকল প্রয়াস-স্পন্দনের মূলীভূত উৎসস্বরূপ বুঝিয়া যাঁহারা ভগবৎ-সাধনায় নিজ নিজ জীবনকে পরিশুদ্ধ করিতে শৈথিল্য না করেন, তাঁহাদের পক্ষে হৃদয়ের গতি-প্রবাহ লক্ষ্যনির্ণয়ের পরম সহায়, অপরের পক্ষে অধিকাংশ স্থলে বিপথগমনে প্ররোচক মাত্র। নিজ নিজ হৃদয়ের বেগ ও আবেগকে তাহাদের যথার্থ স্বরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবার জন্য স্বামী এবং পত্নীকে, তাহাদের সহিত দেশের ও জগতের কি কি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা নানাভাবে নানাবিধ কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। পুরুষেরা যখন সমাজের কল্যাণে নিজেদিগকে সমর্পণ করিয়া দিতে অগ্রসর হয়, তখন যদি তাহারা নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীদিগকে ঐ সকল কল্যাণের কোনও একটা অংশে আত্মদানের সুযোগ না দিতে পারে, তাহা হইলে দম্পতীর লক্ষ্যের একতানতা সম্পাদন বড় দুরূহ ব্যাপার। উভয়েই একলক্ষ্য কিনা অথবা একলক্ষ্যতার অভাব থাকিলে সেই অভাবের পরিমাণ কতটুকু এবং এই অভাবটুকু পূরণের শ্রেষ্ঠ উপায় কি হইতে পারে, তাহা উভয়ের একই কর্ম্মে শক্তি-প্রয়োগের চেষ্টার মধ্য দিয়াই ধরা পড়ে। কিন্তু একথা আমরা স্বীকার করি না যে, প্রকাশ্য সভাস্থলে বাগ্মী স্বামীর অনুগমন করিলেই, এমন কি দুই এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেই, স্ত্রী তাঁহার এক-লক্ষ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলেন, অথবা বন্ধুসমাজে

জীবনের লক্ষ্য চিনিবার উপায়

সমাজ-কল্যাণ অনুষ্ঠানে স্বামিপত্নী উভয়ের যোগদান

মেকী একলক্ষ্যতা

পরকল্যাণনিরতা সহধর্ম্মিণীর গুণের প্রশংসা গাহিয়া বেড়াইলেই স্বামী তাঁহার একলক্ষ্যতা প্রমাণিত করিলেন। একই কর্ম্মের মধ্যে নারী যখন প্রেরণাদাত্রী মহাশক্তি এবং পুরুষ যখন কর্ম্মাবতার সংগ্রাম-বিগ্রহ, তখনই উভয়ে যথার্থ একলক্ষ্য হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিব। তাঁহাদের লক্ষ্যের একতানতা সম্পাদনে বাহিরের লোকের প্রশংসা-গুঞ্জন বা করতালিধ্বনির কোনও অপরিহার্য্য আবশ্যকতা নাই, একের প্রতি অপরের সাত্ত্বিক মমত্ববোধ, একের মহিমায় অপরের শ্রদ্ধাসিক্ত বিশ্বাস এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বের ব্যাপকতায় আস্থাই যথার্থ একপ্রাণতা ও একলক্ষ্যতা সাধনের একমাত্র উপায়। "আমার দেহ আর তোমার দেহ দুইটী আলাদা বস্তু হইলেও তোমার মন-প্রাণ-হৃদয় আমারই মন-প্রাণ-হৃদয়, তেমোর আত্মা আমারই আত্মা, আর আমার মন-প্রাণ-হৃদয় তোমারই মন-প্রাণ-হৃদয়, আমার আত্মা তোমারই আত্মা" নিয়ত এইরূপ চিন্তন ও অনুচিন্তন করিতে করিতে সাত্ত্বিক মমত্ব-বোধের জন্ম হইয়া থাকে। একজন অপরজনের প্রতিচিত্র নিজ বক্ষে রাখিয়া বা সম্মুখে স্থাপনা করিয়া অতি দূরদেশে অবস্থান সত্ত্বেও এই তত্ত্বের অনুশীলন করিতে পারে।

সাত্ত্বিক মমত্ব-বোধের সাধন

(ছ) সাধনধর্ম্মের [Spiritual Principles and Practice] ঐক্য ব্যতীত দাম্পত্য সাধনার পরিপূর্ণতা অসম্ভব। যাহাদের আধ্যাত্মিক মতবাদ সদৃশ, তেমন দম্পতী যদি সদৃশ সাধন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন-পরায়ণ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনে আর শান্তির অপ্রতুলতা থাকে না। সাধনের বলেই ধীরে ধীরে উভয়ের

সাধন-ধর্ম্মে ঐক্য

মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য ও পার্থক্য প্রশমিত হয় এবং গৃহিজীবন দিনের পর দিন অমৃতায়মান হইয়া উঠিতে থাকে। ভারত এক মহাদুর্দ্ধর্ষ, নববলে বলীয়ান্, প্রচণ্ড-শক্তি-সম্পন্ন তেজোদৃপ্ত মহাজাতির সৃষ্টি-ব্যাপারের ইহাই মূল রহস্য। স্বামি-পত্নীর সাধন-ধর্ম্মের ঐক্য হইতে যখন গৃহে গৃহে প্রকৃতিদত্ত কল্যাণ-সংস্কার-সম্পন্ন বীর পুত্রকন্যাগণ উদ্ভূত হইতে থাকিবে, সেই দিন হইতেই ইতিহাসে ভারতের যথার্থ গৌরবের অবতারণা লিখিত হইতে আরম্ভ করিবে। সমসাধক পিতামাতার সাধনজাত ও সঙ্কল্প-প্রসূত সন্তান-সন্ততিরা যেদিন ভারতের বুকে তাঁহাদের তরুণ চরণের অঙ্কপাত করিবেন, সেদিন পিতামাতার তপঃসাধনার অমৃতময় ফলই ইহাদিগকে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান, পার্শী ও শিখের পার্থক্য উপেক্ষা করিতে সামর্থ্য দান করিবে—হিন্দু হিন্দু থাকিয়াই সেই মহাজাতিভুক্ত হইবেন, মুসলমান ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই জাতীয় শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিবেন, খ্রীষ্টান নিজস্বতা বিসর্জ্জন না দিয়াই ভারতীয় মহাজাতির মহিমাকে জাগাইয়া তুলিবেন; অপর দিকে রাজনীতি নিজেকে ভগবানের বিদ্রোহী বলিয়া ভাবিতে অক্ষম হইবে, বিবেকের সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিরোধ অপসারিত হইবে, ধর্ম্মের সহিত স্বাদেশিকতার কলহের অবসান ঘটিবে।

সাধনধর্ম্মের অকপট ঐক্য অনুশীলনের সুদূর ফল

দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের বহুপূর্ব্বেই স্বামিপত্নীর সাধনধর্ম্মের ঐক্য সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, এমন কি বিবাহের অল্প কিছুদিনের মধ্যে হইলেই ভাল হয়। স্বামী যদি বিবাহের বহুপূর্ব্ব হইতেই কোন একটী

নির্দ্দিষ্ট সাধনধর্ম্মকে অবলম্বনপূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে সাধন-পরায়ণ হইয়া থাকেন এবং দার-পরিগ্রহের পরে প্রথমতঃ ধারাবাহিক উপদেশাদি ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যাপনার দ্বারা নিজ ধর্ম্মমতে আস্থাবতী করিয়া তারপর সহধর্ম্মিণীকে স্বকীয় সাধন-ধর্ম্মে দীক্ষিত করান, তাহা হইলে অতি উত্তম হয়। জিতেন্দ্রিয় স্বামী ব্যতীত অপরের পক্ষে নিজ পত্নীকে নিজে দীক্ষাদান সুষ্ঠু নহে। কারণ, সেই সকল স্থলে পত্নীর জীবনে দীক্ষার উদ্দেশ্য এবং সুমঙ্গল প্রভাব অনেকটা বৃথা হইয়া যাইবারও আশঙ্কা আছে। এই জন্য স্বামী ও পত্নীর পক্ষে একই গুরুর আশ্রয় গ্রহণই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ব্যবস্থা। যেখানে বিবাহের পূর্ব্বেই বরকন্যা সদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, সেখানে বিবাহের পর উভয়ের বিভিন্ন সাধন-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উপযুক্ত গুরুর দ্বারা নূতন করিয়া অভিষিক্ত হইয়া লওয়া কোনো কোনো স্থলে প্রয়োজন হইতে পারে। রুচিপার্থক্য-নিবন্ধন যেখানে বিবাহের পরে বিভিন্ন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ-হেতু সাধন-ধর্ম্মে বিভিন্নতা জন্মিয়াছে, সেখানে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হইলে ইহাই ব্যবস্থা।

সাধনধর্ম্মের ঐক্য-স্থাপন বনাম দৈহিক সম্বন্ধ

কোন কোন সাধন-সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ স্বামীকেই গুরুর সমক্ষে বা গুরু-প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে নিজ নিজ পত্নীকে নিজে দীক্ষা দান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই দীক্ষাদান-কালে স্বামীকে সর্ব্বপ্রকার গুরুভাব বর্জ্জন করিয়া "তৎপ্রতিনিধিভাব" রক্ষা করিতে হয়। এ সকল স্থলে স্বামীর যিনি গুরু, স্ত্রীরও তিনিও গুরু।

স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর দীক্ষা

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা কতকটা গুরুশিষ্যার ন্যায় হইলেও সখাসখী-ভাবই এখানে প্রবল, গুরুশিষ্যার ভাব আনুষঙ্গিক মাত্র। পরন্তু, গুরু ও শিষ্যার মধ্যে প্রবৃত্তির আকর্ষণ থাকিতে পারে না, থাকিলে গুরুশিষ্যা-সম্বন্ধ জটিল হইয়া যায়। এইজন্য দীক্ষাকালে স্বামী ও পত্নী উভয়েই নিজ নিজ মন গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া দীক্ষা দান ও গ্রহণ করিবেন। স্বামী নিজের মধ্যে গুরুভাব রাখিলে পত্নীদেহ তাঁহার পক্ষে কন্যাদেহ হইবে। স্বামী সাধ্বী স্ত্রীর দৃষ্টিতে গুরুই বটেন, কিন্তু "ব্রহ্মদাতা-গুরু" এই ভাবটা স্বামীর প্রতি থাকিলে স্বামিদেহ তাহার পক্ষে পিতৃদেহ হইবে। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে দেহসম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইবে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে দেহ-সম্পর্ক থাকিতে পারে না, এমন কি ধর্ম্মের নাম দিয়াও না। এদেশে বহু সাধক-সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের নাম দিয়া গুরুশিষ্যাতে কদর্য্য সম্বন্ধ হইয়াছে, অশিক্ষিত মহলে চিরাচরণের বা গতানুগতিকতার নিয়মে এবং শিক্ষিত মহলে দার্শনিকতার আড়াল দিয়া রাগমার্গের দোহাই দিয়া এখনও কতস্থানে হইতেছে। কিন্তু একথা মনে রাখিতেই হইবে যে, ধর্ম্মার্থেও পিতাকন্যায় বা মাতাপুত্রে কামাচার চলিতে পারে না। লৌকিকভাবে গুরু ব্রহ্মদাতা পিতা, আর, শিষ্যা মানসী কন্যা। অলৌকিক-ভাবে গুরু ব্রহ্মের সহিত অভেদ পরমসত্তা, শিষ্যা-তাঁহার সাত্ত্বিকী উপাসিকা। লৌকিকভাবে গুরু ও শিষ্যার মধ্যে দেহসম্বন্ধ অকল্পনীয়, অলৌকিক-ভাবে গুরু, শিষ্যার মধ্যে তামসিক অনুরাগ অকল্পনীয়। শিষ্যার পক্ষে গুরুকে অদেয় কি আছে?

দীক্ষাকালীন চিত্তভাব

গুরুশিষ্যার ভাব ও দৈহিক সম্বন্ধ

গুরু ব্রহ্মদাতা পিতা, শিষ্যা মানসী কন্যা

শিষ্যা গুরুকে তাঁহার সবকিছু দিতে পারেন, কিন্তু পারেন না শুধু তাহা দিতে, যাহা সাত্ত্বিকতাবিহীন। এইজন্য শিষ্যা গুরুকে তাঁহার দেহ দান করিতে পারেন না। এমন কি, সাত্ত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দেহের আদান-প্রদান চলিতে পারে না। কারণ, সাত্ত্বিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কামাচার সিদ্ধ-সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব হইলেও, যাহা কামাচার, তাহা কখনও কামের অপবাদ হইতে মুক্ত হয় না। যেখানে দেহের ব্যাপার রহিয়াছে, সেখানে আধ্যাত্মিক অবস্থা যতই উন্নত হউক না কেন, গুরু-শিষ্য-ভাব-মূলক পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধা কিছুটা মলিন হইবেই। দেহ-সম্পর্কের দ্বারা কান্ত-কান্তা ভাব মলিন হয় না, বরঞ্চ স্থলবিশেষে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়, যেহেতু অপত্যোৎপাদন হউক আর না হউক, সহবাস-সংযোগ ও শুক্রাধানের দ্বারা স্ত্রীদেহ পুরুষদেহের আংশিক সগুণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা গুরুভাব অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ে এবং কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা এই মালিন্য বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা গুরু এবং শিষ্য উভয়ের ক্ষতি সাধন করে। কারণ, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ পাঠশালার শিক্ষক আর পড়ুয়ার সম্বন্ধ নহে। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের একটা পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা আছে, যাহা সাধন-ভজন করিতে করিতেই ক্রমে উপলব্ধ হয়, কোনও প্রকার যুক্তিতর্ক, আলোচনা বা বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা ঠিক বুঝা বা বুঝান যায় না। সাধক গুরু সাধনেচ্ছু শিষ্যের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন, একথা আমরা সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকি। অনেকে এই কথাটীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইয়া ইহাতে অবিশ্বাসও করিয়া থাকেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও ব্যাপার প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান-

দেহ-সম্পর্ক ও কান্ত-কান্তা-ভাব

লাভের যতগুলি উপায় আছে, সেইগুলিকে যথাযথ ভাবে অবলম্বন করিয়া ধৈর্য্য সহকারে কাল-প্রতীক্ষা না করিলে অবিশ্বাস করিবার যথার্থ ও পূরাপূরি স্বত্ব জন্মে না, ইহাও যুক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। শক্তিমান্ গুরু নিজ মঙ্গলেচ্ছা দ্বারা, অকপট হিতৈষণা দ্বারা, নিঃস্বার্থ আশীর্ব্বাদের দ্বারা শিষ্যকে শক্তিমান্ করিয়া থ কেন। ত্যাগ ও সাধনার দ্বারা তিনি যে ঈশ্বর-কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাহা অদৃশ্য সূক্ষ্মগতিতে শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেই শক্তি শিষ্যের সুপ্ত আত্মায় প্রচ্ছন্ন থাকে, একমাত্র সাধন-ভজনের দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। যখন ইহা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখনই গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় হয়। সম্বন্ধটা এত মধুর এবং এত উচ্চ যে, ইহার আস্বাদন পাইয়া যাঁহারা গুরুস্তোত্র লিখিয়াছেন, তাঁহারা গুরুকে একেবারে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

শক্তিমান্ গুরু ও শক্তিমান্ শিষ্য

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা-সাক্ষিভূতং,
ভাবাতীত ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।

অর্থাৎ সেই গুরুকে প্রণাম করি, যিনি সৎ, যিনি নিত্য অস্তিত্বশীল, যাঁহার ধ্বংস নাই। তিনি কেমন? না,—তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি ব্রহ্মের স্বয়মনুভূত আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মতে সমাহিতচিত্ত হইলে যে অকথনীয় আনন্দের উদ্ভব হয়, তিনি তৎস্বরূপ। তিনি কেমন? না,—তিনি সুখদাতা, যে সুখের উপরে আর সুখ নাই বা থাকিতে পারে না, তেমন পরম সুখের দাতা; যে সুখের পর অনিবার্য্যরূপে দুঃখ আসে,

গুরু-স্তোত্রের বিশদ ব্যাখ্যা

সেই ক্ষণস্থায়ী সুখ নহে, পরন্তু যে সুখ দুঃখলেশহীন, যাহা নিমেষে ফুরাইয়া যায় না, জলবুদ্বুদের মতন কটাক্ষে লয় পায় না, তেমন সুখের দাতা। তিনি কেমন? না,—তিনি কেবল, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি একমাত্র, তিনি ছাড়া আর কেহ নাই, তিনি ছাড়া আর কেহ ছিল না, তিনি ছাড়া আর কেহ থাকিতে পারে না, তিনি ছাড়া আর কেহ থাকিবে না, এক তাঁহাকে পাইলেই কৈবল্য-লাভ। তিনি কেমন? না,—জ্ঞানই তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার অন্য কোনও মূর্ত্তি নাই; তবু যদি কোনও মূর্ত্তি কল্পনা কর, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ মূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার প্রকাশকে জ্ঞানযোগে অনুভব না করিতেছ, ততক্ষণ উহা তাঁহার মূর্ত্তি নহে, ততক্ষণ উহা সত্য নহে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি অনুভব করিলে, তিনি এখানে আছেন, এইখানে তাঁহার অসীম সত্তা সসীমের মধ্য দিয়াও প্রকাশিত হইতেছে, তন্মুহূর্ত্তে উহা তাঁহার মূর্ত্তি হইল, ইট-পাথর তাঁহার মূর্ত্তি হইল, মানুষ-গরু তাঁহার মূর্ত্তি হইল, প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয় তাঁহার মূর্ত্তি হইল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মূর্ত্তি হইল। কারণ, জ্ঞানই তাঁহার মূর্ত্তি এবং তোমার ব্রহ্মজ্ঞান এই সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, পারদ যেমন করিয়া স্বর্ণের অণুপরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পারদীকৃত করিয়া ফেলে, তেমনি তোমার ব্রহ্মজ্ঞান নিখিল বিশ্বের অংশবিশেষের বা সমগ্রত্বের অণুপরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ব্রহ্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি কেমন? না,—তিনি সকল দ্বন্দ্বের অতীত, সকল বিরোধের উর্দ্ধে, সকল ভেদাভেদ-বুদ্ধির সীমারেখা অতিক্রম করিয়া। সসীমের সহিত অসীমের যে দ্বন্দ্ব, সুখের সহিত দুঃখের যে দ্বন্দ্ব, আলোকের সহিত অন্ধকারের যে দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বের সহিত অনস্তিত্বের যে দ্বন্দ্ব, জীবনের সহিত মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব, তিনি এই সকল

যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরপারে অবস্থিত, ইহারা তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। তিনি কেমন ?—না, গগন-সদৃশ। আকাশ যেমন অনন্ত ও উদার এবং আকাশ যেমন ধ্বনির মূল এবং প্রকাশক, তেমনই তিনি অনন্ত ও উদার এবং সর্ব্বমন্ত্রের মূল এবং প্রকাশক। আকাশ দীন-ধনী সকলের গৃহছাদের উপর দিয়া উদার চন্দ্রাতপ বিছাইয়া রাখিয়াছে, আকাশ হইতে পরমনাদ ওঁকার-মহামন্ত্র উত্থিত হইতেছে, জীবের কর্ণাভ্যন্তরস্থ আকাশই উহার প্রতিস্পন্দন গ্রহণ করিতেছে। তিনি ঠিক এমনই উদার, তিনি ঠিক এমনই মন্ত্রমূল। তিনি কেমন ? —না, তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্য। ব্রহ্মবাদী ঋষি শিষ্যকে উপদেশ করিবার কালে বলিয়া থাকেন,—"হে শিষ্য, তৎ ত্বম্ অসি, তুমিই সেই, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই নিষ্কল নিরঞ্জন পরম-মহেশ্বর, তুমিই পরমপুরুষ।" এই সকল মহাবাক্যযোগে যে শাশ্বত সনাতন পরমদেবতার কথা বলা হইতেছে, তিনি তাহাই। তিনি কেমন ?—না, শত সহস্র রূপে প্রকটিত হইলেও তিনি বহু নহেন, তিনি এক। জ্ঞানীরা বিভিন্ন জনে তাঁহাকে বহুরূপে বলিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি একই আছেন। বহুজনে তাঁহার বহুরূপে স্তুতি করিয়াছেন, বহুজনে তাঁহাকে বহুরূপে দর্শন করিয়াছেন, বহুজনে তাঁহাকে পাইবার বহু পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে বহু নহেন, তিনি এক। তিনি কেমন ?—না, তিনি নিত্য, অতীত কালেও ছিলেন, বর্ত্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন, তাঁহার বিনাশ নাই। তিনি কেমন ?—না, তিনি বিমল, সর্ব্বপ্রকার মল বা পাপ হইতে মুক্ত, তিনি নির্ম্মল, তিনি নিত্যশুদ্ধ, তিনি অপাপবিদ্ধ। তিনি অচল, তিনি অচঞ্চল, তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি শান্ত। তিনি কেমন ?—না, তিনি আমার সকল চিন্তা ও চেষ্টার নিয়ত সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া

আমার বুদ্ধি চলিতে পারে না, তাঁহার লক্ষ্যের অগোচরে কোনও ভাব ও কর্ম্ম সম্ভব নহে। তিনি কেমন ?—না, ভাবাতীত। সাধ্য কি মানবের যে চিন্তা দ্বারা তাঁহার সীমা-পরিসীমা করিবে ? মানুষের বাক্য তাঁহাকে বিচার করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে, কিন্তু বিচার করা আর হইয়া উঠিবে না। মানুষের মেধা, মানুষের মনীষা অনন্ত উর্দ্ধে স্থিত তাঁহার তত্ত্বকে না পাইয়া লজ্জাবনত-কন্ধরে মূক-ভাবেই অবস্থান করে। তিনি কেমন ?—না, ত্রিগুণরহিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে কিন্তু যুগপৎ তিনি গুণময় এবং নির্গুণভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া গুণত্রয় তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি এমনই অবর্ণনীয়, তিনি এমনই মহান্।

কামাচাররূপ মেঘ দ্বারা এই মধুর ও মহান্ তত্ত্ব আবৃত হয়, তাই মধ্যাহ্নকালেও সূর্য্য-কিরণ সাধকের জীবনকে আলোকিত করে না। তাই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে হইবে। এইজন্যই দীক্ষাদান ও গ্রহণকালে স্বামীর গুরুভাব এবং পত্নীর গুরুশ্রদ্ধা এই উভয়ই স্বামীর যিনি গুরু, তাঁহার অথবা সম্প্রদায়ের যিনি আদি গুরু তাঁহার অথবা স্বয়ং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত থাকিবে। ইহাতেই পরিপূর্ণ সুফল লাভ হইবে।

গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের নিষ্কামতা

সাধন-ভজন করিতে করিতে ভাগ্যবতী পত্নীর এমন অবস্থা আসিতে পারে যে,—

(১) গুরুদেবের,
(২) স্বামীর,
(৩) মন্ত্রের,

(৪) ব্রহ্মের,

(৫) নিজের,

মধ্যেই ইষ্টস্ফূর্ত্তি পাইবে। পাঁচটী স্থানে ইষ্টস্ফূর্ত্তি হইলেও ব্যবহারিক ভাবে পাঁচটী বিষয়ে পত্নী পাঁচটী পৃথক্ আচার পালন করিবেন। গুরুতে অর্থাৎ নিজের বা স্বামীর দীক্ষাদাতাতে ইষ্টভাব জন্মিলেও তাঁহার প্রতি ব্যবহার কন্যার মতই থাকিবে। স্বামীতে ইষ্টভাব জন্মিলেও মন্ত্রের ব্যবহার গোপনই থাকিবে। সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে ইষ্টভাব জন্মিলেও সীমাবদ্ধভাবে ব্রহ্মোপাসনার যে সব নিরপরাধ প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রতিবাদহীন হইতে হইবে। নিজেতে ব্রহ্মভাব জাগিলেও অপরের নিকটে কুলবধূর যোগ্যমতই চলিতে হইবে। গুরুতে ইষ্টভাব জাগিলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা সম্ভব হয়, তখন আর কিছু অদেয় থাকে না।

সাধনবতী
কুলবধূর
পঞ্চভাব
ও
লোকাচার

কিন্তু কন্যা যাহা মনে মনে বা প্রকাশ্যে পিতাকে দান করিতে পারেন, গুরুকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ জানিলেও শিষ্যা শুধু তাহাই দিবেন। গুরুদেবকে ইহার অতিরিক্ত কিছু দিবার আকূতি অন্তরে জাগিলে সঙ্গে সঙ্গে এই কথা ভাবিয়া সতর্ক হইয়া যাইতে হইবে যে, নিশ্চয়ই হিসাবের মধ্যে কোথাও কোনও একটা গোঁজামিল ঢুকিয়া গিয়াছে। অকপট সাধিকার মনের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের এমন একটা তাগিদ এই সময়ে জাগিয়া যায়, যাহার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া অনেক উন্নতচেতা ঊর্দ্ধচারী শক্তিমান্ গুরুকেও নীচে নামিয়া আসিয়া অসত্যের সহিত আপোষ করিতে দেখা যায়, প্রতারণার সাহায্য লইতে হয়। সাধিকা যতই অকপট-প্রেমিকা হইবেন, তাঁহার বাহ্য আচারে, সামাজিক ব্যবহারে এবং শারীরিক

গুরুতে ইষ্টভাব

শুচিতায় তাঁহাকে ততই সংযত ও সংহত থাকিতে হইবে। এই দুইটী ব্যাপারের মধ্যে একটুকু স্ববিরোধী ভাব আছে ইহা সত্য কিন্তু নিজের একক এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে চাহিয়া এখানে ভাবস্থ হইয়াও অপ্রমত্ত থাকিতে হইবে। স্বামীতে ইষ্টভাব জন্মিলে কামভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, দেহসুখ প্রার্থনাতীত হইয়া যায়, লোলুপতা নাশ পায়, কিন্তু স্বামীর সহিত যে সকল ব্যবহার লোককল্যাণার্থ প্রয়োজন, স্বামীকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ জানিলেও পত্নী তাহার অবিরোধী থাকিবেন। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ বিবাহিত নারী ও পুরুষের পক্ষে কেবল তাহার পারিবারিক কর্ত্তব্যই নহে, ইহার মধ্যে একদিকে যেমন আত্মিক ঐক্য-সাধনের ইঙ্গিত রহিয়াছে, অপরদিকে তেমন বিশাল পৃথিবীর ব্যাপক কর্ত্তব্যেরও আহ্বান বিদ্যমান। তাই, সাধনা-নিমগ্না বিবাহিতা নারী কেবল যোগিনীই হইবেন এবং এইখানেই তাহার সার্থকতা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে, এমন নহে। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে এই নির্দ্দেশের ব্যাপকতা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। উন্নত উপলব্ধির সহিত পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যকে অবিরোধ রাখিয়া চলিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। একটীকে অপরটীর অনুপূরক করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। দুর্ব্বলতার সহিত আপোষ করিয়া নহে, দুর্ব্বলতা জয় করিয়াই জীবন-যাত্রার জয়ধ্বনি-মুখরিত রথ প্রবল প্রতাপে চালাইতে হইবে। গুরুদেব কৃপা করিয়া যে মহামন্ত্র স্বামীকে দিয়াছেন এবং গুরুর আদেশক্রমে তাঁহারই আশীর্ব্বাদ সহ স্বামী বাহকরূপে (গুরুরূপে নহে) যাহা স্ত্রীকে পরিবেশন করিয়াছেন, অথবা গুরুদেব স্বয়ং যাহা শিষ্যাকে দিয়াছেন সেই মহামন্ত্রকেই ইষ্টস্বরূপ বুঝিলে মনে হয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া নামের রস-সম্ভোগ করি। ইচ্ছা করে,

স্বামীতে ইষ্টভাব

চতুর্দ্দিকে ইষ্টনাম লিখিয়া রাখি, যেন যেদিকে নয়ন পড়ে, সেই দিকেই ইষ্টনাম দেখিতে পাই। ইচ্ছা করে, জগৎ ভরিয়া সকলকে ডাকিয়া এই মহানাম কীর্ত্তন করিতে বলি, যেন শুনিয়া আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। ইচ্ছা করে, উচ্চৈঃস্বরে এই মহানাম কীর্ত্তন করিয়া রসনা সার্থক করি। ইচ্ছা করে, সর্ব্বাঙ্গে মহামন্ত্রের তিলক কাটিয়া সেই সুখস্পর্শ অনুভব করিয়া মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত-তনু হই। কিন্তু এই সাত্ত্বিক পিপাসাকে নিবারিত করিয়া একমাত্র মন দিয়াই নামের সেবা করিতে হইবে। মন সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা। রাজা নিজে যদি ইষ্টনামের পরিচর্য্যা করেন, তবে চক্ষুকর্ণাদি ভৃত্যবর্গ সেবা না করিলেই বা কি যায় আসে? ইষ্টস্বরূপ যে মহামন্ত্র, তাহাকে অন্তরে অন্তরে গোপন করিয়া রাখিতে হইবে, নিবিড়-তম প্রকোষ্ঠে প্রাণযোগে পূজা করিতে হইবে।

মহামন্ত্রে ইষ্টভাব

সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে ইষ্টভাব জন্মিলে আর সীমাবদ্ধভাবে মূর্ত্তি গড়িয়া বা পট আঁকিয়া উপাসনার প্রতি চিত্ত আসক্ত হয় না। তখন মনে হয়, এই সকল ছেলে-খেলা মাত্র, অবোধ শিশুর দুই দণ্ডের জন্য মন ভুলাইয়া সংসার-দুঃখ হইতে সাময়িক মুক্তি পাইবার ফন্দী মাত্র। তখন মনে হয়, আমার প্রাণের প্রাণ জগজ্জননীর আবার আবাহনই বা কি, বিসর্জ্জনই বা কি, তাঁহার পূজা করিবার আবার সময়ই বা কি, অসময়ই বা কি? কিন্তু এমন শ্লাঘ্য উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াও, যাহারা এ উচ্চভাবের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ নহে, এমন ব্যক্তিদের নিকট মৌনী থাকিতে হইবে।

ব্রহ্মে ইষ্টভাব

আর, নিজেতে ইষ্টভাবের উন্মেষ হইলে ভেদাভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়, জাতিকুলের বিচার থাকে না, আচার-বিচার বাছিবার প্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু একই জীব ব্রহ্মভাবে এক, জীবভাবে আর। জীবজগতের

নিজেতে ইষ্টভাব

কল্যাণের জন্য ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াও তিনি, জীবভাবে যাহা আদর্শ-স্থানীয়, তেমন আচার পালন করিবেন এবং জীবভাবে যাহা অনর্হ অসদাচার, তাহা পরিহার করিবেন।

এই প্রসঙ্গে গুরুর প্রতি শিষ্যের অর্পিত মনোগতির একটা বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান যুগে গুরু ও শিষ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ পার্থিব স্বার্থের সংস্পর্শে আসিয়া এত পঙ্কিল ও মলিন হইয়াছে যে, জীবের হিতকামনায় দীক্ষামন্ত্র দিবার পরে আমরা ত তাহাদের স্পষ্ট করিয়া উপদেশ দিয়া দেই,—"বাবাহে, মন্ত্র পাইলে, সাধন-প্রণালী পাইলে, আমাদের প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ পাইলে, এখন মন্ত্রকেই একমাত্র গুরু জানিয়া আমাদের সম্পর্কে মনের সকল প্রত্যাশা ও হতাশা ত্যাগ করিয়া, আমাদের সম্পর্কে অন্তরের সকল অনুরাগ ও বিরাগ বর্জ্জন করিয়া, আমাদের সুপ্রভাব ও অপপ্রভাবের বাহিরে নিজ জীবনকে ধরিয়া লইয়া তারপরে বীরবিক্রমে সাধন করিয়া যাও; আমরা তোমার কেহই নহি, আমরা জগতে কিছুই নহি, মন্ত্রই তোমার সব, মন্ত্রই তোমার আপন, মন্ত্রই তোমার আশ্রয়, মন্ত্রই তোমার পরমধন।" যুগের প্রয়োজনে এইভাবে আমরা আত্মবিলোপ করিয়া দেওয়ার পথ গ্রহণ করিয়াছি।

গুরুর প্রতি শিষ্যের মনোগতির বিশ্লেষণ

অথচ সত্যিকারের গুরু এক আশ্চর্য্য চুম্বক-শক্তি। মানুষ তাঁহার কাছে আসিবার সময় পঞ্চরসেরই পরিপূর্ণ আস্বাদন পায়। তিনি পিতা, তিনি পুত্র, তিনি মাতা, তিনি কন্যা, তিনি ভ্রাতা তিনি সখা, তিনি ঐশ্বর্য্যময় পরমবিগ্রহ তিনি পতি, তিনি সর্ব্বজীব-জীবনাধীশ্বর। তিনি পত্নী, এই ভাবের সহিত গুরুতে অর্পিত অনুরাগের কোনও বর্গ নাই, কারণ এই

গুরুশিষ্যের ভাগবত আস্বাদন

চতুর্দ্দিকে ইষ্টনাম লিখিয়া রাখি, যেন যেদিকে নয়ন পড়ে, সেই দিকেই ইষ্টনাম দেখিতে পাই। ইচ্ছা করে, জগৎ ভরিয়া সকলকে ডাকিয়া এই মহানাম কীর্ত্তন করিতে বলি, যেন শুনিয়া আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। ইচ্ছা করে, উচ্চৈঃস্বরে এই মহানাম কীর্ত্তন করিয়া রসনা সার্থক করি। ইচ্ছা করে, সর্ব্বাঙ্গে মহামন্ত্রের তিলক কাটিয়া সেই সুখস্পর্শ অনুভব করিয়া মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত-তনু হই। কিন্তু এই সাত্ত্বিক পিপাসাকে নিবারিত করিয়া একমাত্র মন দিয়াই নামের সেবা করিতে হইবে। মন সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা। রাজা নিজে যদি ইষ্টনামের পরিচর্য্যা করেন, তবে চক্ষুকর্ণাদি ভৃত্যবর্গ সেবা না করিলেই বা কি যায় আসে? ইষ্টস্বরূপ যে মহামন্ত্র, তাহাকে অন্তরে অন্তরে গোপন করিয়া রাখিতে হইবে, নিবিড়-তম প্রকোষ্ঠে প্রাণযোগে পূজা করিতে হইবে।

মহামন্ত্রে ইষ্টভাব

সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে ইষ্টভাব জন্মিলে আর সীমাবদ্ধভাবে মূর্ত্তি গড়িয়া বা পট আঁকিয়া উপাসনার প্রতি চিত্ত আসক্ত হয় না। তখন মনে হয়, এই সকল ছেলে-খেলা মাত্র, অবোধ শিশুর দুই দণ্ডের জন্য মন ভুলাইয়া সংসার-দুঃখ হইতে সাময়িক মুক্তি পাইবার ফন্দী মাত্র। তখন মনে হয়, আমার প্রাণের প্রাণ জগজ্জননীর আবার আবাহনই বা কি, বিসর্জ্জনই বা কি, তাঁহার পূজা করিবার আবার সময়ই বা কি, অসময়ই বা কি? কিন্তু এমন শ্লাঘ্য উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াও, যাহারা এ উচ্চভাবের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ নহে, এমন ব্যক্তিদের নিকট মৌনী থাকিতে হইবে।

ব্রহ্মে ইষ্টভাব

আর, নিজেতে ইষ্টভাবের উন্মেষ হইলে ভেদাভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়, জাতিকুলের বিচার থাকে না, আচার-বিচার বাছিবার প্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু একই জীব ব্রহ্মভাবে এক, জীবভাবে আর। জীবজগতের

নিজেতে ইষ্টভাব

কল্যাণের জন্য ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াও তিনি, জীবভাবে যাহা আদর্শ-স্থানীয়, তেমন আচার পালন করিবেন এবং জীবভাবে যাহা অনর্হ অসদাচার, তাহা পরিহার করিবেন।

এই প্রসঙ্গে গুরুর প্রতি শিষ্যের অর্পিত মনোগতির একটা বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান যুগে গুরু ও শিষ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ পার্থিব স্বার্থের সংস্পর্শে আসিয়া এত পঙ্কিল ও মলিন হইয়াছে যে, জীবের হিতকামনায় দীক্ষামন্ত্র দিবার পরে আমরা ত তাহাদের স্পষ্ট করিয়া উপদেশ দিয়া দেই,—"বাবাহে, মন্ত্র পাইলে, সাধন-প্রণালী পাইলে, আমাদের প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ পাইলে, এখন মন্ত্রকেই একমাত্র গুরু জানিয়া আমাদের সম্পর্কে মনের সকল প্রত্যাশা ও হতাশা ত্যাগ করিয়া, আমাদের সম্পর্কে অন্তরের সকল অনুরাগ ও বিরাগ বর্জ্জন করিয়া, আমাদের সুপ্রভাব ও অপপ্রভাবের বাহিরে নিজ জীবনকে ধরিয়া লইয়া তারপরে বীরবিক্রমে সাধন করিয়া যাও; আমরা তোমার কেহই নহি, আমরা জগতে কিছুই নহি, মন্ত্রই তোমার সব, মন্ত্রই তোমার আপন, মন্ত্রই তোমার আশ্রয়, মন্ত্রই তোমার পরমধন।" যুগের প্রয়োজনে এইভাবে আমরা আত্মবিলোপ করিয়া দেওয়ার পথ গ্রহণ করিয়াছি।

গুরুর প্রতি শিষ্যের মনোগতির বিশ্লেষণ

অথচ সত্যিকারের গুরু এক আশ্চর্য্য চুম্বক-শক্তি। মানুষ তাঁহার কাছে আসিবার সময় পঞ্চরসেরই পরিপূর্ণ আস্বাদন পায়। তিনি পিতা, তিনি পুত্র, তিনি মাতা, তিনি কন্যা, তিনি ভ্রাতা তিনি সখা, তিনি ঐশ্বর্য্যময় পরমবিগ্রহ তিনি পতি, তিনি সর্ব্বজীব-জীবনাধীশ্বর। তিনি পত্নী, এই ভাবের সহিত গুরুতে অর্পিত অনুরাগের কোনও বর্গ নাই, কারণ এই

গুরুশিষ্যের ভাগবত আস্বাদন

ভাব অধোগতি-বিধায়ক এবং গুরুর গৌরবনাশক।

পুত্রার্পিত, কন্যার্পিত, দারার্পিত ভাবের পার্থক্য

পুত্রের প্রতি, কন্যার প্রতি বা পত্নীর প্রতি অর্পিত ভাবমাত্রেই নিম্নগামী স্নেহ। পুত্র বা কন্যার প্রতি স্নেহ নিম্নগ হইলেও, তাহাকে অধ্যাসের বলে অতি সহজে দেহাতীত আধ্যাত্মিক উল্লাসে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু পত্নীর প্রতি অর্পিত স্নেহের রীতিই ইহা যে, যৌন সংসর্গ দ্বারা সেই স্নেহ ম্লান না হইয়া উজ্জ্বলতর, প্রগাঢ়তর ও গভীরতর হয়। এই কারণে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও স্থানে ঈশ্বরে পত্নীভাব আরোপ সফল হয় নাই এবং গুরুতে অর্পিত ভাবের মধ্যেও ইহার স্থান নাই। কিন্তু গুরুকে পিতা, মাতা, কন্যা, পতি, প্রভু প্রভৃতি সকল ভাবেই অর্চ্চনা স্বাভাবিক। কাহারও প্রতি পতিভাব হইলে, দেহসংস্পর্শ হইতে নিজেকে দূরে রাখিলেও প্রগাঢ় ধ্যানের দ্বারা পতিভাবকে সমুজ্জ্বল করা সম্ভব। কারণ, পতিভাবের নিকটে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হইতেছে নিজ স্থূলবুদ্ধতার প্রতি একেবারেই উদাসীন হওয়া। সতী পতির ইচ্ছার নিকটে নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ফেলিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিলে পতির সহিত তাহার দৈহিক মিলনের অভাব তাহার অন্তরের প্রেম-সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারে না। কাহারও উপরে পত্নীভাব তাহার উপরে নিজ অধিকার-স্থাপন-মূলক, কিন্তু কাহারও উপরে পতিভাব তাহার সম্পর্কে নিজ অধিকারের সঙ্কোচক। এইজন্যই কাহারও উপরে পত্নীভাব যেমন অন্তরের অবনতি-বিধায়ক, পতিভাব সকল সময়ে তদ্রূপ নহে। এইজন্যই গুরুতে পতিভাব আরোপ বিরল নহে। শিষ্যের অজানিতে পিতা, পুত্র, পতি প্রভৃতি সকল ভাবই যুগপৎ গুরুর প্রতি শিষ্যের অন্তরে বিকশিত হয় এবং সকল ভাবেরই সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার গুরুভক্তি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া

থাকে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে ইহা একটা উপলব্ধি-লব্ধ সত্য। গুরুবাদ ভিত্তিহীন প্রাসাদ বা অমূল তরু কিনা, তাহা নিয়া তর্কের অবকাশ থাকিতে পারে কিন্তু গুরুতে অর্পিত শিষ্যের সম্যক্ পরিপুষ্ট শ্রেষ্ঠ ভাব যে সর্ব্বভাবের সমন্বয় ও পঞ্চরসের আশ্রয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনুষ্য-শরীর রক্ষণের জন্য যতগুলি মৌলিক খাদ্য প্রয়োজন, তাহাদের প্রত্যেকটীর সুসমঞ্জস মিশ্রণ যেমন দুগ্ধে,—বৃক্ষ-শরীর রক্ষার জন্য যতগুলি মৌলিক খাদ্য প্রয়োজন, তাহাদের প্রত্যেকটীর সুসমঞ্জস মিলন যেমন গোময়ে, জগতের সকল নদীর মিলন যেমন মহাসমুদ্রে, জগতের সকল বর্ণের মিলন যেমন শ্বেতবর্ণে, জগতের সকল মন্ত্রের মিলন যেমন ওঙ্কারে, ঠিক তেমনই শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সকল রসের মিশ্রণ হইতেছে গুরুতে অর্পিত এই ভক্তিতে। কেহ যদি বলেন, ইহার মধ্যে সকল ভাবই আছে কিন্তু কান্ত-ভাব নাই, তবে তিনি ভ্রান্ত। সাধারণ দৃষ্টিতে গুরু উপদেষ্টা বা পথপ্রদর্শক মাত্র এবং দীক্ষাদান ও উপদেশ প্রদানের দ্বারা তাঁহার কর্ত্তব্যের ইতি হইয়া যায়।

গুরুতে অর্পিত ভাবের স্বরূপ

কিন্তু উপলব্ধিমান্ সাধকের দৃষ্টিতে তিনি দীক্ষাদানের দ্বারা শিষ্যের দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে, শিষ্যের মনের প্রতি পরতে, শিষ্যের প্রাণের প্রতি স্পন্দনে নিজ সত্তার বিস্তার-সাধন করেন। ইহা দ্বারা তিনি যুগপৎ এবং একাধারে পিতা, পুত্র, পতি প্রভৃতি সকল কুটুম্ব হইয়া যান। গুরু আর বিশ্বপতি তখন এক হইয়া যায়। আমরা যুক্তি দিয়া এই অভিন্নত্বকে ঠেকাইয়া রাখি মাত্র কিন্তু উপলব্ধির মুখে যুক্তি গলিয়া জল হইয়া সরিয়া পড়ে। বিশ্বপতি পিতা হইয়াও পতি, পুত্র হইয়াও পতি, সখা হইয়াও পতি, পতিরও পতি,

Ceated by Mukherjee TK,Dhanbad

গুরু বিশ্বপতি, বিশ্বপিতা, বিশ্বপুত্র

পত্নীরও পতি, মাতারও পতি, পিতারও পতি, কন্যারও পতি, স্নুষারও পতি, তিনি একা এবং আলাদা করিয়া ধরিয়া খণ্ডশঃ কাহারও পতি নহেন, তিনি সকলকে লইয়া সামগ্রিক ভাবে পতি। এইরূপে গুরুভাবের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে যে কান্তভাব রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বকলুষবর্জ্জিত, স্বচ্ছ এবং সুন্দর। তাহাতে অসামঞ্জস্যও নাই, প্রতিক্রিয়াও নাই। তাহা সহজাত ও স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণে কান্তভাব অর্পণ করিয়া নিজেকে শ্রীরাধা জ্ঞান করতঃ আত্মসুখ-লোভলিপ্সাহীন অপূর্ব্ব এক কান্তাভাব নিজেতে আরোপ করিয়া মধুর-রসের সাধনার পথ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তিমার্গী বৈষ্ণবকুলের মধ্যেও ইহা অনর্পিতচরী ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার মূল কৃত্রিম রসাভাসে নহে। ইহা ভক্তের অর্পিত ভক্তির ভিতরেই সুপ্রচ্ছন্ন স্বাভাবিক এক বৃত্তি বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুভূতিতে ইহা উজ্জ্বল হইয়াছিল এবং তৎপরিকরবৃন্দের অনুশীলনে ইহা স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু গুরু বিশ্বপতি হইয়াও বিশ্বপিতা, বিশ্বপিতা হইয়াও বিশ্বপুত্র, বিশ্বপুত্র হইয়াও বিশ্বসখা। আবার তিনি বিশ্বসখা হইয়াও বিশ্বদাস। প্রভু হইয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, তিনি শিষ্যের সেবা করিয়া সার্থক হইবার জন্যও ব্যাকুল। তাই তাঁহাতে সর্ব্বরসের, সর্ব্বভাবের, সর্ব্ব আস্বাদনের সমন্বয়। ভগবান্‌কে মানুষ সাধারণতঃ চোখে দেখে না বলিয়াই গুরুর ভিতরে তাঁহাকে বারংবার অন্বেষণ করে।

গুরুতে অর্পিত ভক্তিভাবের ভিতরে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় এবং অতি সূক্ষ্মভাবে কান্ত-ভাব (অর্থাৎ পতির প্রতি অর্পিত সতী নারীর মনোভাব) বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই যুগে যুগে শিষ্যেরা গুরুর আদেশ পালন

গুরুতে কান্তভাব

করিবার জন্য কত অসাধ্য সাধিতেছে। পিতার আদেশ পুত্র-কন্যারা পালন করে, পিতৃভক্তিবশতঃ। মাতার আদেশ পুত্র-কন্যারা পালন করে, মাতার প্রতি অনুরাগবশতঃ। সখার অনুরোধ সখা রক্ষা করে, সখার প্রতি প্রীতিবশতঃ। সেবকের প্রার্থনা প্রভু পূরণ করেন, সেবকের প্রতি দয়াবশতঃ। পতির আদেশ পত্নী পালন করে, নিজেকে পতিরই জিনিষ জানিয়া, নিজের উপরে নিজের কোনও স্বত্বাধিকার নাই জানিয়া, পতির অভিলাষ-পূরণেই স্ত্রীর স্ত্রীত্ব,—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ। পৃথিবীতে যতস্থানে শিষ্যকে গুরুর অভিপ্রায় পূরণে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্র পতির প্রতি সতীর এই ভাবটীই শিষ্যের মনে প্রতিফলিত রহিয়াছে। এই জন্যই বড় বড় ত্যাগ তাহারা অবাধে করিতে পারিয়াছে। আবার এই কান্তভাব অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে বলিয়াই শক্তিহীন দুর্ব্বল ক্ষুদ্রাধার গুরুনামধারীরা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া বা নানা অপশাস্ত্র রচনা করিয়া সমাজে নানারূপ আপত্তিজনক আচরণ ও প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে বৃষোৎসর্গের উৎসর্গীকৃত ষণ্ডের ন্যায় উন্নত কন্ধরে চরিয়া বেড়াইতেছে। সরলমতি নরনারীর

অযোগ্য গুরু

বিশেষ করিয়া নারীদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন কান্তভাবকে নানা অপকৌশলের দ্বারা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে স্থূল যৌনমূর্ত্তি প্রদান করিয়া গুরুনামধারী অযোগ্য ব্যক্তিরা এমন সকল অকাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে যে, সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির অফুরন্ত লিপ্সা অন্তরে পোষণ করেন, এমন বহু ব্যক্তি গুরুকরণে

দীক্ষায় অবিশ্বাসের কারণ

বা দীক্ষাগ্রহণে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন। এই কারণে বিবাহিত দম্পতীর মধ্যেও বাহিরের কাহাকেও গুরু স্বীকার করিয়া তাহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণে অরুচি ঘটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

গুরু বিশ্বপতি, বিশ্বপিতা, বিশ্বপুত্র

পত্নীরও পতি, মাতারও পতি, পিতারও পতি, কন্যারও পতি, স্নুষারও পতি, তিনি একা এবং আলাদা করিয়া ধরিয়া খণ্ডশঃ কাহারও পতি নহেন, তিনি সকলকে লইয়া সামগ্রিক ভাবে পতি। এইরূপে গুরুভাবের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে যে কান্তভাব রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বকলুষবর্জ্জিত, স্বচ্ছ এবং সুন্দর। তাহাতে অসামঞ্জস্যও নাই, প্রতিক্রিয়াও নাই। তাহা সহজাত ও স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণে কান্তভাব অর্পণ করিয়া নিজেকে শ্রীরাধা জ্ঞান করতঃ আত্মসুখ-লোভলিপ্সাহীন অপূর্ব্ব এক কান্তাভাব নিজেতে আরোপ করিয়া মধুর-রসের সাধনার পথ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তিমার্গী বৈষ্ণবকুলের মধ্যেও ইহা অনর্পিতচরী ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার মূল কৃত্রিম রসাভাসে নহে। ইহা ভক্তের অর্পিত ভক্তির ভিতরেই সুপ্রচ্ছন্ন স্বাভাবিক এক বৃত্তি বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুভূতিতে ইহা উজ্জ্বল হইয়াছিল এবং তৎপরিকরবৃন্দের অনুশীলনে ইহা স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু গুরু বিশ্বপতি হইয়াও বিশ্বপিতা, বিশ্বপিতা হইয়াও বিশ্বপুত্র, বিশ্বপুত্র হইয়াও বিশ্বসখা। আবার তিনি বিশ্বসখা হইয়াও বিশ্বদাস। প্রভু হইয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, তিনি শিষ্যের সেবা করিয়া সার্থক হইবার জন্যও ব্যাকুল। তাই তাঁহাতে সর্ব্বরসের, সর্ব্বভাবের, সর্ব্ব আস্বাদনের সমন্বয়। ভগবান্‌কে মানুষ সাধারণতঃ চোখে দেখে না বলিয়াই গুরুর ভিতরে তাঁহাকে বারংবার অন্বেষণ করে।

গুরুতে অর্পিত ভক্তিভাবের ভিতরে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় এবং অতি সূক্ষ্ম-ভাবে কান্ত-ভাব (অর্থাৎ পতির প্রতি অর্পিত সতী নারীর মনোভাব) বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই যুগে যুগে শিষ্যেরা গুরুর আদেশ পালন

গুরুতে কান্তভাব অনুরাগবশতঃ।

করিবার জন্য কত অসাধ্য সাধিতেছে। পিতার আদেশ পুত্র-কন্যারা পালন করে, পিতৃভক্তিবশতঃ। মাতার আদেশ পুত্র-কন্যারা পালন করে, মাতার প্রতি অনুরাগবশতঃ। সখার অনুরোধ সখা রক্ষা করে, সখার প্রতি প্রীতি-বশতঃ। সেবকের প্রার্থনা প্রভু পূরণ করেন, সেবকের প্রতি দয়াবশতঃ। পতির আদেশ পত্নী পালন করে, নিজেকে পতিরই জিনিষ জানিয়া, নিজের উপরে নিজের কোনও স্বত্বাধিকার নাই জানিয়া, পতির অভিলাষ-পূরণেই স্ত্রীর স্ত্রীত্ব,—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ। পৃথিবীতে যতস্থানে শিষ্যকে গুরুর অভিপ্রায় পূরণে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্র পতির প্রতি সতীর এই ভাবটীই শিষ্যের মনে প্রতিফলিত রহিয়াছে। এই জন্যই বড় বড় ত্যাগ তাহারা অবাধে করিতে পারিয়াছে। আবার এই কান্তভাব অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে বলিয়াই শক্তিহীন দুর্ব্বল ক্ষুদ্রাধার গুরুনামধারীরা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া বা নানা অপশাস্ত্র রচনা করিয়া সমাজে নানারূপ আপত্তিজনক আচরণ ও প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে বৃষোৎসর্গের উৎসর্গীকৃত ষণ্ডের ন্যায় উন্নত কন্ধরে চরিয়া বেড়াইতেছে। সরলমতি নরনারীর বিশেষ করিয়া নারীদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন কান্তভাবকে নানা অপকৌশলের দ্বারা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে স্থূল যৌনমূর্ত্তি প্রদান করিয়া গুরুনামধারী অযোগ্য ব্যক্তিরা এমন সকল অকাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে যে, সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির অফুরন্ত লিপ্সা অন্তরে পোষণ করেন, এমন বহু ব্যক্তি গুরুকরণে বা দীক্ষাগ্রহণে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন। এই কারণে বিবাহিত দম্পতীর মধ্যেও বাহিরের কাহাকেও গুরু স্বীকার করিয়া তাহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণে অরুচি ঘটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

অযোগ্য গুরু

দীক্ষায় অবিশ্বাসের কারণ

যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণে ও গুরুকরণে বিশ্বাসী নহেন, সেই সকল স্বামি-পত্নীর পক্ষেও নিজেদের রুচি অনুযায়ী একটা সাধন-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়া তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভে চেষ্টিত হওয়া উচিত। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনাই উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে, সাধনই প্রথম এবং প্রধান কথা। দার্শনিক চিন্তায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় বটে, কিন্তু প্রাণের অফুরন্ত পিপাসা মিটাইবার ক্ষমতা শুধু সাধনেরই আছে।

দীক্ষায় অবিশ্বাসীর কর্ত্তব্য

নিত্যানিত্য-বিচারের দ্বারা নিয়ত ব্রহ্মানুস্মরণের যে জ্ঞানমার্গীয় সাধন-পন্থা ভারতে প্রচলিত আছে, তাহাতে দার্শনিক-বিচারের প্রভূত প্রাধান্য প্রদত্ত হইলেও একমাত্র দর্শন-শাস্ত্রালোচনারই সার্থকতা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। দার্শনিক-বিচারের দ্বারা যে সত্য প্রতীতি রূপে লব্ধ হইতেছে, তাহার উপরে ভিত্তিমান্ হইয়া দুরন্ত আগ্রহে এবং প্রবল প্রতাপে সাধন করিয়া যাওয়াই প্রয়োজন সেখানে সর্ব্বপ্রধান। সোঽহংতত্ত্ব বুঝিলেই চলিবে না, এই তত্ত্বের অনুদিন অনুক্ষণ অনুস্মরণ দ্বারা অনুশীলন চাই। এই জন্যই ভারতবর্ষে দার্শনিক মাত্রেই অল্পাধিক সাধক। দার্শনিক তত্ত্বালোচনার যে পাশ্চাত্য ভঙ্গী বর্ত্তমানে আমরা অনেকে আয়ত্ত করিতে অভ্যাস করিতেছি, তাহাতে তত্ত্ব-বিচার, সত্যাসত্য-নির্ণয়ের শাব্দিক প্রয়াস এবং শুদ্ধ যুক্তির উপরে নির্ভরশীল (Logical) প্রয়োগে উপসংহার পাওয়াই অতি প্রধান কথা,—দার্শনিকের নিজ জীবন-মধ্যে তত্ত্বকে স্বরূপে আস্বাদন করিয়া ধর্ম্মে, কর্ম্মে জীবনে ও লোকযাত্রায় সেই তত্ত্বের প্রতিনিধি, প্রতিভূ, প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতীক বনিয়া যাওয়ার সাধনা অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে। কিন্তু

দার্শনিক আলোচনা বনাম সাধন

তাহাতে প্রাণের পিপাসা মিটে না, মাত্র মনের অনুসন্ধিৎসাই মিটে। তাই সাধন চাই। দীক্ষাগ্রহণ বড় কথা নহে, সাধন করাই বড় কথা। হুজুগে পড়িয়া দীক্ষা লইয়া তারপরে সাধন ভজন না করার এবং গুরু-বাক্যে অশ্রদ্ধা-অমর্য্যাদা করার চাইতে একেবারেই দীক্ষা না নেওয়া ভাল কথা এবং নিজের মতানুযায়ী সাধনই দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত উৎসাহ-সহকারে অপরাজেয় উদ্যমে করিয়া যাওয়া অত্যুত্তম। গতানুগতিকতায় জীবন জাগে না, জীবন জাগে তপস্যায়।

(জ) পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সঞ্জননের জন্য পতিপত্নী উভয়কেই নিয়ত যত্নবান্ থাকিতে হইবে। যাহার চরিত্রের মধ্যে যেটুকু উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহার প্রতি তাহাকে সবিশেষ মনোযোগ দিয়া সেই উৎকর্ষটুকুকে বর্দ্ধিত করিয়া পরস্পরের শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে হইবে। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে একটা ইন্দ্রিয়াতুর সম্ভোগাসক্ত সুখলিপ্সাকাতর কুকুরী ও কুকুর মনে না করিয়া, জিতেন্দ্রিয় দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং একটা পশুকে খুসী করিতে হইলে যেভাবে চলিতে হয়, সে ভাবে না চলিয়া, একজন দেবতারও শ্রদ্ধিত যেভাবে হইতে হয়, সেইভাবে চলিবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামিপত্নী পরস্পরের কাছ হইতে শ্রদ্ধা চাহে না, চাহে অনুরাগ, চাহে প্রেম। তাই নিজেকে শ্রদ্ধিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষাও অপরকে শ্রদ্ধা করিতে প্রয়াসশীল হওয়ায় দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। এ জগতে অপরকে যে যত নির্ব্বিচারে শ্রদ্ধা করিতে পারে, সেই তত অবিসংবাদিতরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করে। পত্নীর দোষ থাকিলে স্বামী এবং স্বামীর দোষ থাকিলে পত্নী তাহা নিজ নিজ প্রেমের প্রভাব দিয়া সংশোধিত করিয়া লইতে সর্ব্বদা সযত্ন থাকিবেন এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটীকে

একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা

সমালোচকের নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাহার জীবনের বিরাট মহিমার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া শ্রদ্ধার মধুসিক্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের চরিত্রের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিবেন।

স্বামীর উপরে পত্নীর এবং পত্নীর উপরে স্বামীর সাধারণ দাবী শ্রদ্ধার না হইলেও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন-পথে শ্রদ্ধা এক মহীয়সী শক্তি, শ্রদ্ধা এক বিরাট সহায়িকা। বাস্তবতঃ যাহাকে তুচ্ছ বা সাধারণ বলিয়া জ্ঞান করা হইতেছে, তাহার ভিতরে যে অতুল অদ্ভুত মহনীয় কিছু আছে, এই বোধের নাম শ্রদ্ধা। একটী অণুকে বা পরমাণুকে তাহার সূক্ষ্মত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হইলেও তাহার শক্তি সম্বন্ধে মানবের কি কোনও শ্রদ্ধা ছিল? প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ব্রহ্মদৃষ্টি অথবা বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা একটী অণুর বা পরমাণুরও প্রচ্ছন্ন মহত্ত্ব বা শক্তিকে মানুষের ধ্যানগম্য বা নেত্রগোচর করিয়াছে। ক্ষুদ্রের ভিতরেও বৃহৎ আছে, তুচ্ছের ভিতরেও মহৎ আছে, স্বল্পের ভিতরেও ভূমার অবস্থান রহিয়াছে,—এই বোধের নাম শ্রদ্ধা একজন যেখানে অপরের ভোগসুখের মাত্র সহায়ক বা ভোগবুদ্ধির মাত্র উদ্দীপক, সেখানে একজনের ভিতরে অন্যে যদি ভোগাতীত পরমমহৎ সত্তাকে দর্শন করিতে পারে, তবে তাহার সুমহৎ ফল হইতে কি করিয়া সে বঞ্চিত হইবে? মাটির পুতুলে বা প্রস্তরের পিণ্ডে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া সাধক যেমন করিয়া জগতের কল্পনাতীত শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করেন ঈশ্বর-প্রেমের মধ্য দিয়া, ঠিক তেমনি করিয়া স্বামী এবং পত্নী ব্রহ্মাণ্ডের চূড়ান্ত সম্পদ লাভ করিতে পারেন রক্তমাংসের ডেলা এই শরীরটার ভিতরে ইন্দ্রিয়াতীত পরমমহৎ অবস্থান করিতেছেন, এই বিশ্বাসের অনুশীলন করিয়া।

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে

শ্রদ্ধার শক্তি

অন্যত্র শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইলে আত্মশ্রদ্ধার প্রয়োজন হয়। নিজেকে কামের কিঙ্কর না ভাবিয়া যদি জগতের কল্যাণকারী বলিয়া ভাবিতে থাকা যায়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা পরোক্ষভাবে অতি উচ্চ স্তরের আত্মশ্রদ্ধার বিকাশ ঘটে। এইজন্যই আমরা আমাদের সাধন-পথাবলম্বী অখণ্ডগণকে নাম-জপারম্ভের ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি"—আমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি" এই সঙ্কল্প করিতে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়া থাকি। "আমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সমগ্র শরীরের মধ্য দিয়া মনকে সঞ্চরণশীল রাখিবার অভ্যাস করিতে করিতে নিজ শরীরের ব্যবহার সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূত মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। তখন অপরের শরীরের প্রতি তদ্রূপ বা তদনুরূপ শ্রদ্ধিত ধারণা পোষণ করা সহজতর হইয়া পড়ে। স্বামী যেখানে নিজ দেহকে জগৎকল্যাণের সাধন ভাবিতে ভাবিতে নিজ পত্নীর দেহেও তদ্রূপ ভাবারোপ করেন, স্ত্রী যখন নিজ দেহকে জগৎকল্যাণের সাধন ভাবিতে ভাবিতে স্বামীর দেহেও তদ্রূপ ভাবারোপ করেন, তখন স্বভাবসঞ্জাত এক অপার্থিব শ্রদ্ধা একজনকে অপর জনের নিকট দিব্য সমাদরের সামগ্রীতে পরিণত করে।

আত্মশ্রদ্ধা

(ঝ) স্বাধীনতার স্পৃহা জীবমাত্রেরই মধ্যে প্রকৃতিদত্ত। জীব যখন নিজেকে সমাজবদ্ধ করে, তাহার স্বাধীনতা-স্পৃহাই তাহাকে তখন এক বিষয়ে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অলোভনীয় বিষয়সমূহের স্বাধীনতা বর্জ্জন করিতে বাধ্য করে। স্বামী এবং পত্নী যখন গভীর অনুরাগের মধ্য দিয়া পরস্পরের স্পর্শ পাইতে আরম্ভ করেন, তখন অনেক সময় তাঁহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা আত্ম-

একের স্বাধীনতার প্রতি অপরের সম্মানবোধ

গোপন করিয়া রহে সত্য, কিন্তু একের নিকটে অপরের সর্ব্বতোভাবে এবং সম্যগ্‌রূপ সাত্ত্বিক আত্মসমর্পণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্পৃহাটি লুপ্ত হয় না। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্য দিয়া প্রেমের আবির্ভাবের দ্বারা ব্যক্তিবুদ্ধির অবসান না ঘটিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একের স্বাধীনতার প্রতি অপরের সম্মানবোধ থাকা একান্তই আবশ্যক। নারী যতদিন নিজেকে নির্য্যাতিতা নিগৃহীতা বন্দিনী বলিয়া মনে করিবে এবং পুরুষ যতদিন নারীকে তাহার পথের কণ্টক বা পায়ের শৃঙ্খল বলিয়া মনে করিবে, ততদিন দাম্পত্য জীবন ব্যর্থতাই চয়ন করিতে থাকিবে। পুরুষ যতদিন নারীর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশকে বাধাদান করিবে এবং নারীও যতদিন পুরুষের জীবনকে নাগপাশে বাঁধিতে চাহিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবন একটা করুণ-রসাত্মক-বিয়োগান্ত নাট্যই থাকিবে। পুরুষজাতি যতদিন পর্য্যন্ত নারীজাতির উপরে নিজ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার বিধাতৃদত্ত শক্তিসমূহের অপব্যবহার করিবে এবং নারীজাতি যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষকে নিজের আয়ত্তে আনিবার জন্য লালসার জাল বিস্তার করিতে চাহিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গৃহীর গৃহ সাহারার মরুভূমিরই ন্যায় শুধু অতৃপ্য পিপাসা এবং মায়া-মরীচিকার সৃষ্টি করিবে। পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত নারীর চতুর্দ্দিকে কারাগারের লৌহ-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নিকটে লজ্জিত না হইবে এবং নারী যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ-পশুকে তাহার রক্ত-মাংসের প্রতিমাটার পায়ে বলিদান করিতে বিরত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সংসারীর সংসার হইতে দাসত্ব ও মৃত্যুর বিভীষিকা বিদূরিত হইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ নারীর দাস এবং নারী পুরুষের দাসী থাকিবে,

নারী ও পুরুষ কতকাল পরস্পরের শত্রু থাকিবে?

ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ নারীর নিকটে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত এবং নারী পুরুষের নিকটে সাক্ষাৎ কাল-ভুজঙ্গিনী হইয়া থাকিবে।

এইজন্যই পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধাবোধ থাকা নিরতিশয় প্রয়োজন। এই স্বাধীনতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি কি, তাহা দাম্পত্য সাধকেরা নিজ নিজ জীবনের উৎকর্ষের পরিমাণ এবং পারস্পরিক প্রীতির গভীরতা দিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন; কোনও লোক-গুরু বা গ্রন্থাকারের সাধ্য নাই যে, এই বিষয়ে কোনও সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দম্পতীকে ভাবুকতার আবশ্যকতা হইতে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু এইটুকু আমরা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্য জগতে দাম্পত্য স্বাধীনতার দাবী যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে, ভারতীয় দাম্পত্য স্বাধীনতা তাহা হইতে নিজ প্রকৃতিগত সর্ব্বপ্রকার পার্থক্যকে সযত্নেই রক্ষা করিয়া চলিবে। নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল যে স্বাধীনতার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত হইয়া য়ুরোপীয় নরনারী দাম্পত্য বন্ধনের অচ্ছেদ্যতাকে একটা দুর্ব্বহ ভার এবং গুরুতর বাধাস্বরূপ মনে করিতে বাধ্য হইতেছে, যে স্বাধীনতার দুঃস্বপ্ন-প্রভাবে পশুবৎ স্বাধীন প্রেম অনুশীলনে সামাজিক অন্তরায়সমূহকে পাশ্চাত্য দম্পতী একান্ত অসহনীয় বলিয়া ভাবিতেছে, যে স্বাধীনতার আকুল প্রার্থনা বিবাহকে ভিত্তিহীন ও বিবাহ-বন্ধনকে যন্ত্রণাপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে, নিশ্চয়ই ভারত সে স্বাধীনতাকে * গ্রহণ করিবে না। স্বাধীনতার যে বিষ-বল্লরীতে

দাম্পত্য স্বাধীনতার স্বরূপ

দাম্পত্য স্বাধীনতার পাশ্চাত্য দুঃস্বপ্ন

* ফরাসী-লেখক প্রফেসার লেটুরন্যু যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে,

পাশ্চাত্য জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদের হলাহল-পূর্ণ মাকাল ফল গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিতেছে, নিশ্চয়ই ভারতের উর্ব্বর মৃত্তিকা তাহার বিষময় বীজকে স্বকীয় বক্ষে ধারণ করিতে অস্বীকার করিবে এবং যদিই কোনও অদূরদর্শী অবিমৃষ্যকারীর মহামূর্খতা এই অকল্যাণের বীজকে পাশ্চাত্য হইতে ভারতে আনিয়া বপন করিতে চাহে, নিশ্চিতই ভারতের মেঘ তাহাতে বারি-বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত

দাম্পত্য স্বাধীনতা ও ভারতীয় প্রতিভা

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে যত সংখ্যক নরনারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্যের অন্ধ তাড়নায় সেই সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ নরনারী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর পরে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুপাত সওয়া দুই গুণ বাড়িয়াছে। হল্যাণ্ডে ইহার অনুপাতে এই ত্রিশ বৎসরে দেড়গুণ, সুইডেনে কিঞ্চিদধিক দেড়গুণ এবং বেলজিয়ামে প্রায় সওয়া চারিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অপরাপর-দেশীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ লেখকগণের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেণী, রুশিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকাতে, বিশেষভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই দুর্ভাগ্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে (ইণ্ডিয়ান ডেলীনিউজ, ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯২০) দেখা গিয়াছিল যে, ১৯১৯ সালে শুধু নিউইয়র্ক জেলাতেই একহাজার তিনশতের অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার বিচার হয়। সুপ্রীমকোর্টের বিচারক জষ্টিস গ্রীণবম এবং জষ্টিস ডেভিস্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, নৈতিক অবনতিই এই সকল বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। যে দাম্পত্য স্বাধীনতা লাভের জন্য য়ূরোপ ও আমেরিকা উল্লম্ফন করিতেছে, তাহা তাহাদের নৈতিক দুর্গতিকে রুদ্ধ না করিয়া অবারিত করিতেছে। স্বাধীন প্রেম তাহাদের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করিতেছে, পশুত্বের তাণ্ডব-লীলার প্রস্ফুটন ঘটাইতেছে। বাংলার তথা ভারতের কোনও জেলায় যদি এক বৎসরের মধ্যে এক হাজার তিনশত স্বামী বা স্ত্রীকে তাহার স্ত্রীর বা স্বামীর অসচ্চরিত্রতা প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে কোন দিন হয়, তবে তাহা কি আমাদের গৌরবের বা উন্নতির দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে?

রহিবে। ভারতীয় সাধনার মধ্য দিয়া ভারতীয় প্রতিভার আশ্চর্য্য অবদানরূপে স্বাধীনতার যে দ্রাক্ষালতিকা অঙ্কুরিত হইবে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্র হইতে সকল আগাছা উৎপাটিত করিয়া সেই লতিকাকেই আমরা রোপিত, প্রবর্দ্ধিত, পল্লবিত এবং স্তবকে স্তবকে সুমধুর ফলভারে অবনমিত দেখিয়া নয়ন জুড়াইতে চাহি।

একথা অস্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই যে, নরনারীর দাম্পত্য-জীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই প্রধানতঃ একই ধরণের। অতএব, তাহাদের সমাধানের মধ্যেও সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনে বিবাহ বিবাহকারীর সুখসাধক, স্বামীর জীবন প্রধানতঃ পত্নীর কল্যাণের জন্য নহে, পত্নীর জীবন মুখ্যতঃ স্বামীর কল্যাণের জন্য নহে। পাশ্চাত্য পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকে বড় করিয়া দেখিয়াছে প্রধানতঃ সেই ক্ষেত্রে, যেই ক্ষেত্রে পারস্পরিক কুশল সুখপ্রার্থীর নিজ সুখের বিশেষ সহায়ক। ভারতে বিবাহের আচরণ যাহাই হউক, আদর্শ তাহা অপেক্ষা বহুধা বিভিন্ন এবং উন্নততর স্তরের। ভারতীয় বিবাহে নিজেকে উৎসর্গ করাই আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যে অপরের সুখার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে, নিজের সুখকে খাটো করিয়া অপরের সুখকে প্রধান করিতে পারে, সে-ই লোকদৃষ্টিতে ধন্যা নারী বা পুণ্য পুরুষ। এই কারণেই পাশ্চাত্যের অত্যুগ্র স্বাধীনতা-লিপ্সা ভারতে কদাচ আদৃত, প্রশংসিত বা সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সভ্যতার সঙ্কট কোনও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিলে তাহার ফলে ভারতে সাময়িক উত্তেজনার সঞ্চার হইতে পারে মাত্র কিন্তু জাতির মনে তাহা স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না।

ভারত ও পাশ্চাত্যে আদর্শ-ভেদ

দাম্পত্য স্বাধীনতার দাবী যখন পারস্পরিক-অধীনতাকে (inter dependence) অস্বীকার করে, তখন উহা সহস্র প্রকারে জাতীয় জীবনে ধ্বংসের বিস্তার করে। তখন হয় উহা নির্ব্বিচার (promiscuous) যৌন-সম্বন্ধের প্ররোচনা দ্বারা জাতির নৈতিক মৃত্যুকে আনয়ন করে, নতুবা উহা সর্ব্বপ্রকার যৌন-সম্বন্ধকে রহিত করিয়া জাতির নির্ব্বংশ সাধন করে। এই দুইটী অবস্থাই আশঙ্কাজনক ব্যাপার। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থাটী হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ, পরার্থে-সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-ব্রত কঠোর সাধক ও সাধিকা ব্যতীত সাধারণেরা যৌন-আকর্ষণ হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি, দাম্পত্য জীবনের দুঃখগুলি দেখিয়া ভয় পাইয়াই যাহারা কৌমার্য্য গ্রহণ করে, অপর কোনও উৎকৃষ্টতর প্রেরণা যাহাদের কৌমার্য্যের মূলদেশে নাই, তাহারা চির-কৌমার্য্যের মানমর্য্যাদা * রক্ষা করিতে পারে না। ফলে, প্রকাশ্য ভাবে গার্হস্থ্য-জীবন গ্রহণ করিয়া অন্তরমধ্যস্থ যৌনসুখ-কামনার পরিতৃপ্তি দান করিবার সৎসাহস যদি না থাকে, তাহা হইলে ঐ কামনা অবৈধপথে প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বেগবতী গতি পরিচালনা করে। সুতরাং, দাম্পত্য স্বাধীনতার দাবী যদি পারস্পরিক অধীনতাকে অস্বীকার করিতে চাহে, তাহা হইলে বিবাহ-প্রথাটা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইয়া যৌন জীবনে একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের সৃষ্টি হইবে। সম্পূর্ণ

দাম্পত্য স্বাধীনতা বনাম পারস্পরিক অধীনতা

* সকল কালে এবং পৃথিবীর সকল দেশেই বিবাহ না করিবার বাতিকগ্রস্ত একশ্রেণীর লোক থাকে, যাহারা পরহিতার্থ ও আত্মমোক্ষার্থ সন্ন্যাস লইতে স্বীকৃত নহে কিন্তু বিবাহ করিতেও প্রস্তুত নহে। সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত কেহই যৌন-জীবনকে অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কি নারী কি পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই সম্পূর্ণ জিতকাম ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলে, নবজাত সন্তানের জনকের পরিচয় পাওয়া সুকঠিন হয়। এই অকথনীয় অবস্থায় জাতীয় জীবনের যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিয়াই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—“বরং ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, তথাপি এমন জাতিধ্বংসকর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না।” যৌন যথেচ্ছাচারের শোচনীয় পরিণাম বুঝিয়াই বিগত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া স্বজাতির কল্যাণপ্রার্থী কোন কোন ইংরেজ মহাত্মা যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন জাতির শোণিতগত মিশ্রণের দ্বারা কখনও কখনও

যাপন করাই ইহাদের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য না হইলেও আত্মসুখ-সেবাই অধিকাংশ স্থলে ইহাদের ভবিতব্য হইয়া দাঁড়ায়। এই শ্রেণীর কৌমার্য্য আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত নাই, কিন্তু নানা লক্ষণে মনে হইতেছে, প্রচলনের ভঙ্গীটুকু প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ কৌমার্য্যের দ্বারা আমরা কিরূপ লাভবান্ হইব, একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝান যাইতেছে। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার অ্যাডলফি বার্‌লিটন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ-বিষয়ে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বদেশীয় সমাজ-মধ্যে প্রচুর উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি একথা প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, ফরাসী-দেশীয় জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নরনারী যে বিবাহিত জীবনকে অস্বীকার করিয়া কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহা দ্বারা ফরাসী জাতির দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতি বাড়িয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবাহিত দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীর তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ অবিবাহিতেরা অধিকতর ক্ষয়প্রবণ ও অপকর্ষ-প্রাপ্ত এবং সকল বয়সেই কৌমার্য্যাবলম্বীরা বিবাহিত নরনারীদের অপেক্ষা দ্বিগুণ হারে ইহলীলা সাঙ্গ করে। বিবাহিত নরনারীদের মধ্যে উন্মত্ততা, আত্মহত্যা, পরস্বাপহরণ-চেষ্টা, নরহত্যা ও বলাৎকার প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের পরিমাণ যত, ফরাসী তথাকথিত কুমার-কুমারীদের

জাতিগত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, একথা বৈজ্ঞানিকেরা একপ্রকার প্রমাণিত করিয়াছেন। অবশ্য, বিরুদ্ধ-মতও নিতান্ত নগণ্য নহে। কিন্তু সর্ব্ব-প্রকার দাম্পত্য দায়িত্ব হইতে মুক্ত যৌন-সম্বন্ধ রক্তের যে মিশ্রণ ঘটাইয়া থাকে, তাহা দ্বারা জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত

বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির শোণিতগত মিশ্রণ

মধ্যে তাহার পরিমাণ উহার দ্বিগুণ। ফলে, বিবাহিত দুই-তৃতীয়াংশ নর-নারীদের জন্য সরকারকে যত-সংখ্যক কারাগার, পাগলা-গারদ, হাসপাতাল, পুলিশ ও শুশ্রূষাকারী রাখিতে হয়, অবিবাহিত এক-তৃতীয়াংশ নরনারীদের জন্য তাহার দ্বিগুণ কারাগার, পাগলা-গারদ, হাসপাতধল, পুলিশ ও শুশ্রূষাকারীর ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ চিরকুমার ও চিরকুমারীরা বিবাহিত ও বিবাহিতাদের তুলনায় চারিগুণ দুর্নীতি-পরায়ণ। এইদৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে, অবিবাহের পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের গ্রহণীয় কিনা। ভারতবর্ষে কৌমার্য্যের সম্মান আছে, কিন্তু তাহার আদর্শও পৃথক্। পাশ্চাত্য পুরুষের কৌমার্য্য অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, পাশ্চাত্য নারীর কৌমার্য্য অধিকাংশ স্থলেই সন্তান-প্রসবের বেদনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য। বর্ত্তমানে ঔষধের দ্বারা পুংবীজকে ইচ্ছামাত্র জননশক্তিহীন ও জরায়ূতে অস্ত্রোপচার করিয়া নারী-দেহকে ইচ্ছামত সন্তানপ্রসবে অক্ষম করিবার যে বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ইয়োরামিকায় চলিতেছে, তাহা সফল হইলে এই কৌমার্য্যের বালাই আর থাকিবে না। পরন্তু ভারতীয় কৌমার্য্যের আদর্শ হইতেছে পবিত্রতা ও পরার্থে উৎসর্গ। যাহার বীর্য্যে শত শত সন্তান-জননের ক্ষমতা রহিয়াছে, স্ত্রীপুত্রের ভারবহনে যিনি অনুমাত্র অক্ষম নহেন, তিনিও এই আদর্শের মুখ চাহিয়্য চিরকৌমার-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে নারী শত সন্তান জঠরে ধরিয়াও প্রসবক্লেশকে একটা ক্লেশের মধ্যে গণনা করেন না, তিনিও পবিত্রতা ও পরার্থের মোহনবংশী শুনিয়া কৌমার্য্যকে আলিঙ্গন করেন। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় কৌমার্য্য ভারতীয় আদর্শকে ধরিয়া রাখিবে, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সন্তানের জন্মরোধ করিবার বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইবে, তন্মুহূর্ত্তে পাশ্চাত্য কৌমার্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

হয়। এই জন্যই ভারতভূমি শক, যবন, পারদ, হূন, শান, আহোম, মগ, লেপ্চা, ভুটিয়া প্রভৃতি শত শত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত জাতির সহিত শোণিত-সম্বন্ধ ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া লইয়াছে, তাহাদের বংশধরদিগকে এই ভারত-ভূমিরই রক্ত-মাংস বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু বিবাহ ব্যতীত, দাম্পত্য-দায়িত্ব-রহিত শোণিত-মিশ্রণকে অনুমোদন করে নাই। বলিতে কি, এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক সাধনার যুগে কত কত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবংশে রজক, চণ্ডাল প্রভৃতির কন্যার সহিত, এমন কি পাঠান নারীর সহিতও, রক্ত-সম্বন্ধস্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও তাহাকে শৈবমতে বিবাহ না করিয়া এবং সদ্ধর্ম্মে দীক্ষা না দিয়া নয়। মোট কথা, অসবর্ণ বিবাহ অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু বিবাহ ব্যতীত শোণিত সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না।

বিবাহ-বন্ধন ব্যতীত শোণিত-সম্পর্ক

বিবাহ-বন্ধনকে অস্বীকার করিতে চাহিয়া য়ুরোপ কি বড় সুখী হইয়াছে? এই যে দিনের পর দিন য়ুরোপের প্রতি পল্লী জারজ * সন্তান-সন্ততিগুলির দ্বারা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, এই যে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিজেদের জন্মদাতা পিতার পরিচয় দিতে অক্ষম হইয়া পিতৃপরিচয়-জিজ্ঞাসাটাকে একটা সামাজিক অসম্ভ্রম বলিয়া মনে করিতেছে, ইহা কি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গৌরবদান করিতেছে? সমাজ-সংস্কারের কুহকে পড়িয়া, স্বাধীনতার মায়া-মরীচিকায় ভুলিয়া ভারতবর্ষও কি তাহার ভবিষ্যৎ পুত্রকন্যাগণকে পিতৃ-

পাশ্চাত্য-সমাজ ও পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা

---

* ফরাসী লেখক প্রফেসার লেটুরন্যু ফ্রান্স ও সুইডেনের জারজ-সন্তানদের সংখ্যার নিম্নরূপ যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ফ্রান্স	১৮০০—১৮০৫	খ্রীষ্টাব্দে	প্রতি দশ হাজার	নবজাত	শিশুতে	৪৭৫টী জারজ
	১৮০৬—১৮১০	”	”	”	”	৫৪৩টী জারজ
	১৮২১—১৮২৫	”	”	”	”	৭১৬টী জারজ

পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা আর গৌরবটুকু হইতে বঞ্চিত করিবে? আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, পারস্পরিক অধীনতাকে অস্বীকার করিয়া ভারত কখনও দাম্পত্য জীবনেস্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার মরণ-বুদ্ধি করিবে না। ভারতের নারী যেমন একদিকে পুরুষের আদেশ, অনুজ্ঞা বা অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই স্বামীর ও দেশের কল্যাণের জন্য স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় খর্ব্ব করিবেন, ভারতের পুরুষও তেমনি অপর

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে; অসবর্ণ, আন্তর্জ্জাতিক ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও দিন দিন ফরাসী জাতির জারজ-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পঁচিশ বৎসরের ভিতরে প্রতি দশ হাজার জন্মে ৭১৬—৪৭৫ = ২৪১টী বাড়িয়াছে। এই হারে বাড়িয়া চলিলে এক সহস্র বৎসর পর ফরাসী দেশে অ-জারজ সন্তান কয়টী থাকিবে, গণিতজ্ঞ-পাঠক তাহার হিসাব করিয়া দেখিবেন।

ফ্রান্সে {
১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতি শত নবজাত শিশুতে প্রায় ৩টী জারজ
১৮৬৬ " " " প্রায় ১০টী জারজ

দেখা যাইতেছে ৯০ বৎসরে জারজের সংখ্যা তিনগুণের অধিক বাড়িয়াছে।

বাংলা ১৩৪১ সালের চৈত্রের "নবশক্তিতে" একজন লেখক ইংল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র-সচিবের দপ্তরে তৈরী সরকারী তালিকা হইতে দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মোট শিশু জন্মিয়াছে ছয় লক্ষ বত্রিশ হাজার একাশি। তাহার ভিতর জারজ আটাশ হাজার ছিয়াশি। অর্থাৎ "ইংলণ্ডের প্রতি ২২টা শিশুর ভিতর ১৯৩০ সালে একটি শিশু নামহীন গোত্রহীন হইয়া জন্মলাভ করিয়া 'টমি-কুল'-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। অথবা আরও সংক্ষিপ্ত হিসাবে, ঐ বছরে প্রতিদিন ইংলণ্ডের ৭৭টি শ্বেতকন্যা অবৈধ উপায়ে সন্তানের জননী হইয়াছে।"

আমরা এইরূপ হিসাব আরও দিতে পারি, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন এবং অসুন্দর। কারণ, যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপকে গালাগালি দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে,— সকল ব্যাপারে পাশ্চাত্যকে নির্ব্বিচারে নকল করিতে গেলে আমরা যে নিশ্চিত ঠকিব, তাহা বুঝানই উদ্দেশ্য।

দিকে নারীর প্রার্থনা, মিনতি বা কাতরতার অপেক্ষা না করিয়াই পত্নীর ও দেশের মঙ্গলার্থে স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত করিয়া লইবেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

মনে রাখিতে হইবে, দম্পতীর স্বাধীনতার স্পৃহা যতই অধিক হউক, যে দেশে বিবাহ একটা অধ্যাত্ম-সাধনা, সেই দেশের বিবাহে বিচ্ছেদ থাকিতে পারে না। সদ্গুরুর অভাব বশতঃ আধ্যাত্মিক সাধনারূপে বিবাহের মর্য্যাদা এদেশে তেমন ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতে না পারিলেও, আধ্যাত্মিক সাধনারূপে বিবাহিত জীবনকে গ্রহণ ও গৃহীত করিবার চেষ্টা যে এদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী হইয়া আসিতেছে, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এতদিনেও বিবাহিত জীবন আধ্যাত্মিক সাধনার জীবনরূপে গৃহীত হইল না বলিয়া আমরা লজ্জিত হইতে পারি, কিন্তু কস্মিন্ কালেই যে ইহা হইবে না, এমন হতাশা পোষণ করিতে পারি না। বরঞ্চ ভরসা পাইবার এবং আশা পোষণ করিবারই যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের মধ্যে অকল্পনীয়। যে পুরুষ পরিণীতা পত্নীকে ত্যাগ করে, আমরা তাহাকে পশু বলি, মানুষ বলি না। এদেশের স্ত্রী এখনও স্বামীকে ত্যাগ করিতে শিখে নাই বলিয়া তাহাকে আমরা নির্ব্বোধ বলি না, দেবী বলি। এমন দিন অবশ্য আসিবে, যেদিন পত্নী অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বন্ধ্যা বা রুগ্না, একথার যত বিচার বিবাহের পূর্ব্বেই হইয়া যাইবে, পরন্তু এই সকল ত্রুটীর জন্য বিবাহিতা পত্নীকে কেহ পরিত্যাগ করিবে না। এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যেদিন লোকমতের ভয়ে নহে, রাজশাসনের ভয়ে নহে, পরন্তু একমাত্র বিবেকের তাড়নায়ই পুরুষেরা পত্নী-ত্যাগে পরাঙ্মুখ হইবে। এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যেদিন নরনারী উভয়েই বুঝিবে যে, ভারতীয় বিবাহ শুধু নরনারী-প্রেমেরই সাধক নহে, ভগবৎপ্রেম এবং বিশ্ব-প্রেমেরও সাধক।

যদ্যপি ভারতীয় খ্রীষ্টান বা ভারতীয় মুসলমান এতদুভয়ের সামাজিক জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদ বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তথাপি বিবাহ-বিষয়ক ভারতীয় হিন্দুর চিন্তাধারার ছাপ অল্পাধিক পরিমাণে এই উভয় সম্প্রদায়ের মনেই পড়িয়াছিল বলিয়া মনে করা চলে। ইহার ফলে নিদারুণ কারণ ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্ত খ্রিষ্টান বা খান্‌দানী মুসলমানের ঘরে বিবাহ-বিচ্ছেদ রূপ একটা ব্যাপার সহজে সহনীয় নহে। হিন্দু-ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অকপট আপত্তি সত্ত্বেও সম্প্রতি হিন্দুগণের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের দুয়ার আইন দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় স্থলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু যেখানে বিবাহ শুধু নর-নারী-প্রেমেরই সাধক বলিয়া গৃহীত হইবে না, পরন্তু ভগবৎ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের সাধক বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, সেই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের কল্পনারও প্রবেশাধিকার ঘটিবে না। মানুষ যখন জন্তু-জগতের ঊর্দ্ধে নিয়া নিজেকে ঠেলিয়া তুলিতে পারিবে, তখন অসতীত্ব বা ব্যভিচার কল্পনাতীত ব্যাপার হইবে। মানুষ যখন বিবাহের ভিতর দিয়া ভগবান্‌কে খুঁজিবে, তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ আপনা-আপনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ-সম্ভাবনাকে দাম্পত্য জীবন হইতে দূর করিতে হইলে ভগবৎ-সাধনার সাধক রূপে বিবাহকে গ্রহণ করিতে হইবে।

•বিবাহের উচ্চতম আদর্শ বনাম বিবাহ-বিচ্ছেদ

(ঞ) পারস্পরিক শক্তিসাম্য-বিধায়িনী শত শত সাধন-প্রণালী জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং আছে। মুসলমানেরা যে বহুলোক একত্রে নামাজ পড়েন, খ্রীষ্টিয়ান ও ব্রাহ্মেরা যে

রবি-বাসরীয় ভজনাগারে সমবেত প্রার্থনা করেন, বৈষ্ণবেরা যে সম্মিলিতভাবে কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, তাহার পশ্চাতে শক্তি-সাম্যের কল্পনা থাকুক, আর না থাকুক, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে কিন্তু শক্তি-সাম্যই হইয়া থাকে। সকলেরই মন যখন একটি ভাবের মধ্য দিয়া প্রশান্ত হইবার চেষ্টা করে, তখন তন্মধ্য হইতে বিশেষ একটি শক্তিশালী মনের প্রেরণা ও প্রভাব অপরাপরের মনের দৈন্যকে দূরীভূত করে, সকলেরই অন্তরের উৎসগুলি যেন নিমেষে খুলিয়া দেয়। ইহাই শক্তিসাম্য। উন্নতির পথে যাঁহারা অগ্রচারী, তাঁহারা ইহা দ্বারা বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হন না, অথচ যাঁহারা তাঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাঁহারা অগ্রগামীদের ভাবের গভীরতায় প্রবাহিত হইয়া নিজেদের নানা অসম্পূর্ণতার পরিবন্ধন হইতে মুক্ত হন। এই জন্যই যাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আছে, এমন সাধকেরা একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের প্রত্যেকের ধর্ম্মসংস্কারের অবিরোধী একটি সাধন-প্রণালী অবলম্বনে চক্রে বসিয়া থাকেন। প্রত্যেকের মন যখন সাধনে একাগ্র হয়, তখন যাঁহার যে শ্রেষ্ঠতা থাকে, তাহা সকলের অজ্ঞাতসারে অপর প্রত্যেকের মধ্যে অল্পাধিক সঞ্চারিত হয়। একই ব্যক্তিবর্গ বহুদিন পর্য্যন্ত সমান আগ্রহ লইয়া সম্মিলিতভাবে এইরূপ সাধন করিতে থাকিলে পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা পরস্পরের মধ্যে চিরস্থায়ী-রূপে সংক্রামিত হইয়া থাকে। তান্ত্রিক ও তন্ত্র-প্রভাবিত বৈষ্ণব সাধকেরা এই তত্ত্বটা বিশেষভাবে উপলব্ধ করিয়াই ভৈরবী চক্র,

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য

শক্তিসাম্যের মর্ম্মকথা

তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদের শক্তিসাম্য

যোগিনী চক্র, পঞ্চতাত্ত্বিক শক্তিসাধন, কিশোরী-ভজন প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের বহুজন-সম্মিলিত স্ত্রীপুরুষ-সংশ্লিষ্ট সাধন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সাধন-প্রণালী অনেক সময়ে একটি সত্যকে সমাদর করিতে গিয়া বহু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, একটী তত্ত্বকে অভ্যাস করিতে যাইয়া বহু ভ্রান্তিতে বিলসিত হইয়াছে, একটী মঙ্গলকে লাভ করিতে চাহিয়া বহু অমঙ্গলকে আমন্ত্রিত করিয়াছে এবং এইভাবে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, প্রচ্ছন্ন জীবনটীকে ধর্ম্ম-সাধনার নামে অশ্লীল অতিচার ও অবাঞ্ছিত অনাচারে পূতি-গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে। এই হেতুতেই স্থূল ও নিকৃষ্ট প্রণালী-সমূহ ভারতবর্ষীয় সাধন-জীবন হইতে ধীরে ধীরে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট শক্তিসাম্য-প্রয়াসের কদর্য্যতা

বর্ত্তমান যুগে কোন্ প্রণালীতে স্বামী ও পত্নীর আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য সর্ব্বপ্রকারে সুখাবহ হইবে, আমরা শ্রেষ্ঠতার ক্রমিকতা অনুসারে নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। এই স্থলে একটী বিশেষ আবশ্যকীয় কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নিম্নোক্ত যে প্রণালী ধরিয়াই শক্তি-সাম্য করা হউক না কেন, সাধনকালে একে অন্যের দেহ স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

দাম্পত্য শক্তিসাম্যের কতিপয় প্রণালী

(১) স্বামী ও স্ত্রী একই আসনে অথবা দুইটী পৃথক্ আসনে পাশাপাশি বসিয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া নিজ নিজ ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট উপাসনা করিবেন। একের প্রতি অন্যের লক্ষ্য বা মন না

থাকিলেও ইহা দ্বারাই শক্তি-সাম্য ঘটিবে। কিন্তু ইহা অতি প্রাথমিক উপায়।

(২) স্বামী ও স্ত্রী একই আসনে বা পৃথক্ আসনে পাশাপাশি না বসিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরস্পর মুখামুখী ভাবে বসিয়া প্রথম প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। ইহা প্রথমোক্ত উপায় অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা প্রথমটি অভ্যাস না করিয়া দ্বিতীয়টী করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা প্রথমটি নিয়মিত অভ্যাসের পর দ্বিতীয়টী ধরিয়াছেন, তাঁহারা অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন।

(৩) উন্মীলিত নেত্রে প্রশান্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের ভ্রূমধ্যে চাহিয়া স্বামী স্ত্রীর মুখমণ্ডলে নিজমূর্ত্তি * এবং স্ত্রী স্বামীর মুখমণ্ডলে নিজমূর্ত্তির *

* মূর্ত্তি বলিতে এখানে মুখমণ্ডল বুঝাইতেছে।

চিন্তা করিবেন। মন যাহা ভাবে, দৃষ্টিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই দেখিতে পায়। ক্রমিক অভ্যাসের গুণে একের মুখে অপরের মূর্ত্তিদর্শন নিতান্তই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় স্বামীর দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখখানাই এবং স্ত্রীর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখখানাই অতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইবে। ধীরে ধীরে মনে হইতে থাকে, যেন দৃষ্ট মুখখানাই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অস্তিত্বশীল পদার্থ, গৃহমধ্যস্থ অপরাপর বস্তু এবং মুখের মালিকের অপরাপর অঙ্গ যেন নাই। তৎপরে স্ত্রীর মুখমণ্ডলে স্বামীর মূর্ত্তির এবং স্বামীর মুখমণ্ডলে স্ত্রীর মূর্ত্তির একটা প্রতিবিম্ব যেন ফুটিয়া ওঠে। এই সময়ে একই মূর্ত্তিতে দুইটী রূপ যুগপৎ দেখা যায়। ধীরে ধীরে নিবিষ্টতা আরও বর্দ্ধিত হইলে দৃষ্টের মুখমণ্ডলে আর নিজ ছবিটী থাকে না, দ্রষ্টারই মুখমণ্ডল তাহার সহযোগীর মুখমণ্ডলের স্থলে দৃষ্ট হয়।

যেখানে স্বামি-পত্নীর মধ্যে সাত্ত্বিক অনুরাগ সৃষ্ট হয় নাই এবং দৈহিক অসংযম সাধ্যমত সঙ্কুচিত হয় নাই, সেখানে প্রথমতঃ উভয়কে একই দেবতার অথবা একই মহাপুরুষের মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত ভাবে দর্শনের চেষ্টা কিছুদিন চালাইয়া তারপরে নিজমূর্ত্তি দর্শনের অভ্যাস করিতে হয়।

(৪) পরস্পর পাশাপাশি একাসনে বা পৃথক্ আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিবেন যেন নিজ দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহযোগীর ঠিক সেই সেই অঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছে। এইভাবে ধ্যান করিতে করিতে যখন ধারণা জন্মিবে যে, দুই দেহ দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে বা পৃথক্ আসনস্থিতও নহে, তখন স্বামী বামাবর্ত্তে এবং স্ত্রী দক্ষিণাবর্ত্তে বিধি-অনুযায়ী জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চালক পরিভ্রমণ করিতে থাকিবেন। 'পরিভ্রমণ' ব্যাপারটা নিম্নে অষ্টম প্রণালীতে লিখিত হইল।

(৫) স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের মুখামুখী উপবেশন করিয়া পূরকে পূরক, রেচকে রেচক মিলাইয়া বিশিষ্টায়াম নামক স্বল্প-বলসাধ্য প্রাণায়াম করিতে করিতে নামজপ করিবেন। দম্পতীর দৈনন্দিন অজপা-সংখ্যার তারতম্য-হেতু প্রথম সময়ে শ্বাসে শ্বাস মিলাইতে গেলে প্রাণবায়ুর উপরে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইতে পারে। এই সকল স্থলে শক্তি-সাম্যের অভ্যাসের কাল প্রথম সময়ে খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক, নতুবা হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। পরে অভ্যাসের গুণে উভয়ের অজপার পার্থক্য আংশিকরূপে দূরীভূত হইলে দীর্ঘকাল অভ্যাস চলিতে পারে।

(৬) পঞ্চম প্রণালীই সহজায়াম নামক বলপ্রয়োগ-বর্জ্জিত স্বাভাবিক প্রাণায়াম সহকারে শ্বাস-প্রশ্বাসের রেচকে রেচক ও পূরকে পূরক মিলাইয়া শক্তিসাম্য হয়। দশ বিশ দিন বিশিষ্টায়াম প্রাণায়াম সহকারে পঞ্চম প্রণালী অভ্যাস করিয়া তৎপরে যাঁহারা সহজায়াম প্রণালী ধরেন, তাঁহাদের পক্ষে দ্রুত সাফল্য অর্জ্জিত হয়।

(৭) পূরকে রেচক ও রেচকে পূরক মিলাইয়া পঞ্চম প্রণালীর অভ্যাসেও শক্তিসাম্য হয়। যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে বর্গ নাই, সেস্থলে এই প্রণালী অবলম্বনীয়। তাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের কলহ-প্রবৃত্তি হ্রাস পায়। ইহাতে শক্তিসাম্য পঞ্চমপ্রণালীর সমানই হয়। যেস্থলে স্বামী ও পত্নীতে বর্গ আছে, সেখানেও ইহা ক্ষতির আশঙ্কাহীন ভাবেই অভ্যাস করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা তত প্রয়োজনীয় নহে।

(৮) আরও একপ্রকার শক্তিসাম্য আছে, যাহা ষষ্ঠ প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হইলেও কোন কোন স্থলে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে স্বামি-পত্নীর পরস্পরের সান্নিধ্য আবশ্যক হয় না। জগতের মঙ্গল-সঙ্কল্প পূর্ব্বক দেহমধ্যে শক্তি-সঞ্চালক পরিভ্রমণ করিবার কালে স্বামী যদি নিজ দেহকে

যৌগিক পরিভ্রমণ

পত্নীর দেহ বলিয়া এবং পত্নী যদি নিজ দেহকে স্বামীর দেহ বলিয়া ধ্যান করেন এবং পরস্পরের দেহ রূপান্তরিত জানিয়া বিপরীত-ক্রমে অগ্রসর হন, তাহা হইলে এইরূপ শক্তিসাম্য সাধিত হয়। অখণ্ডগণের দৈনিক উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে প্রত্যহ চারিবেলা উপাসনার কালে নামজপের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনবার, সাতবার বা অসংখ্যবার জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধান রহিয়াছে। তৎকালে তাঁহারা যৌগিক পরিভ্রমণ কার্য্যটীও করিয়া থাকেন। এই পরিভ্রমণের কালে সমস্ত শরীরটার মধ্যেই সর্ব্বক্ষণ এই সঙ্কল্প-বাক্য মনে মনে উচ্চারণ করিতে হয়,—ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি, আমি জগতের কল্যাণকারী হইতেছি। এই ভাবে দেহের প্রায় অধিকাংশ প্রধান অঙ্গে জগন্মঙ্গল-চিন্তনের একটা পরমশুভপ্রদ ছাপ থাকিয়া যায়, যাহার ফলে দেহ ও তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি জগন্মঙ্গল-বিরোধী কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকার একটা প্রবণতা পায়। কিন্তু সেই পরিভ্রমণ পুরুষেরা করিয়া থাকেন দক্ষিণাবর্ত্তে, অর্থাৎ বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে আবর্ত্ত করিতে করিতে, আর নারীরা করিয়া থাকেন বামাবর্ত্তে। দাম্পত্য শক্তি-সাম্যের স্থলে আবর্ত্তের বিধি উপাসনায় প্রচলিত বিধির বিপরীত হইবে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীলোকের বিধিতে পরিভ্রমণ করিবেন এবং স্ত্রী পুরুষের বিধিতে পরিভ্রমণ চালাইয়া যাইবেন। একে অন্যের বিধিতে পরিভ্রমণ করার নামই বিপরীত ক্রম। যাহা যাহার পক্ষে নিজ নিজ উপাসনার সময়ে করণীয়, তাহার নাম অবিপরীত ক্রম। নিম্নে অবিপরীত ক্রমই লেখা হইল।

পরিভ্রমণের অ-বিপরীত বা স্বাভাবিক ক্রম :—

(পুরুষের পক্ষে) একুশবার * অশ্বিনী মুদ্রা বা যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিয়া লিঙ্গমূলে (স্বাধিষ্ঠানে), তৎপর ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রে, লিঙ্গমূল

* সময়ের অল্পতা থাকিলে সাতবার বা তিনবার করিলেও চলে।

হইয়া বাম অণ্ডকোষে, বামপদে, পদনখাগ্রগুলি হইয়া কোমর হইয়া মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে, মেরুদণ্ড দিয়া স্কন্ধের উপর দিয়া বাম হস্তে ও অঙ্গুলীসমূহের শেষ সীমায় (সর্ব্বদাই অঙ্গুষ্ঠা প্রথমে, তর্জ্জনী তৎপর এবং এইভাবে সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠা), তৎপরে স্কন্ধ ও ঘাড়ের উপর দিয়া মস্তিষ্কে, মস্তিষ্কে দক্ষিণাবর্ত্তে একটু বেশী সময় থাকিয়া থাকিয়া তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় ঘাড়ের উপর দিয়া দক্ষিণহস্তে, তৎপর মেরুদণ্ড দিয়া দক্ষিণপদে, দক্ষিণ অণ্ডকোষে এবং পুনরায় লিঙ্গমূলে।

পুরুষের পরিভ্রমণ

রমণীর পরিভ্রমণ

(নারীর পক্ষে) একুশ বার অশ্বিনী-মুদ্রা বা যোনি-মুদ্রা অভ্যাস করিয়া যোনি, জরায়ু, বাম ডিম্বাধার, দক্ষিণ ডিম্বাধার, পুনরায় জরায়ু ও যোনি হইয়া দক্ষিণপদে, পদনখাগ্রগুলি হইয়া কোমর হইয়া মেরুদণ্ডের শেষ-প্রান্তে, মেরুদণ্ড দিয়া স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে ও অঙ্গুলী-সমূহের শেষ সীমায় (সর্ব্বদাই অঙ্গুষ্ঠা প্রথমে), তৎপরে স্কন্ধ ও ঘাড়ের উপর দিয়া মস্তিষ্কে একটু বেশী সময় থাকিয়া থাকিয়া তিনবার অথবা বারংবার বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় ঘাড়ের উপর দিয়া বামহস্তে, তৎপর মেরুদণ্ড দিয়া বামপদে এবং জননেন্দ্রিয়ে।

অষ্টম প্রণালীটী ব্যতীত অপর সকলগুলি প্রণালী স্বামিপত্নী ব্যতিরিক্ত গুরুশিষ্যে, দুই গুরুভ্রাতায়, দুই গুরু-ভগিনীতে, বিভিন্ন গুরুর একই সাধন-ধর্ম্মাবলম্বী শিষ্যদ্বয়ে প্রয়োজন বুঝিয়া না চলিতে পারে, তাহা নহে। কিন্তু পুরুষ-গুরু ও স্ত্রী-শিষ্যের মধ্যে, স্ত্রী-গুরু ও পুরুষ-শিষ্যের মধ্যে, গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর মধ্যে (যাঁহারা দম্পতী নহেন) একেবারেই নিষিদ্ধ।

শক্তি-সাম্যের পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি আবশ্যক মত অভ্যাস হইয়া গেলে অথবা দাম্পত্য সাধক-সাধিকার ভিতরে উপযুক্ততা অনুভূত হইলে পরস্পরের দেহসংস্পর্শমূলক অথচ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা-বিরহিত নিম্নলিখিত প্রণালীগুলিও স্থলবিশেষে অনুসৃত হইতে পারে।

(৯) দ্বিতীয় প্রণালীর অভ্যাসকালে স্বামীর উত্তানভাবে রক্ষিত করতল-দ্বয়ের উপরে স্ত্রী তাঁহার করতল-দ্বয়ও উত্তানভাবে রাখিবেন। দ্বিতীয় প্রণালী মতে যাঁহারা উন্নতির পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা এই প্রণালী দ্বারা অধিকতর ফললাভ করিবেন।

(১০) তৃতীয় প্রণালীর অভ্যাসকালে স্বামীর উত্তানভাবে রক্ষিত করতলদ্বয়ের উপরে স্ত্রী তাঁহার করতলদ্বয়ও উত্তানভাবে রাখিবেন। ইহা তৃতীয় প্রণালীর অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

(১১) করে কর রাখিয়া পঞ্চম প্রণালীর অভ্যাস করিতে হইবে। যাঁহার করতল যখন নিম্নে থাকিবে, তিনি তখন শ্বাসগ্রহণ বুঝাইতে অপরের করকেন্দ্রে নিজ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃদু চাপ দিয়া এবং প্রশ্বাসত্যাগ বুঝাইতে অপরের করকেন্দ্র হইতে নিজ অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া নিয়া ইঙ্গিত করিবেন। ইহা পঞ্চম প্রণালী অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

(১২) করে কর রাখিয়া ষষ্ঠ প্রণালী অভ্যাস করিতে হইবে এবং একাদশ প্রণালীতে কথিত কৌশলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস মিলাইতে হইবে।

রমণীর পরিভ্রমণ

(নারীর পক্ষে) একুশ বার অশ্বিনী-মুদ্রা বা যোনি-মুদ্রা অভ্যাস করিয়া যোনি, জরায়ু, বাম ডিম্বাধার, দক্ষিণ ডিম্বাধার, পুনরায় জরায়ু ও যোনি হইয়া দক্ষিণপদে, পদনখাগ্র-গুলি হইয়া কোমর হইয়া মেরুদণ্ডের শেষ-প্রান্তে, মেরুদণ্ড দিয়া স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে ও অঙ্গুলী-সমূহের শেষ সীমায় (সর্ব্বদাই অঙ্গুষ্ঠা প্রথমে), তৎপরে স্কন্ধ ও ঘাড়ের উপর দিয়া মস্তিষ্কে একটু বেশী সময় থাকিয়া থাকিয়া তিনবার অথবা বারংবার বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় ঘাড়ের উপর দিয়া বামহস্তে, তৎপর মেরুদণ্ড দিয়া বামপদে এবং জননেন্দ্রিয়ে।

অষ্টম প্রণালীটী ব্যতীত অপর সকলগুলি প্রণালী স্বামিপত্নী ব্যতিরিক্ত গুরুশিষ্যে, দুই গুরুভ্রাতায়, দুই গুরু-ভগিনীতে, বিভিন্ন গুরুর একই সাধন-ধর্ম্মাবলম্বী শিষ্যদ্বয়ে প্রয়োজন বুঝিয়া না চলিতে পারে, তাহা নহে। কিন্তু পুরুষ-গুরু ও স্ত্রী-শিষ্যের মধ্যে, স্ত্রী-গুরু ও পুরুষ-শিষ্যের মধ্যে, গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর মধ্যে (যাঁহারা দম্পতী নহেন) একেবারেই নিষিদ্ধ।

শক্তি-সাম্যের পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি আবশ্যক মত অভ্যাস হইয়া গেলে অথবা দাম্পত্য সাধক-সাধিকার ভিতরে উপযুক্ততা অনুভূত হইলে পরস্পরের দেহসংস্পর্শমূলক অথচ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা-বিরহিত নিম্নলিখিত প্রণালীগুলিও স্থলবিশেষে অনুসৃত হইতে পারে।

(৯) দ্বিতীয় প্রণালীর অভ্যাসকালে স্বামীর উত্তানভাবে রক্ষিত করতল-দ্বয়ের উপরে স্ত্রী তাঁহার করতল-দ্বয়ও উত্তানভাবে রাখিবেন। দ্বিতীয় প্রণালী মতে যাঁহারা উন্নতির পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা এই প্রণালী দ্বারা অধিকতর ফললাভ করিবেন।

(১০) তৃতীয় প্রণালীর অভ্যাসকালে স্বামীর উত্তানভাবে রক্ষিত করতলদ্বয়ের উপরে স্ত্রী তাঁহার করতলদ্বয়ও উত্তানভাবে রাখিবেন। ইহা তৃতীয় প্রণালীর অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

(১১) করে কর রাখিয়া পঞ্চম প্রণালীর অভ্যাস করিতে হইবে। যাঁহার করতল যখন নিম্নে থাকিবে, তিনি তখন শ্বাসগ্রহণ বুঝাইতে অপরের করকেন্দ্রে নিজ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃদু চাপ দিয়া এবং প্রশ্বাসত্যাগ বুঝাইতে অপরের করকেন্দ্র হইতে নিজ অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া নিয়া ইঙ্গিত করিবেন। ইহা পঞ্চম প্রণালী অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

(১২) করে কর রাখিয়া ষষ্ঠ প্রণালী অভ্যাস করিতে হইবে এবং একাদশ প্রণালীতে কথিত কৌশলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস মিলাইতে হইবে।

(১৩) দীক্ষাপ্রাপ্ত নামের একাক্ষর বীজ-মন্ত্র "সহজায়াম"·প্রাণায়ামে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বল-প্রয়োগ-বর্জ্জিত স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত

জপ করিতে করিতে করে করতল রাখিয়া ভ্রূমধ্যসেবী মুদ্রিত নয়নে স্বয়ংস্ফূর্ত্ত দিব্য-রূপের প্রতীক্ষা করতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস, আভ্যন্তর-বৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি মিলাইয়া এই চারিটী অবস্থায় ক্রিয়া করিতে হইবে। শ্বাস গ্রহণের পরে এবং প্রশ্বাস ত্যাগের আগে যে স্বল্পকাল শ্বাসবায়ু স্থির থাকে, তাহার নাম আভ্যন্তর বৃত্তি। প্রশ্বাস ত্যাগের পরে এবং শ্বাস গ্রহণের আগে যে স্বল্পকাল শ্বাসবায়ু স্থির থাকে, তাহার নাম বাহ্যবৃত্তি। কথিত আছে, শক্তিসাম্যের প্রণালী-সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরাকাষ্ঠা।

উল্লিখিত দেহস্পর্শমূলক **শক্তিসাম্যের অভ্যাসকালে** যদি দৈবাৎ **কামোত্তেজনা** উদ্দীপ্ত হয়, তাহা হইলে শক্তিসাম্যের নিম্নলিখিত প্রণালীগুলি অভ্যাসে অভাবনীয় ফলোদয় ঘটিবে।

(১৪) করে করতল সংন্যস্ত করিয়া পরস্পরের শ্বাস-প্রশ্বাসে মিল রাখিয়া গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করিবার কালে শ্বাস-গ্রহণ ও আকুঞ্চন পরিহার করিবার কালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্বিনীমুদ্রার * অভ্যাস করিতে হইবে।

(১৫) করে করতল সংন্যস্ত করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে মিল রাখিয়া উপস্থ আকর্ষণকালে শ্বাস-গ্রহণ ও আকুঞ্চন-পরিহার-কালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ধিনী-মুদ্রার † অভ্যাস করিতে হইবে। কিন্তু একটী বিষয়ে সাবধানতার আবশ্যকতা এই যে, অশ্বিনী-মুদ্রা অভ্যাসের অব্যবহিত পর ব্যতীত কখনও সন্ধিনী-মুদ্রা করা কর্ত্তব্য নহে।

(১৬) স্বামী ও স্ত্রী সকল বিষয়ই চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ প্রণালীর মত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে অশ্বিনী ও সন্ধিনী-মুদ্রা অভ্যাস করিতে থাকিবেন।

পূর্ব্বোক্ত নবম হইতে ত্রয়োদশ সংখ্যক দেহ-স্পর্শ-মূলক শক্তিসাম্যে যাহাদের কামোত্তেজনা ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহারাও চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ-সংখ্যক প্রণালীর অভ্যাসের দ্বারা বিশেষভাবে লাভবান্ হইবেন, যেহেতু এই প্রণালী-ত্রয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযমের সামর্থ্য ও কামদমনের শক্তি অসাধারণরূপে বর্দ্ধিত হয়। যাহা ইন্দ্রিয়-সংযমের সামর্থ্য বাড়ায়, তাহা প্রয়োজন-স্থলে ইন্দ্রিয়োপভোগেরও সামর্থ্য বাড়ায়।

যে সকল দম্পতী এক শয্যায় শয়ন করেন, তাঁহাদের জন্য গৃহস্থ

* "সংযম-সাধনা" দশম সংস্করণ ১৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "সংযম-সাধনা" ১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহাপুরুষেরা আরও দুইটী শক্তিসাম্যের প্রণালী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। একটির নাম "কন্যকা-প্রণালী", অপরটির নাম "শৃঙ্গারী-প্রণালী।

শক্তিসাম্যের কন্যকা প্রণালী

কন্যকা-প্রণালীতে পত্নী স্বামীর বক্ষে নিজ পৃষ্ঠ রাখিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং উভয়ে পরস্পরের শ্বাসের সহিত শ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত প্রশ্বাস মিলাইয়া অবিরাম ইষ্টনাম জপ করিতে থাকিবে। বিশ্বের পিতা বিশ্বের কন্যাকে বক্ষে ধরিয়াছেন, বিশ্বের কন্যা বিশ্বের পিতার বক্ষে আশ্রয় নিয়াছেন,—অন্তরের ভাব ইহাই হইবে।

শক্তিসাম্যের শৃঙ্গারী-প্রণালী

শৃঙ্গারী-প্রণালীতে স্বামী নিজ বাম পার্শ্বে ও পত্নী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করতঃ পরস্পর বক্ষসংলগ্ন ও একান্ত সন্নিহিত হইবে এবং উভয়ে উভয়ের শ্বাসের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রশ্বাস মিলাইয়া অবিরাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ করিতে থাকিবে। বিশ্বের সকল কান্ত বিশ্বের সকল কান্তাকে অনন্ত প্রেমে নিজেতে গ্রহণ করিতেছেন, বিশ্বের সকল কান্তা বিশ্বের সকল কান্তের ভিতরে নিজেকে নিমজ্জিত করিতেছেন,—অন্তরের আবেগ ইহাই হইবে।

এক দম্পতীর সাধনে বিশ্বের সকল দম্পতীর সাধন পরিপূর্ণতা পাইতেছে, এই বিশ্বাসই এই প্রণালীদ্বয়ের মূল ভিত্তি। এতদুভয় প্রণালী অভ্যাসকারীদের শয়নকালীন বস্ত্র, শয্যা, শরীর, মুখমণ্ডল, হস্ত, পদ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে ধৌত এবং পরিষ্কৃত থাকা সঙ্গত।

একটী স্বামীর পূর্ণতা লাভের চেষ্টার মধ্য দিয়া বিশ্বের সকল স্বামীর পূর্ণতা সাধিত হইতেছে, একটী পত্নীর পূর্ণ প্রশান্তি লাভের মধ্য দিয়া বিশ্বের সকল পত্নীর পূর্ণ প্রশান্তি অর্জ্জিত হইতেছে, অন্তরে এই ভাবে

বিশ্বাত্মা-সাধন

পরিপুষ্ট করিয়া তাহার উপরে মনকে স্থিতিশীল করা জগতের এক সুমহৎ সাধন। ইহা একপ্রকার বিশ্বাত্মা-সাধন। পরমাত্মার সহিত নিজেকে অভেদ বলিয়া অনুভব করিতে অগ্রসর হইবার পথে ইহা একটী নির্ভরযোগ্য সোপান। বিবাহিত নরনারী ইচ্ছা করিলেই নিজেদের সীমাবদ্ধ শরীরে নিখিল বিশ্বের সকল শরীরকে এবং কোটি ব্রহ্মাণ্ডের শরীরীকে উপলব্ধি করিতে পারেন। বিষয়টী সূক্ষ্ম অনুধ্যানের এবং অপরিমেয় সাধন-সামর্থ্যের পয়িচায়ক।

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল ও রাত্রি,—এই চারিটীই শক্তি-সাম্যের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়। কিন্তু কন্যকা এবং শৃঙ্গারী প্রণালীদ্বয় একমাত্র শয়নকাল ব্যতীত বিধেয় হইতে পারে না।

শক্তিসাম্যের প্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই অথচ শক্তিসাম্যেরই বিশেষ সহায়তা করে, এমন আর একটি বিষয়ের এস্থানে অবতারণা করা প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিষয়টী **বিপরীত রমণ**।

বিপরীত রমণ মনেরই ব্যাপার

"বিপরীত রমণ" কথাটী তান্ত্রিক সমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহে কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ তথাকথিত তান্ত্রিকেরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন বলিয়াই আচার দৃষ্টে মনে হয়। বিপরীত রমণ ব্যাপারটা দৈহিক রমণ নহে, ইহাতে দেহের রমণ-সুলভ নগ্নতা ও আন্দোলনাদি নাই, ইহা মূলতঃ মনেরই ব্যাপার, ইহা আত্মিক রমণ বা সূক্ষ্ম রমণ। সাধারণ রমণের সহিত সুখাস্বাদন-বিষয়ে ইহার সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রক্রিয়া-বিষয়ে সাদৃশ্য নাই। রমণ-লালসা স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার একটা অপরিহার্য্য রূপ, অথচ নিজ-সুখেচ্ছা

সাধারণ রমণের সহিত বিপরীত রমণের পার্থক্য

এখানে প্রবল বলিয়া প্রকৃত সুখলাভ ইহার দ্বারা হয় না। প্রিয়জনের সুখসম্পাদনই যেখানে লক্ষ্য, সুখ আসে সেখানে। "বিপরীত রমণ" মানে সাধারণ রমণের উল্টা ব্যাপার। সাধারণ রমণে আত্মসুখেচ্ছা প্রধান, বিপরীত রমণে পর-সুখেচ্ছা প্রধান। পরসুখেচ্ছা যেখানে আত্যন্তিকরূপে প্রবল এবং আত্মসুখেচ্ছা একেবারেই মৃত, সেখানে ব্যাপারটা ত' দেহের অতীত নিশ্চয়ই হইবে। আত্মসুখ-সম্পাদনের কামনা যেখানে ছিন্নমূল এবং পরসুখকামনাই যেখানে একমাত্র প্রেরয়িত্রী, সেখানে বাহ্ ইন্দ্রিয়-চেষ্টা আপনিই থমকিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং "বিপরীত রমণ" ব্যাপারটা কিছুতেই দৈহিক রমণ নয়। "বিপরীত রমণ" কথাটির মানে এই নহে যে, দেহ দ্বারা স্বামী ও স্ত্রী রমণকার্য্য পরিচালিত করিবে এবং তৎকালে পুরুষ নারীবৎ রহিবে, নারী পুরুষবৎ হইবে। কিন্তু বিপরীত রমণের এইরূপ কদর্থ করিয়া অনেকে ধর্ম্মের নামে তাহা প্রচলনের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সমাজের অনিষ্ট সাধিয়াছেন। অথচ ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, দেহকে নিঃস্পন্দিত রাখিয়া অনগ্ন আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী পার্শ্বশায়িত অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে বিপরীত-লিঙ্গী বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইবে। বিপরীত রমণে স্বামী নিজেকে স্ত্রী বলিয়া এবং স্ত্রী নিজেকে স্বামী বলিয়া কল্পনা করিবে, সমগ্র দেহের এবং নিখিল ইন্দ্রিয়-গ্রামের লিঙ্গান্তরপ্রাপ্তি ধ্যান করিবে, কেশকলাপ

বিপরীত রমণের আত্মসুখেচ্ছা অপ্রবল

বিপরীত রমণের বৈশিষ্ট্য

হইতে আরম্ভ করিয়া চরণনখর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরটার স্ত্রীভাবপ্রাপ্তি ও পুরুষভাবপ্রাপ্তির ধ্যান করিবে। এই ধ্যানটাকে জমাইয়া তোলাই বিপরীত রমণের আসল বিশিষ্টতা। স্বকীয় ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বিপরীত পরিবর্ত্তন চিন্তনই বিপরীত রমণের মূল কথা। গৃহী সাধকেরা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বৈষম্য নিবাকরণকল্পে এই বিপরীত রমণের শক্তি অতীব আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিসাম্যের যাবতীয় প্রণালীর সহিত বিপরীত রমণের এক বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। স্বামিস্ত্রীর পারস্পরিক অপূর্ণতাকে পূর্ণ করা উভয়েরই লক্ষ্য, স্বামিস্ত্রীর বিভিন্নমুখিনী মনোগতিকে এক-মুখিনী করা উভয়েরই প্রত্যক্ষ ফল, কিন্তু "শক্তিসাম্যে" স্বামিস্ত্রীর নিজ নিজ জননেন্দ্রিয়ে চিত্তের কোনও অভি-নিবেশ নাই, বিপরীত রমণে তাহা আছে। শক্তিসাম্যের কোনও কোনও প্রণালীতে স্বামিস্ত্রীকে পাশাপাশি একাসনে বসিয়া নাম জপ করিতে হয়, কোনও কোনও প্রণালীতে মুখামুখী বসিয়া পরস্পর ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিয়া একের মুখমণ্ডলে অপরের মুখমণ্ডল ধ্যান করিতে হয়, কোনও কোনও প্রণালীতে বা শ্বাসে শ্বাস ও প্রশ্বাসে প্রশ্বাস মিলাইয়া উপবিষ্টভাবে অফুরন্ত নাম জপ করিতে হয়। "কন্যকা" ও "শৃঙ্গারী" প্রণালীর শক্তিসাম্যে ইহার চাইতেও অভিনব ব্যাপার রহিয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি জনন-যন্ত্রের চিন্তা নাই, সর্ব্বত্রই মনকে ঊর্দ্ধাঙ্গসেবী, বিশেষভাবে ভ্রূমধ্যসেবী, রাখিবারই ব্যবস্থা। কিন্তু বিপরীত রমণে জননাঙ্গের রূপান্তর চিন্তাই হইবে প্রাণবস্তু। আবার, সাধারণ রমণে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে, ব্যবহার আছে, মৈথুনের উদ্যম আছে, মৈথুনধর্ম্মী নানা অঙ্গবিকার আছে কিন্তু

বিপরীত রমণ ও শক্তিসাম্যের প্রভেদ

সাধারণ রমণের সহিত বিপরীত রমণের পার্থক্য

এখানে প্রবল বলিয়া প্রকৃত সুখলাভ ইহার দ্বারা হয় না। প্রিয়জনের সুখসম্পাদনই যেখানে লক্ষ্য, সুখ আসে সেখানে। "বিপরীত রমণ" মানে সাধারণ রমণের উল্টা ব্যাপার। সাধারণ রমণে আত্মসুখেচ্ছা প্রধান, বিপরীত রমণে পর-সুখেচ্ছা প্রধান। পরসুখেচ্ছা যেখানে আত্যন্তিকরূপে প্রবল এবং আত্মসুখেচ্ছা একেবারেই মৃত, সেখানে ব্যাপারটা ত' দেহের অতীত নিশ্চয়ই হইবে। আত্মসুখ-সম্পাদনের কামনা যেখানে ছিন্নমূল এবং পরসুখকামনাই যেখানে একমাত্র প্রেরয়িত্রী, সেখানে বাহ্য ইন্দ্রিয়-চেষ্টা আপনিই থমকিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং "বিপরীত রমণ" ব্যাপারটা কিছুতেই দৈহিক রমণ নয়। "বিপরীত রমণ" কথাটির মানে এই নহে যে, দেহ দ্বারা স্বামী ও স্ত্রী রমণকার্য্য পরিচালিত করিবে এবং তৎকালে পুরুষ নারীবৎ রহিবে, নারী পুরুষবৎ হইবে। কিন্তু বিপরীত রমণের এইরূপ কদর্থ করিয়া অনেকে ধর্ম্মের নামে তাহা প্রচলনের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সমাজের অনিষ্ট সাধিয়াছেন। অথচ ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, দেহকে নিঃস্পন্দিত রাখিয়া অনগ্ন আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী পার্শ্বশায়িত অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে বিপরীত-লিঙ্গী বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইবে। বিপরীত রমণে স্বামী নিজেকে স্ত্রী বলিয়া এবং স্ত্রী নিজেকে স্বামী বলিয়া কল্পনা করিবে, সমগ্র দেহের এবং নিখিল ইন্দ্রিয়-গ্রামের লিঙ্গান্তরপ্রাপ্তি ধ্যান করিবে, কেশকলাপ

বিপরীত রমণের আত্মসুখেচ্ছা অপ্রবল

বিপরীত রমণের বৈশিষ্ট্য

হইতে আরম্ভ করিয়া চরণনখর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরটার স্ত্রীভাবপ্রাপ্তি ও পুরুষভাবপ্রাপ্তির ধ্যান করিবে। এই ধ্যানটাকে জমাইয়া তোলাই বিপরীত রমণের আসল বিশিষ্টতা। স্বকীয় ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বিপরীত পরিবর্ত্তন চিন্তনই বিপরীত রমণের মূল কথা। গৃহী সাধকেরা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বৈষম্য নিবারকরণকল্পে এই বিপরীত রমণের শক্তি অতীব আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিসাম্যের যাবতীয় প্রণালীর সহিত বিপরীত রমণের এক বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। স্বামিস্ত্রীর পারস্পরিক অপূর্ণতাকে পূর্ণ করা উভয়েরই লক্ষ্য, স্বামিস্ত্রীর বিভিন্নমুখিনী মনোগতিকে এক-মুখিনী করা উভয়েরই প্রত্যক্ষ ফল, কিন্তু "শক্তিসাম্যে" স্বামিস্ত্রীর নিজ নিজ জননেন্দ্রিয়ে চিত্তের কোনও অভি-নিবেশ নাই, বিপরীত রমণে তাহা আছে। শক্তিসাম্যের কোনও কোনও প্রণালীতে স্বামিস্ত্রীকে পাশাপাশি একাসনে বসিয়া নাম জপ করিতে হয়, কোনও কোনও প্রণালীতে মুখামুখী বসিয়া পরস্পর ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিয়া একের মুখমণ্ডলে অপরের মুখমণ্ডল ধ্যান করিতে হয়, কোনও কোনও প্রণালীতে বা শ্বাসে শ্বাস ও প্রশ্বাসে প্রশ্বাস মিলাইয়া উপবিষ্টভাবে অফুরন্ত নাম জপ করিতে হয়। "কন্যকা" ও "শৃঙ্গারী" প্রণালীর শক্তিসাম্যে ইহার চাইতেও অভিনব ব্যাপার রহিয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি জনন-যন্ত্রের চিন্তা নাই, সর্ব্বত্রই মনকে ঊর্দ্ধাঙ্গসেবী, বিশেষভাবে ভ্রূমধ্যসেবী, রাখিবারই ব্যবস্থা। কিন্তু বিপরীত রমণে জননাঙ্গের রূপান্তর চিন্তাই হইবে প্রাণবস্তু। আবার, সাধারণ রমণে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে, ব্যবহার আছে, মৈথুনের উদ্যম আছে, মৈথুনধর্ম্মী নানা অঙ্গবিকার আছে কিন্তু

বিপরীত রমণ ও শক্তিসাম্যের প্রভেদ

বিপরীত রমণে তাহার কিছুই নাই। বিপরীত রমণে দেহের মিলন আছে কিন্তু সে মিলন সংযত ও সুরুচির অবিরোধী। ফলে ইহাকে শক্তিসাম্যের এক চরম প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে। বিপরীত রমণের স্থূল অবস্থা হইতেছে আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়া কিন্তু তার পরমুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ হইল রমণের সূক্ষ্ম গতি। তখন ধ্যান জমাইয়া নিতে হইবে,—

বিপরীত রমণের ক্রম

নিজ নিজ ইন্দ্রিয়গত রূপান্তরের। ধ্যান যখন জমিয়া উঠিল, তখন আরম্ভ হইবে উভয়ের শ্বাস-প্রশ্বাস মিলাইয়া অফুরন্ত নামজপ। নামজপ যখন জমিয়া উঠিল, প্রকৃত রমণসুখ তখন আপনি উন্মেষিত হইবে। একটী ইন্দ্রিয়ের রমণ নহে, প্রতি রোমকূপে তখন রমণ-সুখ আস্বাদিত হইতে থাকিবে। সম্ভোগ-লালসা হৃৎপিণ্ড চিবাইয়া খাইতেছে, কোনও 'যুক্তি-বিচার দিয়াই তাহাকে অপসারিত করা

বিপরীত রমণের সার্থকতা কি?

যাইতেছে না, কোনও বাধাই উদ্দাম প্রবৃত্তিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, এইরূপ পুরুষ ও নারীদের জন্যই তত্ত্বদর্শী যোগী বিপরীত রমণের কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিতান্ত আধুনিক যুগেও বিপরীত রমণ সাধনের দ্বারা উৎকট কামুকতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন, এমন ভাগ্যবান্ দম্পতীর সংখ্যা বড় অল্প নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অভ্যাসে অধিকারী, এমন কথা বলিতে পারি না। অত্যন্ত সরলচেতা ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা অনাবশ্যক, যেহেতু ইহা ব্যতীতই তাঁহারা কামজয়ী হইতে পারেন। অত্যন্ত দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিপজ্জনক, কারণ সঙ্কল্পে দৃঢ়তার অভাবহেতু প্রার্থিত জনের সান্নিধ্যমাত্র সংযমের বাধন ছিন্ন

বিপরীত রমণের নিষিদ্ধতা

হইয়া যাইতে পারে, মনকে ধ্যানমুখীন করিবার পূর্ব্বেই অবাধ্য পূর্ব্বসংস্কার দেহকে অবাঞ্ছনীয় অপকার্য্যে লিপ্ত করিতে পারে, উন্নতি লাভের লোভে ধাবিত হইয়া হঠাৎ দুরন্ত অধোগতিও ঘটিতে পারে। বিপরীত রমণ মধ্যচেতা পুরুষের পক্ষেই অবলম্বনীয় এবং স্বামি-স্ত্রী উভয়ের সংযমাগ্রহ যেখানে সমান তীব্র, সেখানেই ইহা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত অমৃতময় ফল প্রদান করিয়া থাকে।

শক্তিসাম্যের অনুকূল যে সকল প্রক্রিয়া গুপ্তভাবে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও কোনও কোনও মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে এখনও চলিতেছে, তাহা অনেকস্থলে সাধকগণের ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিচার-

শক্তিসাম্যমূলক কুরুচিপূর্ণ কদাচারসমূহ

পরায়ণতার অভাবে এবং গুপ্ততার সুযোগে নানা কুৎসিত কুরুচিতে ও কদর্য্য কদাচারে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই সকল গুপ্ত সঙ্ঘে (Esoteric Organisation) লোক-সংগ্রহ কিরূপ অদ্ভুত কৌশলে ব্যাপকভাবে হইতেছে, সাধারণের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। সমাজে যাহারা ধর্ম্ম-শিক্ষক, সাধক এবং তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, এইরূপ একশ্রেণীর লোকেরাই নানাবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা, যাহাদের কোনও প্রকার সামাজিক বন্ধন নাই, এমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইতে ভক্ত সংগ্রহ করিয়া এক একটী সংগুপ্ত সংঘ গঠন করিতেছে। ধর্ম্মাদর্শ ও তত্ত্বের বিচার করিতে গেলে (Phylosophy and Spiritual Principles) ইহাদের সহিত তর্কে জয়ী হওয়া বড় কঠিন কথা কিন্তু ইহাদের আচার (Practice)-সমূহ পুরুষের পরনারী-

ধর্ম্মের ভাণে কদাচারের প্রসার

সংসর্গ, নারীর পরপুরুষ-সংসর্গ এবং নারী ও পুরুষের বৃথা মৈথুনকে কখনও পরোক্ষে, কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও উভয়তঃ সমর্থন করিতেছে। ফলতঃ 'ইন্দ্রিয়-জয়ের পন্থা পাইয়াছি' ভাবিয়া 'ধর্ম্ম-সাধনা করিতেছি' ভাবিয়া, অকথ্য অনাচারে অসংখ্য ধর্ম্ম-পিপাসু গৃহী গোপনে নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। দাম্পত্য-জীবনে ইন্দ্রিয়-চেষ্টা-বিরহিত শক্তিসাম্যের বহুল প্রচলন হইলে, ধর্ম্মলাভার্থ ঐ সকল গুপ্ত ধর্ম্মসভায় যোগদানের প্রলোভন যে হ্রস্বীভূত হইবেই, ইহাতে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ ভক্তিধর্ম্মে ভগবানের সহিত মানবের যে পরমমধুর উজ্জ্বল প্রেমের কথা বর্ণিত আছে, বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তাহার স্ফুরণের অবকাশ বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা অধিক ঘটিলে, পরকীয়া-প্রীতির দৃষ্টান্ত যে-সকল সামাজিক দুর্নীতি আনয়ন করিয়াছে, তাহার

দাম্পত্য শক্তিসাম্য ও মোক্ষধর্ম্মের সহিত সংসার-ধর্ম্মের মিলন

প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের অকৌলিন্য হ্রাস পাইবে। জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং পরমা পরিতৃপ্তির সহিত যোগ নাই বলিয়াই বিবাহিত জীবনের সম্মান লাভের যোগ্যতা কমিয়াছে এবং ইহারই বিপরীত কারণে সন্ন্যাস-সাধনা কৌলীন্য লাভ করিয়াছে। মোক্ষধর্ম্মের সহিত সংসার-ধর্ম্মের এই যে বিরাট বিচ্ছিন্নতা, তাহা দাম্পত্য শক্তিসাম্যের দ্বারা বিদূরিত হইবে।

দৈনন্দিন জীবন

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে চিন্তাশীল সুধীবর্গ যে সকল সদ্গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, বিবাহিতেরা সেই সকল পাঠে নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্ম-তালিকা রুচি-অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লইও।

দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মতালিকা

দম্পতীর নিজ নিজ জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই কর্ম্ম-তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। কর্ম্ম-তালিকা তৈরীর সময়ে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও যে, একবার তালিকা তৈরী করিয়া সহজে আর তাহা লঙ্ঘন করা হইবে না বা সামান্য কারণে তাহাতে পরিবর্ত্তন-সাধন করিবে না। নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ-সহকৃত অনুশীলন না থাকিলে কর্ম্ম-তালিকা শুধু একটা হাসির খোরাকে পরিণত হইবে। জীবনকে উন্নত করিবে, মহৎ করিবে, সম্প্রসারিত করিবে, বিশ্বতোমুখ বিস্তার দিবে,—ইহারই উপায়-স্বরূপে তুমি তোমার কর্ম্মতালিকা প্রণয়ন করিয়াছ, এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

আমরা এইখানে দৈনন্দিন জীবনের একটা সাধারণ ছক্ কাটিয়া দিতেছি। নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী তাহার মধ্যে যাহা যাহা পরিবর্ত্তনীয়, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া লইও। যোগ্যতর ব্যক্তির প্রত্যক্ষ উপদেশ যাহারা পাইবে, তাহারা সেই উপদেশকে অনুসরণ করিয়া চলিও। "আমার মতই শ্রেষ্ঠ মত",—গ্রন্থকারের এরূপ কোনও গোঁড়ামি নাই। বস্তুতঃ, এক অজীর্ণ রোগেরই রোগিভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা চিকিৎসকদিগকে দিতে কি দেখা যায় না? যাহারা উৎকৃষ্টতর উপদেশ পাইতেছে না, তাহারা গ্রন্থকারের উপদেশ অনুসরণ করিবার

চেষ্টা করিবে। কিন্তু স্থানাভাব-প্রযুক্ত এখানেও সকল বিষয় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইল না।

গাত্রোত্থান

রাত্রি অন্ততঃ এক ঘণ্টা থাকিতে গাত্রোত্থান বিধেয়। ইহা সম্ভব করিতে হইলে শুইবার সময়ে বেশী রাত্রি করিতে নাই। রাত্রিতে বারংবার জাগিবার কদভ্যাস বা অনিদ্রা-রোগ থাকিলে তাহারও প্রশমন প্রয়োজন। উপায় হইতেছে,

(ক) শয়নকালে নাভিমূলে (ভ্রূমধ্যে নহে) ধ্যান করিয়া নিদ্রাগত হওয়া,

(খ) স্নানকালে নাভিতে একশত ঘটি জল ঢালিয়া নাভিমূল শীতল করা,

(গ) "আমার সুগভীর নিদ্রা হইবেই এবং আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগিবই",—প্রত্যহ শয়ন-কালে এইরূপ সঙ্কল্প করিবার অভ্যাস করা।

অবশ্য এলার্ম-টাইমপিসে দম দিয়া সময় মত জাগিবার ব্যবস্থা মন্দের ভাল।

প্রাতরুত্থানে বিঘ্ন

যাহাদিগকে রাত্রি জাগিয়া চাকুরী করিতে হয়, যাহারা যাত্রা-থিয়েটার গান-বাজনা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে রাত জাগে, যাহাদের ইন্দ্রিয়লিপ্সা রাত্রিজাগরণ বাধ্যকর করে, যাহাদিগকে রোগীর শুশ্রূষায় রাত কাটাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে একঘণ্টা রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ কঠিন এবং ক্ষতিকর। রাত্রি-জাগরণের কারণ-সমূহ যথাসাধ্য দূর করিয়া চলিবার চেষ্টা তাহাদের প্রয়োজন। কারণ, সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্ববর্তী প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে অত্যদ্ভুত ভেষজ ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহা জাগ্রত

ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। বেদ-রহস্য-পারঙ্গম ব্যক্তি-দিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে যে সর্ব্বরোগহর দেববৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা নাকি দিন ও রাত্রির দুই সন্ধিস্থলের দুই প্রদোষ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, সমগ্র রাত্রিতে ঊর্দ্ধাকাশ হইতে যে প্রচুর অ্যামোনিয়া বাষ্প ভূপৃষ্ঠে আসিয়া জমিয়া থাকে, ভোরের বেলায় তাহা মানুষের ফুসফুসের পক্ষে সহজ-গ্রাহ্য রূপ ধরিয়া সূর্য্যোদয়ের স্বাভাবিক প্রভাবে ক্রমশঃ পুনঃ ঊর্দ্ধসঞ্চারী হইতে থাকে। এজন্যই উষা-কীর্ত্তন, প্রাতর্ভ্রমণ আদি কাজ শরীরের দিক দিয়া বিশেষ হিতকর।

প্রাতঃকৃত্য

প্রাতঃস্নান অভ্যাস না থাকিলে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ, ব্যায়াম ও হস্ত-পদ-দন্ত-মুখাদির পরিমার্জ্জন করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করতঃ পবিত্র আসনে পবিত্র চিত্তে উপাসনা করিতে বসিবে। রাত্রিতে শয়ন-কালের উপাসনা বিছানায় বসিয়াই করিতে পার এবং যে বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করিবে, সেই-বস্ত্র-

বস্ত্র ও আসনের পবিত্রতা

পরিহিত অবস্থায়ই জপ, ধ্যান, উপাসনাদি করিতে পার, কারণ, উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবানের কাজ করিতে করিতে নিদ্রাগত হওয়া, যেন ঘুমের ঘোরেও মন অন্য দিকে ধাবিত না হয়। কিন্তু প্রাতঃকালীন উপাসনা প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার নূতন দিনের নূতন সূচনা। এই সময়কার উপাসনায় বস্ত্রের ও আসনের শুচিতা অবশ্যই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শুধু এই পবিত্র কার্য্যেরই জন্য যে বস্ত্র বা আসন রক্ষিত হইয়াছে, এই সময়ে তাহাই ব্যবহার করিবে।

প্রার্থনা ও নাম জপ

ভগবানের নিকট বহুবাক্যযোগে নানাবিধ প্রার্থনাদি করা অপেক্ষা তাঁহার কোনও একটী পবিত্র নাম

এক-মনে এক-প্রাণে দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া জপ করা অধিকতর ফলপ্রদ। অবশ্য এই বিষয়ে কাহারও ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপরে আমরা অত্যাচার করিতে চাহি না। প্রথমতঃ দুই একটী সুমধুর স্তোত্র পাঠ করিয়া তৎপর নামজপ আরম্ভ করিলে মনঃসন্নিবেশন শীঘ্র হয়। স্তোত্র নির্ব্বাচন করিতে নিজের মনের গতি ও রুচি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে। স্তোত্রের পর স্তোত্র আর নানা-বিষয়ক স্তোত্র পাঠ করিয়া মনকে বিভিন্ন-মুখ করিবার ভিতরে শ্রম অত্যধিক, লাভ অত্যল্প। একটি সুনির্ব্বাচিত স্তোত্র প্রত্যহই পাঠ করিতে করিতে স্তোত্রের প্রতিটি অক্ষরের মধ্য হইতে তাহার মধুরস নিঃস্রাবিত হইতে থাকে, যাহার অর্থ পূর্ব্বে বুঝা যায় নাই, কতককাল পরে তাহার অর্থ বিনা আয়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। নামজপে যেমন একনিষ্ঠা হিতকর, স্তোত্রপাঠেও তদ্রূপ জানিবে। সাংসারিকই বল আর আধ্যাত্মিকই বল, একনিষ্ঠার মত প্রয়োজনীয় জিনিষ আর কিছুই নাই। যে একনিষ্ঠ, সাধনে সিদ্ধিলাভ তাহার পক্ষেই সম্ভব। লক্ষ্যে পৌছিতে পারিব না অথচ শরীর ও মনকে গাধা-খাটুনি খাটাইব, ইহা বেহিসাবী কাজ। জপ করিতে প্রত্যহ একই নামের আশ্রয় লইবে। নিত্য নূতন নাম জপ করিলে নামের ভিতরের রসের আস্বাদন পাওয়া যায় না। একই নামকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন অবিচলিত নিষ্ঠায় অগ্রসর হইলে ক্রমে নাম হইতে প্রেম ও আনন্দ উপজাত হয়, শক্তি ও ভক্তি জাগ্রত হয়, সংযম ও শান্তি প্রসূত হয়। স্বামী ও পত্নীর উভয়ের একই নাম জপ করা বিশেষ হিতকর,

স্তোত্র ও নামজপ

স্তোত্র ও জপে একনিষ্ঠা

নামজপ ও প্রেম

একথা অন্যত্র বলিয়াছি। যাহারা একই গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত, তাহারা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্ন গুরুর আশ্রিত হইয়া থাকিলে উভয়ের সাধন-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা করাইয়া তৎপর অগ্রসর হওয়াই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমীচীন। কিন্তু এই বিষয়েও হঠকারিতা করিয়া কিছু করা উচিত নহে। যেখানে স্বামী ও পত্নীর মধ্যে সুগভীর প্রেম নাই, সেখানে এরূপ সামঞ্জস্যের প্রয়াস বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ধীরতা ও বিবেচনার বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে। যাহারা দীক্ষিত নহ বা প্রাপ্ত দীক্ষায় বিশ্বাসী নহ বা কোথাও গিয়া দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক বা আগ্রহী নহ, তাহারা মনোভিমতানুযায়ী একটী নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া জপ করিবে। যাহারা গায়ত্রী মন্ত্রে বিশ্বাসী, তাহারা উহা জপ করিতে পার।

স্বামিপত্নীর সাধন-সাম্য

দীক্ষায় অবিশ্বাসীর নামজপ

গায়ত্রী তথা প্রণবমন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত মত অতীব উদার এবং ব্যাপক। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে অনেকেই এই ভাবে বিষয়টীকে বিচার করেন নাই। আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকে আমাদের উদার বিশ্বাস ও উদার মতামতের জন্য আমাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী, ধর্ম্মদ্বেষী, কালাপাহাড়, নাস্তিক এবং লোক-প্রবঞ্চক প্রভৃতি সুমধুর আখ্যায় আপ্যায়িত করিয়াছেন। ঐ সকল কটূক্তিকে আমরা স্তুতির শেফালী-বর্ষা বলিয়া গণনা করিয়া নির্ভয়ে নিজেদের মত সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছি এবং করিব। শাস্ত্র আমাদের সমর্থন করেন, না বিরোধ করেন, এই সকল দুশ্চিন্তা আমরা করি নাই। আমাদের মনে এই একটী আক্ষেপোক্তি প্রত্যহ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে যে, এত

বড় শঙ্করাচার্য্য, যিনি বিনা অস্ত্রে সমগ্র ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্জ্জিত করিলেন, তিনি কেন এমন শক্তি বা এমন শস্ত্র জাতিটার বাহুতে বা করযুগে দিয়া যাইতে পারিলেন না, যাহাতে পশ্চিমাগত দুর্দ্দান্ত ইস্‌লামের ভারত-প্রবেশ বন্ধ করা যাইত। কি সেই ত্রুটী, যাহা ভারতের আদি সভ্যতার গর্ব্বকারীদিগকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদের পদাঘাত আহরণেই নিয়োজিত করিয়া রাখিল ! কি সেই মহাবস্তু, যাহার অধিকার হইতে জাতির অধিকাংশ নরনারীকে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার দরুণ, ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারীরা কদাচ জীবনের কুরুক্ষেত্রে একত্র-সংনদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে পরস্পরের আত্মীয় ভাবিয়া একের জন্য অপরে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিল না ? সোমনাথ বা বিশ্বনাথের মন্দির যখন লুণ্ঠিত হইল, তখন কতিপয় পুরোহিতই প্রাণ দিল, কেন তাহাদের যজমানবর্গ আসিয়া উদ্যত খড়্গের সম্মুখে উন্নত শির আগাইয়া দিতে পারিল না ? কেন "বানিয়াকী লেড়কী" ধর্ষিতা হইলে ব্রাহ্মণগণের অন্তরে বেদনার সঞ্চার হয় না ? কেন সমাজ হইতে দলে দলে পুরুষ ও নারীকে কেবল ভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করা হইতেছে কিন্তু কেন, কি জন্য, কি কারণে, কোন্ সুমহৎ লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া চতুর্দ্দিকের কোটি কোটি অনার্য্য বংশধরদিগকে স্বসমাজের ভিতর গ্রহণ করা হইতেছে না ? গীতা এবং চণ্ডী আরও হাজার খানা শাস্ত্র-গ্রন্থের সহিত গঙ্গাজলে আর তুলসীর রসে ভিজাইয়া পাচন সেবন করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বসিয়া আছি যে, আমরা অমর, আমাদের লয় নাই, আমাদের ক্ষয় নাই, আমাদের বিনাশ নাই, বিলোপ নাই, ক্ষয় আর ধ্বংস হইবে শুধু তাহাদের, যাহারা নিজেদের সমাজকে সংখ্যাপুষ্ট, বলশালী, সঙ্ঘবদ্ধ, ঐক্যবোধবিশিষ্ট করিবার জন্য কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কেবলই প্রয়াস

পরিচালন করিতেছে এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাহারা বারংবার নানা দেশের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া নিজেদিগকে পার্থিব প্রভুত্বের চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করাইতেছে। আমরা অনুভব করিয়াছি যে, সাধনের ব্যাপারে সকলকে শ্রেষ্ঠাধিকার প্রদান কর্ত্তব্য, যদি সেই শ্রেষ্ঠ সাধনে তাহাদের রুচি, আগ্রহ, চেষ্টা ও প্রবৃত্তি থাকে। জগতের শ্রেষ্ঠ সাধনটীকে মুষ্টিমেয় কয়েকটী পরিবারের বংশানুক্রমিক সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া না রাখিয়া ইহার অধিকার আগ্রহী পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বিস্তারিত করা আবশ্যক। মহাবস্তুর অধিকার প্রত্যেকে সমভাবে না পাইলে জাতিতে জাতিতে সাম্যবোধ ও পরমা প্রীতি কদাচ আসিবে না। ততকাল একদল অপর দলকে শুধু দাবাইয়া রাখিয়া পদধূলি বিতরণ করিবে এবং অন্যদল চিরকাল নিজেদিগকে দাস ও অধম জানিয়া উত্তম অধ্যবসায় হইতে নিজেদিগকে দূরে রাখিবে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে স্থানে বলা হইতেছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানেরাই শুধু প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপের অধিকারী, সেই স্থলে তাঁহারা নিজেরা প্রণব জপ পরিহার করিয়া অন্যতর মন্ত্রসমূহকে নিজেদের সিদ্ধমন্ত্র করিয়াছেন। ইহাকেই বলে,—'Dog in the manger policy' ইহা নিতান্তই একটা ইংরাজী প্রবচন। ঘোড়ার আস্তাবলে ঢুকিয়া এক সারমেয় ঘোড়ার খাবারের পাত্রটীর মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে। সে নিজেও ঐ খাদ্য খাইবে না, ঘোড়াকেও খাইতে দিবে না। তার্কিকেরা বলিবেন, তুলনাটী ঠিক হইল না। খাদ্যটী হইতেছে প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী। ইহা ব্রাহ্মণেরই খাদ্য। ইহা স্ত্রীলোক ও শূদ্রের খাদ্য নহে। সুতরাং ইহা অপাত্রে রক্ষিত হইলে স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে ইহা খাইতে বারণ করা

সকলকে সাধনের শ্রেষ্ঠাধিকার প্রদান কর্ত্তব্য

ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এমন কি, অন্য হাজার কর্ম্মে অবহেলা করিয়াও এই কাজটী ব্রাহ্মণকে করিতেই হইবে। নতুবা ধরণী রসাতলে যাইবে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ধর্ম্ম লুপ্ত হইবে, চন্দ্র-সূর্য্য আলো দেওয়া বন্ধ করিবেন, মর্ত্ত্যভূমি নরকে পরিণত হইবে, অসুরকুলের দাপটে পৃথ্বীমাতা নিরন্তর অশ্রু-বর্ষণ করিবেন, মানবজাতি পশুকুলের পর্য্যায়ে আসিয়া নামিবে এবং কীটের অধম জীবন যাপন করিবে। এক দিক দিয়া তাঁহাদের কল্পিত আশঙ্কা সত্য সত্যই অতীব কঠিন, অতীব কঠোর, অতীব নির্ম্মম, অতীব নিষ্ঠুর এক বাস্তবে আসিয়া পরিণত হইয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্যের আলোক-বিতরণ কার্য্যটী বন্ধ হয় নাই, নতুবা অপর প্রতিটী আশঙ্কা এক আতঙ্ক-জনক সত্যের রূপ নিয়াছে। এবং তাহার কারণ স্ত্রীলোক আর শূদ্রের প্রণবব্রহ্মগায়ত্রী জপ নহে, তাহার কারণ,

ধর্ম্ম লুপ্ত হইলে কি ঘটিবে?

(১) ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ্য-চিন্তাধারার অনুবর্ত্তনে বসুধাময় কুটুম্ব সৃষ্টিতে নিয়োগ করার অক্ষমতা,

(২) ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পারস্পরিক আত্মকলহকে উন্নততর কোনও আদর্শবাদের প্রেরণায় দূর করিয়া দিয়া সকলের মধ্যে সার্ব্বভৌম ঐক্য রাখার চেষ্টায় উদাসীনতা,

পবিত্র ভারতভূমি নরকে পরিণত হওয়ার কারণ

(৩) দেশ বা রাষ্ট্র বহিঃশত্রুর দ্বারা বিপন্ন হইলে সকল ক্ষত্রিয়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তির পিছনে ছোট-বড় ও স্ত্রী-পুরুষ যাবতীয় প্রজাবর্গের স্বতঃউৎসারিত ত্যাগশক্তিকে, আত্মদানের সামর্থ্যকে, ধর্ম্মরক্ষার আগ্রহকে একত্র-সংনদ্ধ ও ব্যূহবদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টার অভাব এবং এই বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা-বোধের একান্ত অনুপস্থিতি।

ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দিন স্ত্রীশূদ্রের প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিবার দুরাশার কুফল নহে, তাহার প্রধান কারণ উপরে লিখিত তিনটী ব্যাপার।

সুতরাং যাঁহারা গায়ত্রী বা প্রণবমন্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁহারা উহাই জপ করিবেন। যাঁহারা অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত বা প্রণব-গায়ত্রীজপে নিজেদের গুরুদেবের দ্বারা প্রতিরোধিত, তাঁহারা অন্য মন্ত্রই জপ করিবেন। গুরু-দেবের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া জপাজপির মধ্যে লাভ নাই। আমরা তেমন কার্য্যে কাহাকেও উৎসাহ দেই না।

গায়ত্রী ব্রাহ্মণের মন্ত্র; জাতিব্রাহ্মণের নহে, কর্ম্মব্রাহ্মণের মন্ত্র। অতীব প্রাচীন মন্ত্র বলিয়াই যে গায়ত্রী মন্ত্রের কৌলীন্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা নহে, গায়ত্রী মন্ত্র বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয় যে, কোটি-বিশ্ব-প্রসবিতার বরেণ্য স্বতঃপ্রকাশ তেজের ইহা ধ্যানমন্ত্র, তিনিই যে আমার সকল মেধা, বুদ্ধি, মনীষার একমাত্র পরিচালক, ইহা তাহারই স্মারক-মন্ত্র, অনন্ত ঊর্দ্ধের সহিত অনন্ত অধের পরিপূর্ণ মিলন ও সামঞ্জস্যের ইহা গীতিঝঙ্কারময়ী গায়কী। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, বেদের সার গায়ত্রী (বা বেদমাতা গায়ত্রী) আর গায়ত্রীর সার প্রণব। কুসংস্কার বশতঃই এইরূপ বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে ব্রাহ্মণের বংশে না জন্মিলে এবং পুরুষ না হইলে গায়ত্রীর উচ্চারণ নিষিদ্ধ। অবশ্য "কুসংস্কার" শব্দটার ব্যবহারে কতক আবেগশীল মনে বেদনার সঞ্চার হইবে। তাই ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে যে, কুসংস্কার কাহাকে বলে। কোনও একটা কাজ বারংবার করিতে করিতে মনের উপরে একটা ছাপ পড়িয়া যায়, যেই ছাপ আর সহজে মনোগাত্র হইতে তুলিয়া নেওয়া যায় না।

ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র

কুসংস্কার ও সুসংস্কার

ইহার নাম সংস্কার। যে সংস্কারের ফল শুভ, তাহা সুসংস্কার। যে সংস্কারের ফল অশুভ, তাহা কুসংস্কার। ব্রাহ্মণের সন্তান সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত হইয়া একতানমনে ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিলে তিনি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইবেন, ইহা সুসংস্কার। কিন্তু অপর কেহ গায়ত্রী জপ করিলে রাজাকে আসিয়া সেই ধৃষ্টতার দণ্ড স্বরূপ মুণ্ড কাটিতে হইবে, ইহা কুসংস্কার। পুণ্য হইবে এই লোভে, নাগারা, শুধু পরাক্রান্ত শত্রুকেই নহে, অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে একাকী পাইয়া এবং অসহায়, রুগ্ন, শিশু বা বালিকাকেও গোপনে হত্যা করিয়া তাহার মুণ্ড অর্জ্জন করিয়া পুণ্যবল সংগ্রহ করিয়াছে,—এইরূপ কথা বহু নৃতাত্ত্বিকের ও সরকারী অনুসন্ধানের রিপোর্টে পাওয়া যায়। যে সংস্কারের বশে নাগাদের মনে এই বিশ্বাস প্রতিরোপিত হইল যে, এইরূপ নরহত্যার দ্বারা গৃহ, গ্রাম ও গোষ্ঠীর অশুভ দূরীভূত হইবে, সেই সংস্কার কুসংস্কার। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়া ও আজটেক সভ্যতার ইতিহাস বলিতেছে, কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুরোহিতের ইচ্ছানুসারে একই দিনে পাঁচহাজার নরবলি হইয়াছে। উদ্দেশ্য হইতেছে পুণ্য সঞ্চয় এবং বলির পশুরা হইতেছে প্রতিবাদে অক্ষম অসহায় দরিদ্র মানুষ। যেরূপ সংস্কার এরূপ পাশব-কার্য্যে পুণ্য-বোধ জন্মায়, তাহা কুসংস্কার। প্রাচীন কৌশাম্বীর খননকার্য্যের ফলে একটী যজ্ঞবেদীর আবিষ্কার হইয়াছে এবং বেদিকার নিকটে নর-করোটি এবং কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহার সঠিক তাৎপর্য্য এখনো জানা যায় নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন,—ইহা বোধহয় একেবারে বাজসনেয় পদ্ধতির একটী নরমেধ যজ্ঞের নিদর্শন। পুণ্য, কল্যাণ, শক্তি ও অলৌকিক অনুগ্রহের লোভেই মানুষ একদা এরূপ কুকার্য্য করিয়াছে। যে সংস্কার এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে মানুষকে প্রণোদিত করিতে পারে, তাহা কুসংস্কার। ব্রহ্মগায়ত্রী

জপ করিয়া, হোম করিয়া, তপস্যা করিয়া মহর্ষি দধীচি ব্রহ্মতেজে দীপ্ত হইলেন এবং নিজ ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় দিলেন, বহুবার যে ইন্দ্র তাঁহার শত্রুতা করিয়াছে, সেই ইন্দ্রের কুশলে তনুত্যাগ করিয়া। যে মানস সংস্কার দধীচিকে আত্মদানের দৃঢ়তা দিল, তাহা সুসংস্কার। আর ব্রাহ্মণ্য-শাসনের যুগে যে সংস্কারের অধীন হইয়া ক্ষত্রিয় রাজারা ধর্ম্মচর্য্যা করার দরুণ অব্রাহ্মণ সন্তানকে প্রাণদণ্ড দিতেন, সেই সংস্কার কুসংস্কার। মানুষকে মানুষের অধিকারটুকু দিতে কুণ্ঠিত ছিল বলিয়াই ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা আজ চিরতরে সাগর-জলে ডুবিয়া গিয়াছে, মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে কণা মাত্র কুণ্ঠা ছিল না বলিয়াই ইস্‌লামের কৃপাণ একদা স্পেনের আকাশ হইতে শুরু করিয়া যাভা, সুমাত্রা, মালয়ের সূর্য্যকিরণেও ঝলকিত হইয়াছে। "যত্র জীব, তত্র শিব",—এটা আমাদের দেশেরই বুলি কিন্তু মুখেই আমরা ভাল ভাল বেদান্ত-বাণী আওড়াইয়াছি, মানুষকে মানুষের অধিকার দেই নাই, দিতে চাহি নাই, নিজেরা সাম্প্রদায়িক খণ্ডীয়তার দরুণ জপ করিয়াছি প্রণবেতর ভিন্ন মন্ত্র এবং সর্ব্বসাধারণকে প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী হইতে বঞ্চিত রাখিবার জন্য কেবল আন্দোলন আর আস্ফালন চালাইয়াছি। যেই মনঃসংস্কার এই অকারণ অধ্যবসায়ে ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য, শ্রেষ্ঠত্ব, অতুল মাহাত্ম্য এবং মতিবুদ্ধিকে নিয়োজিত রাখিল, তাহা কুসংস্কার। আর্য্য-সমাজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সভাসমিতি করিয়া, ব্রাহ্ম-সমাজ আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়া তাঁহারা যথেষ্ট প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যসমাজ ভ্রান্ত, ব্রাহ্মসমাজ নাস্তিক এই সকল প্রচারে মন না দিয়া তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রাণের প্রাচুর্য্যটুকুকে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যপালনের সার্থকতা প্রচারেই লাগাইতেন এবং আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণে, স্ত্রী-পুরুষ

নির্ব্বিশেষে এবং হিন্দু-অহিন্দুর বিচার না করিয়া মানুষ মাত্রকেই সংযমী, সদাচারী, বীর্য্যধারণপরায়ণ, শুচি ও মানবোচিত পবিত্রতায় মণ্ডিত হইতে আহ্বান জানাইতেন, আজ তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সমগ্র দেশ মাথায় তুলিয়া নাচিত। প্রায় চুয়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন ব্যাপক ভাবে ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে আদা-নূন খাইয়া নামিয়া গিয়াছিলাম, তখন দুই একটী মুসলমানের ছেলেও নিজ সমাজের যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব কি করিয়া প্রচার করা যায়, তদ্বিষয়ে বুদ্ধি, পরামর্শ ও প্রেরণা নিতে আসিত, কিন্তু কৈ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে ত তখন একাজে অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই! বরং দুই একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি যে, শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য অশাস্ত্রীয়। যাহা কাণে শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। অত্যুক্তি করিতেছি না। কে কাহার ঘরে বসিয়া নিজ মনোঽভিমতানুযায়ী বা নিজ গুরুর নির্দ্দেশানুসারে কি মন্ত্র জপ করিল, তাহা নিয়া দুশ্চিন্তা করিয়া লাভ নাই। ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজারা আজ দেশ শাসন করিতেছেন না যে, শূদ্রেরা ঘরে বসিয়া কি জপ করে, তাহা নিয়া গুপ্তচরেরা অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িবে এবং ব্রহ্মতেজচর্চ্চিততনু ব্রহ্মর্ষিরা শূদ্রের মুণ্ডচ্ছেদের দৃশ্য দেখিয়া প্রহর্ষ অনুভব করিয়া বলিবেন,—ইক্ষ্বাকুবংশের রাজত্ব অনন্তকাল অব্যাহত থাকুক।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণের আসল ভ্রান্তি

প্রকৃত প্রস্তাবে যে-কেহ পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার ও কৃপা লাভ করিতে চাহে, যে-কেহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে চাহে, "আমার সমস্ত মেধা, বুদ্ধি, অনুভূতি পরমেশ্বরেরই দান",—এই উপলব্ধি যে-কেহ লাভ করিতে চাহে, ব্রহ্মগায়ত্রী জপে তাহারই অধিকার আছে। যেই যুগে মানুষের ব্যক্তিগত

অধিকারের উপরে রাজার ক্ষমতা ছিল অবারিত ও নিরঙ্কুশ, যেই যুগে প্রজা শুধু রাজস্ব দিয়াই রেহাই পাইত না, নিজের ধর্ম্মীয় স্বাধীনতাও রাজার কাছে গচ্ছিত রাখিতে বাধ্য হইত, সেই যুগের অবসান হইয়াছে। যুগ-পরিবর্ত্তনহেতু পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রে, শ্রেষ্ঠ নামে মানুষ মাত্রেরই অধিকার স্বীকৃত হইতেছে। ব্রহ্মগায়ত্রী জপের সাধ সাধারণ মানুষের অতীব পুরাতন। কিন্তু দারুণ বাধায় তাহারা এই পরম বস্তু হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়াই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার জন্য শক্তিগায়ত্রী, কামগায়ত্রী, পশুগায়ত্রী আদি নানা-নামীয় গায়ত্রীর সৃষ্টি আবশ্যক হইয়াছে। এই সকল গায়ত্রীর সৃষ্টি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মগায়ত্রীর কদরই বাড়াইয়াছে, ব্রহ্মগায়ত্রীর সম্মান, মর্য্যাদা ও বাঞ্ছনীয়তা কমাইয়া দিতে পারে নাই। যুগের পরিবর্ত্তন-হেতু মানুষের দার্শনিক চিন্তার মধ্যেও নানারূপ বিশেষত্বের বিকাশ দেখা যাইতেছে, যাহা লোকমনকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করিতেছে। ঈশ্বরকে অবতার-রূপে পূজা করিয়া মানুষ আজ আর তৃপ্ত নহে, তাঁহাকে প্রত্যেক জীবের ভিতরে অবতরণ করিতে দেখিতে আজ সে চাহে। একক নিজের মুক্তির প্রার্থনায় আর মানুষের বুদ্ধি প্রবল ভাবে সাড়া দেয় না, আজ সে বিশ্বের সকলের মুক্তি এক সাথে দেখিতে চাহে। মানুষের ভাবরাজ্যের পরিধি দিনের পর দিন দূর-দিগন্তে সরিতেছে এবং সকল পরকে আপন করিবার জন্য ব্যাকুল বেদনা অনেকের মনে জাগিতেছে। বর্ত্তমানের মানব-মনের এই দার্শনিক পটভূমিকাকে উপেক্ষা করিবার আজ আর উপায় নাই। সুতরাং স্ত্রীশূদ্রাদির ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণবে অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে। তোমার ইচ্ছা না হয় তুমি অস্বীকার কর,

গায়ত্রীতে শূদ্রাদির অধিকার

দার্শনিক চিন্তার নব-বিকাশ

কিন্তু প্রণব-গায়ত্রী জপে যাহার আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা তোমার নাই। এই ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার প্রয়োজনে যদি সত্যই কিছু করিতে চাহ, তবে দয়া করিয়া কৌপীন-বন্ধন দৃঢ় কর, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধর, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনাঃ হইয়া দুই দশ বৎসর ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে মনে প্রাণে দিবারাত্রি জপ করিয়া যাও। তাহার ফলে সত্যিকারের শ্রুতি তোমার নিকটে বাঙ্ময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া দেখা দিবেন। সেদিন যাহা তুমি বলিবে, কোটি কোটি মানুষ অবনত মস্তকে বিনা প্রতিবাদে বিনা তর্কে বিনা দ্বিধায় এক কথায় তাহা পালন করিবে। সমাজের যাঁহারা রক্ষক হইবেন, তাঁহা-দিগকে (ক) সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্যে সুস্থির হইতে হইবে, (খ) তারপরে পূর্ব্বসংস্কার-সমূহ সম্পর্কে অপক্ষপাত হইতে হইবে, (গ) বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধকারীদের সম্পর্কে উদাসীন হইতে হইবে, (ঘ) একমাত্র গায়ত্রীজপে মন ডুবাইতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে (ঙ) সত্য নির্দ্দেশ পরম ঊর্দ্ধ হইতে না আসা পর্য্যন্ত তপস্যায় অবিরত লাগিয়া থাকিতে হইবে। পুঁথি-পড়া বিদ্যাও প্রশংসনীয় কৃতিত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ বিদ্যার দৌলতে আদেশ পালিত হয় না।

সমাজ-রক্ষকের কর্ত্তব্য

অবশ্য এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবে যে, যাহাকে আজিকালিকার ভাষায় আমরা "গোঁড়ামি" বলিয়া থাকি, সমাজ-রক্ষার সনাতনী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা বা ঐ সকল ব্রাহ্মণদের সমর্থকেরা এই গোঁড়ামির আশ্রয় লইয়া যে-কোনও প্রকারে কতকগুলি লোককে প্রাচীন কালের রীতিনীতির সহিত যুক্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন বলিয়াই অধিকাংশ ভারতবাসী উপযুক্ত কারণ সত্ত্বেও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যান নাই। প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি এইরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠা

সনাতনীর নিষ্ঠার ভালর দিক

জাতির গুরুতর সঙ্কট-সময়ে অস্তিত্ব রক্ষারই সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং অতীতে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, সমাজকে ঝড়ের মুখে উড়িয়া যাইতে না দিয়া যে কতকগুলি খুঁটি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সুফলটুকুর জন্য সমগ্র জাতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষ ঘরে বসিয়া ভগবানের কি নামটী জপ করিল, ইহা লইয়া গোয়েন্দাগিরি বা শূদ্রের মুণ্ডচ্ছেদের তথাকথিত শাস্ত্রীয় অধিকার-প্রয়োগ নিতান্তই উপহাসের সামগ্রী হইবে।

ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র কয়েকটি বিশেষ তত্ত্বের সমষ্টি। সেই তত্ত্ব কয়টি গায়ত্রীর ভাষাতেই সুপ্রকাশ। ইহা ধ্যানের আনুকূল্য-বিধায়ক মন্ত্র। ইহা একক সংগুপ্ত ধ্যানের মন্ত্র নহে, ইহা বহুজনের সম্মিলিত সমবেত ব্যাপক ধ্যানের মন্ত্র। বিশ্বজীবের হিতার্থে জীবন বলিয়াই ব্রাহ্মণ পূজ্য। কেবল নিজের কুশলে তপঃপরায়ণ হইলে সেই ব্রাহ্মণ প্রশংসনীয় হইতে পারেন, শ্রদ্ধিতও হইতে পারেন কিন্তু পূর্ণ বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন। অজ্ঞাত অতীত যুগে সহস্র সহস্র ঋষি একত্র বসিয়া ধ্যান করিতেন, "ধীমহি" শব্দের বহুবচনত্ব দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে "ধীমহি" শব্দটুকু সম্পাদকীয় বহুত্বে নহে বা সম্ভ্রমে বহুবচন নহে। "ধীমহি" ক্রিয়া-পদটি একটি বিস্মৃত অতীতের মনোরম এবং লোভনীয় দৃশ্য মনশ্চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছে। ভাবিয়া দেখ, কি সেই মহান্ অতীত, যেই অতীতে জটাজূটধারী অগণিত ঋষির পার্শ্বে আরও শত শত ঋষি বসিয়া গেলেন ধ্যান করিবার জন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতার বরেণ্য তেজকে, যেই তেজ বিশ্বজনের সহিত বিশ্বাত্মাকে, বিশ্বাত্মার সহিত বিশ্বজনকে, প্রতিটি জনের সহিত প্রতিটি জনকে অনাদি অতীত, সুদীর্ঘ

গায়ত্রী-মন্ত্রের সামূহিকতা

বর্ত্তমান এবং অফুরন্ত ভবিষ্যতের জন্য একত্রীভূত করিয়া দ্বৈতের দ্বন্দ্ব চিরতরে মিটাইবে। ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র কোটি কোটি অনার্য্য সন্তানকে বিপুল আকর্ষণে আর্য্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল শুধু প্রাচীনকালীন সামূহিক উপাসনার ইহা ভিত্তিভূমি ছিল বলিয়া। আজ যে আমরা শত শত দ্রাবিড়-সন্তানকে বেদচর্চ্চাকারী শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের রূপে দেখিতে পাইতেছি, তাহা একমাত্র ব্রহ্মগায়ত্রীরই মহিমায়। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র অতি স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বানুশীলনের মন্ত্র, যাহাতে মূর্ত্তি-কল্পনার অবকাশ নাই। "সবিতুঃ" শব্দ দ্বারা গায়ত্রীকে যে সূর্য্যের উপাসনা-মন্ত্র বা বিষ্ণুর উপাসনা-মন্ত্র বলিয়া বলা হয়, তাহা পরবর্ত্তীকালের ব্যাখ্যা মাত্র। যাহার পক্ষে গায়ত্রীর তত্ত্ব বুঝিবার আগ্রহ আছে, তাহাকে গায়ত্রী জপার অধিকার হইতে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া বা নরকভীতি প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত করা নিরর্থক, কেননা মানুষের মুমুক্ষু বিবেক এই যুগে আর ঐ সকল ভয় প্রদর্শনকে গ্রাহ্য করে না। সুতরাং স্ত্রীলোকের বা শূদ্রের ব্রহ্মগায়ত্রীর জপাধিকার সম্পর্কে যদি রক্ষণশীল শাস্ত্রজীবেরা নিষেধ-বাণীও প্রচার করেন, তথাপি আমরা গায়ত্রীতে তাহাদের অধিকার স্বীকার করিব। যাহারা এই মন্ত্রের সহায়তায় পরম পুরুষকে পাইতে চাহে, আত্মাহঙ্কারের বিনাশ সাধিয়া নিজের হৃদয়দ্রাবিনী, চিত্তনিয়ামিকা, বিচারবুদ্ধিশালিনী বৃত্তিগুলিকে পরমেশ্বরের হাতেই সঁপিয়া দিয়া নিষ্কাম নিঃস্বার্থ নির্লেপ অনাসক্ত আনন্দময় উপলব্ধির আস্বাদন করিতে চাহে, তাহাদের অধিকার স্বীকার করিব, হউক না তাহারা চণ্ডাল-বংশীয়, হউক না তাহারা পারিয়া বা পঞ্চম, হউক না তাহারা বালক বা নারী, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অধিকাংশেই এই বিষয়ে একমত যে,

একদা নীহারিকাপুঞ্জ হইতে ধরণীর বাষ্পীয়তা জলের তরলতায় আর স্থলের কাঠিন্যে রূপ পাইল। জলভাগের উষ্ণতা কমিবার সাথে সাথে একদা কফের ডেলার মতন একটু প্রটোপ্লাজমের সৃষ্টি হইল, যাহার ভাষা নাই, স্বাধীন সঞ্চরণ নাই, কিন্তু রহিয়াছে প্রাণের স্পন্দন এবং রহিয়াছে আত্মবিভাজন। এক হইতে বহুর সৃষ্টি হইল, এই বহুরা ক্রমোন্নতির পথে আস্তে আস্তে মৎস্য হইল, সর্প হইল, পক্ষী হইল, অগণিত প্রাণি-কুলের রূপ হইল। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসরের ধারাবাহিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রমবিবর্ত্তনে বানর আসিল, অর্দ্ধমানবেরা আসিল, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট দ্বিপদ ভ্রাম্যমাণ আদি মানবের আবির্ভাব হইল এবং ক্রমোন্নতি সাধিতে সাধিতে একদা তাহাদের বংশধরেরা বৈদিক যুগের ঋষি হইল আর বহু সহস্র বৎসরের বিবর্ত্তন-ধারায় চলিতে চলিতে বর্ত্তমান যুগের মানুষ আমরা আসিয়া হাজির হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ ঋষি বা ঋষিকল্প মানুষেরা এই বিবর্ত্তন-ধারার শারীরবিকাশের বৈচিত্র্য, মানসবিকাশের মনোহারিতা, সংস্কৃতিগত বিভিন্নমুখিতা বিচার করিয়া তথা তপস্যার বলে উপলব্ধি করিলেন যে, বর্ত্তমান এই মানবগোষ্ঠীর ক্রমপরিণতি হইবে গিয়া এক দেবমানব-সমাজে। আমরা শ্রীঅরবিন্দের বা এই জাতীয় অন্যান্য মনস্বীদের এইরূপ ভবিষ্যৎ-ভাবনাকে ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বলিয়া জ্ঞান করি না।

বিবর্ত্তনশীল জগৎ

শ্রীঅরবিন্দ

সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, ব্রহ্মগায়ত্রী জপের ইচ্ছা থাকিলে একমাত্র শূদ্র, চণ্ডাল, পারিয়া বা পঞ্চম প্রভৃতিই তাহা জপ করিতে অধিকারী, তাহা নহে; বিবর্ত্তনের নিয়ম অনুসারে ছাগকুক্কুরাদি পশু-কুলের যদি ব্রহ্মভাবনার শক্তি এবং কথা কহিবার সামর্থ্য কখনও আসে,

তাহা হইলে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের উপর তাহাদেরও অধিকার আমাদের প্রত্যেকের মত সমান ভাবেই জন্মিবে। বৈদিক সন্ধ্যাবিধির পুস্তকে যে ব্রহ্মগায়ত্রী ছাপান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রেসে কম্পোজ করিবার সময়ে হয়ত একজন খ্রীষ্টান কম্পোজিটার কম্পোজ করে, আমরা আপত্তি করি না, একজন নীচজাতীয় প্রুফ-রীডার প্রুফ দেখে, আমরা আপত্তি করি না, একজন তমিজুদ্দিন প্রিন্টার মেশিনে উহা ছাপায়, আমরা আপত্তি করি না, দপ্তরী পাড়ায় একজন সুফিয়া খাতুন সেই বহি ভাঁজ করে, আমরা আপত্তি করি না, একজন ইমামুদ্দিন মিঞা সেই বই সেলাই করে, আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু আত্মোন্নতির উদ্দেশ্য নিয়া একজন স্ত্রীলোক বা একজন শূদ্র গায়ত্রী জপ করিলে আমরা রাগে ফাটিয়া পড়ি, এই রাগের যৌক্তিকতা কি থাকিতে পারে?

ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস পুনরাবিষ্কার করিবার মত উপযুক্ত উপাদান গবেষক পণ্ডিতগণের হস্তগত হয় নাই। পৌরাণিক কাহিনীতে নরমেধের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তান্ত্রিকেরা নরবলি দিতেন, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু বেদ ও তন্ত্র এক নহে। কুমারিল ভট্টকে বলিতে হইয়াছিল,—"শ্রুতির্দ্বিবিধা,—বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" একমাত্র বেদবচনের দ্বারা নিজের যুক্তি সমর্থন সম্ভব না হইলে যাহারা তন্ত্রবচনকে বেদবচনের সমান মর্য্যাদা দিতে আগ্রহী হন বা দিতে বাধ্য হন, কুমারিল ভট্টের উক্তি তাহাদের উক্তির ন্যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা তন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইল। এই তন্ত্রের উৎপত্তি কবে হইল? তন্ত্র বৈদিক ঋষিদের শাস্ত্র নহে, তন্ত্র মহাদেবের শ্রীমুখোৎপন্ন শাস্ত্র। এই তন্ত্র কি বেদের আগে না পরে? পরে হইলে

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-পথের দুর্গমতা

বৈদিক ঋষিরা তন্ত্রকে একেবারে লুপ্ত করিতে পারিলেন না? তন্ত্র আগে হইয়া থাকিলে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের কোন্ কোন্ অংশ তন্ত্র-প্রভাবিত? এই সকল প্রশ্ন আপনা আপনি আসে। বুদ্ধদেব বেদ মানেন নাই কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিকারে তন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষিত হইয়াছে। বেদ নিশ্চয়ই বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না এবং বেদান্ত দর্শন যে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের স্বাভাবিক পরিণতি, এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগকে সন্দেহ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু সাংখ্য-দর্শন কি বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডেরই পরিণতি? ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের গবেষণার অন্ত নাই। সাংখ্যকার প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষকে মানিয়াছেন। তন্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড এই প্রকৃতি-পুরুষকে লইয়া লীলায়িত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিকার তান্ত্রিক রতিকামলাঞ্ছিত নানা ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত সমান্তরাল বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেক পণ্ডিত ইহাও বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যদর্শনের ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম আগে, না তন্ত্রশাস্ত্র আগে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল? আবার বেদের বিভিন্ন অংশের কোন্‌টি আগে আর কোন্‌টি পরে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, কোন্ শাস্ত্রের কোন্ রচনাটী কোন্ প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল, কোন্ শাস্ত্র কি ভাবে নানা হস্তে রূপান্তর পাইতে পাইতে পরবর্ত্তীকালে কতদিনে আমাদের পক্ষে সুলভপ্রাপ্য রূপটীতে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণের অক্ষমতা হেতু কোনও সুনিশ্চিত ইতিহাসের কল্পনা করাও সুকঠিন। প্রাচীন শাস্ত্রকে পরবর্ত্তী-কালের টীকাকার, ভাষ্যকার, ব্যাখ্যাকারগণ নিজ নিজ সমকালীন

সাংখ্যদর্শন ও তন্ত্র

প্রচলিত লোক-সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদাদি রচনার বহু শতাব্দী পরে যাঁহারা এই সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সর্ব্বস্থলেই মূল বৈদিক ঋষিদের বাক্যের ন্যায় সমমূল্য পাইবেন কিনা, ইহাও একটা আলোচ্য বিষয়। যাঁহারা ব্রাহ্মণাদির ঘরে জন্মেন নাই, তাঁহাদিগকে বেদ ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব হইতে বঞ্চিত রাখিবার ঝোঁক ব্যাখ্যাকর্ত্তাদের অধিকাংশের সমসাময়িক গোঁড়া লোকসংস্কার। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেন নাই, এমন বহু ব্যক্তির দ্বিজত্ব লাভের যে সকল কাহিনীর আভাস প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাতে একথা মনে করাই স্বাভাবিক হয় যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি যখন নানা অনার্য্যজাতির সংস্রবে আসিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা অনার্য্যদের সকলকেই শূদ্র করিয়া রাখেন নাই বা শূদ্র করিতে পারেন নাই। এমন হইতে পারে যে, শূদ্র করিয়া রাখিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাদিগকে শূদ্রত্ব হইতে উন্নীত হইতে দিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে যে, তাঁহারা সকলকে শূদ্র করিয়া রাখিতে চাহেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের উন্নয়ন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। আর্য্যসাধনার রহস্যানুসন্ধানকারী প্রত্যেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, আর্য্যেরা বিশ্বদেবতার অর্চ্চনাকারী ছিলেন বলিয়া বিশ্বের সকলের প্রতি তাঁহাদের প্রেমভাব ধাবিত হইয়াছিল। উপরে লিখিত দুইটী অনুমানের মধ্যে শেষোক্তটিকেই সত্য বলিয়া ধরিতে হয়। কেননা, আর্য্যরাই বলিয়াছিলেন,—"কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্য্যম্", সমগ্র বিশ্বকে আর্য্য কর, অনার্য্য থাকিতে দিও না। মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন বলিয়াছেন, সমগ্র বিশ্বে ইস্‌লাম প্রচারিত কর, আর্য্যদের "কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্য্যম্" কথাটীর ভিতরে সেই প্রচারশীলতাটুকু সুস্পষ্ট দেখিতে

আর্য্যসাধনার উদারতা

পাওয়া যায়। এই উদারবাণী প্রচারের সন তারিখ আর "শূদ্রদিগকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম, ধ্যানের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিতে দিও না", এই সঙ্কীর্ণ-বাণী প্রচারের সন তারিখ কি এবং দুইটী সনের এই দুইটী তারিখের মধ্যে কয়টী হাজার সৌরবর্ষ বা কয়শত শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা সহজে অনুমেয় যে, শুধু অস্ত্রবলে ভারতবিস্তৃত প্রাধান্য অর্জ্জন স্বল্পসংখ্যক আর্য্যের পক্ষে নিশ্চিতই সম্ভব ছিল না। যাহা অস্ত্রবলে সম্ভব নহে, প্রেমবলে তাহা সুসম্ভব। দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়-প্রভুত্বের দেশ,—দ্রাবিড়েরা আর্য্যদের ন্যায় কৃষিপ্রধান সভ্যতার অধিকারী ছিলেন না, তাঁহাদের সভ্যতা ছিল পরিপূর্ণ নাগরিক, যাহা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে কৃষিপ্রধান সভ্যতা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়-প্রভুত্বের দেশ, যেই দেশে সংস্কৃত অপেক্ষাও প্রাচীন তামিল একটী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, যেই ভাষার ভিতরে এখনও সংস্কৃত শব্দ অনেক ধাক্কাধাক্কির পর দুই চারিটির বেশী প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটিল কি করিয়া? নিশ্চয়ই আর্য্যেরা বহু দ্রাবিড়কে ব্রাহ্মণ করিয়া নিয়াছিলেন। ভারতীয় ক্ষত্রিয় জাতিসমূহের পুরাকালীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গিয়া গবেষক পণ্ডিতেরা অনেকে বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত বহু জাতিকে আর্য্যেতর গোষ্ঠীসমূহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। ইহা হইতে ধারণা করা যায় যে, আর্য্যেতর জাতি হইতে গুণানুসারে বহু বংশের লোককে আর্য্যজাতির বক্ষে সাদরে গ্রহণ করিবার প্রথা বা চেষ্টা বা রীতি নিশ্চিতই ছিল, যাহার দরুণ মুষ্টিমেয় বিশুদ্ধ আর্য্যবংশধরেরা ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে নির্দ্দিষ্ট এক অঞ্চলের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংখ্যায় প্রায় অগণিত ও অপরিমেয় হইলেন।

অনার্য্যকে আর্য্য করিবার সিদ্ধমন্ত্র কি ? "তোমরা আমাদের দাস হও, তোমরা আমাদের চরণ ধৌত কর, আমরা তোমাদের স্পৃষ্ট জল ছুইব না বা পান করিব না, কিন্তু তোমরা আমাদের কাপড় কাচিবে, বাসন মাজিবে, পায়খানা পরিষ্কার করিবে, আমাদের যাগ দেখিবে না, যজ্ঞ করিবে না, মন্ত্র শুনিতে পারিবে না, যদি মন্ত্র শুনিতে পাও, কাণে তরল সীসক ঢালিয়া দিব, যদি মন্ত্র উচ্চারণ কর, রসনা কাটিয়া ফেলিব",—এইরূপ সাদর আমন্ত্রণ পাইয়া যে দলে দলে অনার্য্যেরা আসিয়া ভিড় করিয়া আর্য্যদের পতাকাতলে দাঁড়ান নাই, ইহা সুনিশ্চিত। রোমের সম্রাটেরা যেমন দিগ্বিজয় করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে হাজার হাজার বিদেশী যোদ্ধাকে হাতে পায়ে শিকল বাঁধিয়া আনিয়া রোমে দাসরূপে বিক্রয় করিত অথবা মুসলমান দিগ্বিজয়ীরা যেমন করিয়া ভারত হইতে সহস্র নরনারীকে বাঁধিয়া নিয়া বসোরার রাজপথে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীর রাজটীকা কপালে পরাইয়া দিয়া ঐ অঞ্চলের গৃহস্থদের সেবক-সেবিকার অভাব দূর করিয়া দিত, আর্য্যেরা সেভাবে ভারতীয় অনার্য্যদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই বা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের উপলব্ধিতে সিদ্ধমন্ত্র প্রণব জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, যাঁহার উচ্চারণ ওম্, যাঁহার অর্থ "হাঁ", যাঁহার তাৎপর্য্য সকলের সর্ব্বসত্যের স্বীকৃতি, যাহার প্রভাব সর্ব্বজীবে প্রীতি, যাহার স্বাভাবিক পরিণতি বিনা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন। এই ওঙ্কারকেই ব্রহ্মগায়ত্রী ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং এই ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র সর্ব্ববেদের সারসত্যকে নিজ করুণাময় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মুসলমান যেমন মাত্র তিনবার "লা ইলাহা ইল্লাহু, মুহম্মদরসুলল্লাহ্" এই কালেমা পাঠ করাইয়া যে

অনার্য্যকে আর্য্য করিবার সিদ্ধমন্ত্র

কাহাকেও ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন, ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের তদ্রূপ যে-কোনও ব্যক্তির সপ্তপুরুষের জাতিবর্ণ লোপ করিয়া দিয়া নবদীক্ষিতকে প্রথমতঃ নিষ্পাপ মানুষে এবং সুদীর্ঘ সাধনার ফলে পুরুষোত্তমে পরিণত করিবার ক্ষমতা আছে। বলিতে কি, যেদিন হইতে অদ্বিজকে ওঙ্কার ও ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল, সেদিন হইতেই ভারতীয় আর্য্যজাতির বিস্তার কমিয়া গেল। কত নারী বেদমন্ত্র রচনা করিলেন, কত নারীর নাম বেদমন্ত্রে উল্লিখিত হইল, ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা এবং দেবীসূক্তের রচয়িত্রী অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ দেবী প্রভৃতিকে নিতান্তই ব্যতিক্রম-স্থল মনে করা সংস্কারান্ধ জেদ্ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহারা নিজেদের অধিকারেই, নিজেদের মহিমাতেই বেদশাস্ত্রের অধিকারিণী ও বেদমন্ত্রের রচয়িত্রী হইয়াছিলেন। অত্রি-বংশীয়া বিশ্ববারা বেদের ছয়টী ঋক্ রচনা করেন। ইহা ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত নহে। কারণ, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবীও ঋগ্বেদের একটি সূক্তে আটটী মন্ত্র রচনা করেন, যাহার কৌলীন্য অসাধারণ, যাহা দেবী-সূক্ত নামে উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদব্যাসের বেদান্ত-সূত্র রচনার ও বেদান্ততত্ত্ব-প্রচারের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বৈদিক অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধান্তকে প্রকটিত করিয়া আজ পর্য্যন্ত নিজ মহিমায় জগতে সমাদৃত রহিয়াছে, ব্যাস, শঙ্কর, বিবেকানন্দ প্রভৃতির বজ্রগম্ভীর বেদান্তনির্ঘোষ যাহার প্রতিধ্বনি মাত্র। অত্রিবংশীয়া অপালা ঋগ্বেদের একটী সূক্তে আটটী মন্ত্র রচনা করেন। ইহাও ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত নহে, ইহা নারীর স্বাভাবিক অধিকারের প্রমাণ-মাত্র। ইন্দ্রের জননী অদিতি ঋগ্বেদের তিনটী ঋক্ রচনা করেন। নারী বলিয়া তিনি বেদে অনধিকারিণী ছিলেন এবং কতিপয় শক্তিশালী পাঁতিদাতার অনুগ্রহে তিনি

নারীর বেদাধিকার

ব্যতিক্রম-স্থানীয়া হইয়াই বেদমন্ত্র রচনা করিলেন, ইহা মনে করিতে যাওয়া আর কল্পনা-শক্তির অপব্যবহার করা এক কথা। যমী ঋগ্‌বেদের দুইটী বিভিন্ন সূক্তে দশটী মন্ত্র রচনা করেন, ইহাও তাঁহার প্রতি পুরুষ-ঋষিদের করুণার ফল নহে, তিনি নিজের অধিকার-বলেই এই অসামান্য কার্য্যটুকু করিয়াছিলেন। অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র রচনা করিলেন, চোরাই গুপ্তাই পথে, এরূপ কল্পনা বাতুলতা মাত্র। কাক্ষিবানের কন্যা ঘোষা ঋগ্বেদের দুইটী সূক্ত রচনা করিয়া পিছন-দুয়ার দিয়া অন্য ঋষিদের চখে ধূলা দিয়া তাহা বেদ শাস্ত্রের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা করাও পাপ। সূর্য্যা ঋগ্বেদের একটি সূক্ত রচনা করেন। এইরূপ এতগুলি দৃষ্টান্ত দেখিবার পরেও যদি আমাদিগকে এইরূপই অনুমান করিতে হয় যে, নারীর বেদাধিকার বৈদিক ছিল না, এবং এতগুলি দৃষ্টান্তের সবই এক একটা ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা হইলে এরূপ কল্পনাশক্তিকে বলিহারি দিতে হয়। নারীকে হেয় জ্ঞান না করা এবং অনার্য্যকে, শূদ্রকে উচ্চতর স্তরে উঠিবার সুযোগ দানই ছিল বৈদিক ভারতের একটী স্বর্ণ-যুগের বিশেষত্ব। বৈদিক জীবনে সঙ্কীর্ণতার প্রবেশ-লাভ ঘটিয়াছে পরবর্ত্তী যুগে।

বৈদিক যুগের বিশেষত্ব

নারী যদি প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার হইতে বঞ্চিতা হন, তাহা হইলে প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকারী একটী ব্রাহ্মণের ঔরসে তাহার সন্তান জন্মিলে, সেই সন্তান কি প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সদ্‌গুণটুকু পূর্ণরূপে পাইবেন? ব্রহ্মগায়ত্রী এবং প্রণব-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই। প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর সাধনা করিয়া পিতা ব্রহ্মশক্তির আধার হইলেন, ব্রহ্মবীর্য্যশালী

কেন নারীর শ্রেষ্ঠতত্ত্বে অধিকার প্রয়োজন

হইলেন, প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর সাধনে বঞ্চিতা রহিয়া মাতা তাহার নারীত্বহেতু কেবল নমো নমো করিয়া এবং পতি-পূজা করিয়াই জীবন কাটাইলেন। বীজ উৎকৃষ্ট হইল, ভূমি নিকৃষ্ট রহিল, এরূপ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ফসল কি লুথার বারবঙ্কের মতন কোনও কৃষি-যাদুকরও প্রত্যাশা করিতে পারেন? ইহা শাস্ত্র বা অশাস্ত্রের কথা নহে, অতি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ইহা কথা। যেদিন হইতে প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রীতে নারীর অধিকার সঙ্কুচিত হইল, সেই দিন হইতে তথাকথিত ব্রাহ্মণের ঔরসে প্রণব-গায়ত্রী-বঞ্চিতা শূদ্রা-ব্রাহ্মণীর গর্ভে কার্য্যতঃ কেবল তাহারাই জন্মিতে লাগিল, যাঁহাদের কর্ম্মের ফলে আর্য্যদের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ বন্ধ হইয়া গেল।

আস্তিক হিন্দুদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বেদ অপৌরুষেয়, ইহা কোনও মানুষের সৃষ্ট নহে। কিন্তু একথা ত সত্য বেদের মন্ত্রগুলির এক এক জন করিয়া ঋষির উল্লেখ আছে, যাহারা এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। আস্তিক মুসলমানরাও বিশ্বাস করেন যে, কোর্‌আন্‌ মানুষের সৃষ্ট নহে, ইহার বয়েৎ সমূহ স্বয়ং আল্লার কাছ হইতে আসিয়া পৃথিবীতে নাজেল্‌ হইয়াছে এবং হজরত মুহম্মদ এই সকল বয়েতের শ্রোতা তথা ঘোষক। চিন্তাধারার রীতিটা উভয়ত্রই একরূপ। তথাপি বেদের মন্ত্রগুলিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া কত কষ্ট করিয়া নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই মন্ত্রগুলি মহামূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মহামূল্য বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক নহে। মহাবস্তুর অপব্যবহার না হয়, তাহার দিকে তাকাইয়াও অন্যকে অধিকার দিতে সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দিব্যানুভূতির বিমল বিভায় চিত্তলোক উদ্ভাসিত

বেদে অপরকে অধিকার না দিবার মনস্তত্ত্ব

হওয়ার ব্যগ্রতার পরিবর্ত্তে যখন বেদের মন্ত্রসমূহ একদল পুরোহিতের জীবিকার্জ্জনের সম্বল-সংগ্রহের আগ্রহে পরিণত হইল, তখন, ইহা বিচিত্র নহে যে, পৌরোহিত্য-তন্ত্রের অবধারকদের মধ্যে মন্ত্রসমূহ গোপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইল। সঙ্গে সঙ্গে অতি সরল অতি স্বাভাবিক ঈশ্বরানুগত্যের সহজ পথটী নানা আড়ম্বর ও বিচিত্রতায় ভরিয়া যাইতে লাগিল। ইহার ফলে বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অবোধগম্য হইয়া পড়িল। অতএব "ইহা তোমাদের জন্য নহে" একথা মুখ ফুটিয়া না বলিলেও অন্যরা ইহাতে নিজেদের অধিকার নাই, বলিয়া আপনা আপনিই ভাবিতে থাকিবে, ইহাও ত স্বাভাবিক। তদুপরি, ক্ষত্রিয় রাজারা যখন যাগ-যজ্ঞাদিকে নিজেদের যশঃপ্রতিষ্ঠার উপায়রূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা যে যাগযজ্ঞে আগ্রহী দুঃসাহসী শূদ্রদের মুণ্ডচ্ছেদ করাকে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? অশ্বমেধ-যজ্ঞ বা রাজসূয় যজ্ঞাদি প্রকৃত প্রস্তাবে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনও অত্যদ্ভুত সোপান নহে, ক্ষমতাস্পর্দ্ধী ক্ষত্রিয়দের যশঃস্পৃহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ইহারা যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষৌমবসনে আবৃত পার্থিব উচ্চাভিলাষ মাত্র, একথা বুঝিতে অনেক বিদ্যার্জ্জন করিতে হয় না। কিন্তু এই উচ্চাভিলাষকে আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা না দিলে পুরোহিতের সংসার চলিবে না এবং কুল-ক্রমাগত রীতিকে পুরোহিত-সন্তানেরা যুক্তির দৃষ্টিতে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন সরল বিশ্বাসের অসন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। অতএব যেখানে প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, শূদ্রের রসনাচ্ছেদনের ও মুণ্ডচ্ছেদের পাতি বিবেক-দংশনের পীড়া ব্যতীতই সহজ মনে দিয়াছেন। ইহাই অতীতের

ইতিহাস। এবং স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব, যাহা অজ্ঞাতসারে নিজের কাজ নিজে করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ক্ষত্রিয়ের প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই নিজেদের কৃতি ও কৃতিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া নানারূপ অবাঞ্ছনীয় পথে জীবিকার্জ্জন করিয়া মানুষের শ্রদ্ধার আসন হারাইয়াছেন এবং হারাইতেছেন। পৃথিবী জুড়িয়া সর্ব্বত্র মানুষের সমাধিকার স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে, এইরূপ সময়ে অমুকে শূদ্র, তমুকে অব্রাহ্মণ বলিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ নামটী তাহাকে জপ করিতে দিব না বলিয়া জিদ ধরিলেই যে লোকে সেই জিদের সম্মান রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করিতে যাওয়া বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করার সামিল।

শূদ্রের বেদাধিকার

বেদে বা তত্তুল্য প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে শূদ্রের বেদাধিকার আছে কিনা, তাহা নিয়া তুমুল তর্ক আছে। এই তর্কের মধ্যে আমাদের পক্ষাশ্রয় করিবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না। কিন্তু অপক্ষপাত দৃষ্টিতে গত একশত বৎসরের বাদানুবাদের দিকে লক্ষ্য করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, শূদ্রের বেদাধিকার বেদবিহিত বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা সমাজের ভাবী ও ব্যাপক কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই এই দাবীটী করিয়া আসিতেছেন। আর শূদ্রের বেদাধিকার নাই বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা গুরুতর আশঙ্কা-বোধ লক্ষ্য করা যায় যে, শূদ্রেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে জাতিবর্ণ সব লোপ পাইয়া যাইবে, ধরণী একাকার হইবে এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বনাশ হইবে। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ই, বি, হাভেল সত্যই একস্থানে লিখিয়াছেন যে,—হিন্দুদের যদি জাতি-

জাতিভেদ

ভেদই চলিয়া যায়, তবে আর থাকিবে কি? কিন্তু জাতিভেদ যে আর্য্যজাতির অন্যান্য শাখায়,

হওয়ার ব্যগ্রতার পরিবর্ত্তে যখন বেদের মন্ত্রসমূহ একদল পুরোহিতের জীবিকার্জ্জনের সম্বল-সংগ্রহের আগ্রহে পরিণত হইল, তখন, ইহা বিচিত্র নহে যে, পৌরোহিত্য-তন্ত্রের অবধারকদের মধ্যে মন্ত্রসমূহ গোপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইল। সঙ্গে সঙ্গে অতি সরল অতি স্বাভাবিক ঈশ্বরানুগত্যের সহজ পথটী নানা আড়ম্বর ও বিচিত্রতায় ভরিয়া যাইতে লাগিল। ইহার ফলে বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অবোধগম্য হইয়া পড়িল। অতএব "ইহা তোমাদের জন্য নহে" একথা মুখ ফুটিয়া না বলিলেও অন্যরা ইহাতে নিজেদের অধিকার নাই, বলিয়া আপনা আপনিই ভাবিতে থাকিবে, ইহাও ত স্বাভাবিক। তদুপরি, ক্ষত্রিয় রাজারা যখন যাগ-যজ্ঞাদিকে নিজেদের যশঃপ্রতিষ্ঠার উপায়রূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা যে যাগযজ্ঞে আগ্রহী দুঃসাহসী শূদ্রদের মুণ্ডচ্ছেদ করাকে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে ? অশ্বমেধ-যজ্ঞ বা রাজসূয় যজ্ঞাদি প্রকৃত প্রস্তাবে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনও অত্যদ্ভুত সোপান নহে, ক্ষমতাস্পর্দ্ধী ক্ষত্রিয়দের যশঃস্পৃহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ইহারা যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষৌমবসনে আবৃত পার্থিব উচ্চাভিলাষ মাত্র, একথা বুঝিতে অনেক বিদ্যার্জ্জন করিতে হয় না। কিন্তু এই উচ্চাভিলাষকে আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা না দিলে পুরোহিতের সংসার চলিবে না এবং কুল-ক্রমাগত রীতিকে পুরোহিত-সন্তানেরা যুক্তির দৃষ্টিতে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন সরল বিশ্বাসের অসন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। অতএব যেখানে প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, শূদ্রের রসনাচ্ছেদনের ও মুণ্ডচ্ছেদের পাতি বিবেক-দংশনের পীড়া ব্যতীতই সহজ মনে দিয়াছেন। ইহাই অতীতের

ইতিহাস। এবং স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব, যাহা অজ্ঞাতসারে নিজের কাজ নিজে করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ক্ষত্রিয়ের প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই নিজেদের কৃতি ও কৃতিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া নানারূপ অবাঞ্ছনীয় পথে জীবিকার্জ্জন করিয়া মানুষের শ্রদ্ধার আসন হারাইয়াছেন এবং হারাইতেছেন। পৃথিবী জুড়িয়া সর্ব্বত্র মানুষের সমাধিকার স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে, এইরূপ সময়ে অমুকে শূদ্র, তমুকে অব্রাহ্মণ বলিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ নামটী তাহাকে জপ করিতে দিব না বলিয়া জিদ ধরিলেই যে লোকে সেই জিদের সম্মান রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করিতে যাওয়া বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করার সামিল।

শূদ্রের বেদাধিকার

বেদে বা তত্তুল্য প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে শূদ্রের বেদাধিকার আছে কিনা, তাহা নিয়া তুমুল তর্ক আছে। এই তর্কের মধ্যে আমাদের পক্ষাশ্রয় করিবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না। কিন্তু অপক্ষপাত দৃষ্টিতে গত একশত বৎসরের বাদানুবাদের দিকে লক্ষ্য করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, শূদ্রের বেদাধিকার বেদবিহিত বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা সমাজের ভাবী ও ব্যাপক কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই এই দাবীটী করিয়া আসিতেছেন। আর শূদ্রের বেদাধিকার নাই বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা গুরুতর আশঙ্কা-বোধ লক্ষ্য করা যায় যে, শূদ্রেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে জাতিবর্ণ সব লোপ পাইয়া যাইবে, ধরণী একাকার হইবে এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বনাশ হইবে। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ই, বি, হাভেল সত্যই একস্থানে লিখিয়াছেন যে,—হিন্দুদের যদি জাতি-

জাতিভেদ

ভেদই চলিয়া যায়, তবে আর থাকিবে কি ? কিন্তু জাতিভেদ যে আর্য্যজাতির অন্যান্য শাখায়,

যথা গ্রীক্ বা রোমকদের মধ্যে সৃষ্ট বা বিকশিতই ছিল না, এবং ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যেই তাহা ফুটিয়া উঠিল, প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস নিগূঢ় (এবং তাহা আমরা গ্রন্থান্তরে সম্ভবতঃ আলোচনা করিয়াছি)। আর, জাতিভেদ প্রথাটি কত সহস্র শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা একদিকে হিন্দুজাতিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিলেও এই প্রথাটী থাকার দরুণই পিছন-দুয়ার দিয়া কত জাতি যে এই হিন্দু সমাজটার-ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং ঢুকিতে পারিতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। * জাতিভেদ-প্রথা একদিকে যেমন হিন্দু-সমাজের ভিতরে নিবিড় ঐক্যবোধ জাগাইবার বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তেমন আবার জাতিরূপে কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন স্তর থাকাতে যে যেমন উপযুক্ত তেমন ব্যক্তিরা কৌশলে শুধু মাত্র দেশত্যাগের একটু ঝুঁকি লইয়া নিজের অভিলষিত জাতির ভিতরে সকলের অজ্ঞাতসারে ঢুকিয়াও পড়িয়াছে। আমরা জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য বিন্দুমাত্রও আগ্রহী বা চেষ্টাশীল নহি, কিন্তু নানা জাতির নানা বর্ণ যে জাতিভেদের কাঠামোটার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতেছে, তাহা সুদীর্ঘ ষাট বৎসর যাবৎ নানা প্রদেশে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং এমন হওয়া বিচিত্র

---

* একটী নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিব। গ্রন্থকারের বাল্যকালের পরিচিত কোনও তিলি-জাতীয় বালক (ইহারা বৈশ্য, কিন্তু কায়স্থেরা ইহাদের হাতে খায় না) সাধু হইয়া লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী এক মঠের সাধুর শিষ্য হইল। কালক্রমে এই বালক মঠের মোহন্ত হইল। মোহন্ত হইবার পরে এই বালক বারংবার কাশীধামে আসিল এবং নিজেকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া সরযুপারী এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সাধুবেশ পরিত্যাগ করিল। এখন সেই বালক উত্তরপ্রদেশের এক শহরে বিরাট মুদী দোকান দিয়াছে এবং তাহার পুত্রকন্যারা সমাজে সরযুপারী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছে।

নহে যে, বহু শতাব্দী ধরিয়াই এই কাজটী জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে ঘটিয়া আসিতেছে। যদি জাতিভেদের স্তরবিভাগ না থাকিত, তাহা হইলে নিজ নিজ রুচিমত সমাজে ঢুকিয়া পড়িবার অবকাশ থাকিত না। যদিও এই ধারাটী Clandestine বা অসামাজিক, তথাপি ইহাকে অবরুদ্ধ করিতে হিন্দুসমাজ পারে নাই।

অন্য দিক দিয়াও বিবেচনা করিতে হয়। জাতিভেদ-রূপ একটা কাঠামোর বিদ্যমানতা হিন্দুকে তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবার সহায়তা করিয়াছে। ভারতবাসী জাতিভেদ-বর্জ্জিত থাকিলে ইসলামের প্লাবন বা খ্রীষ্টধর্ম্মের ঝঞ্ঝাবাতের পরে হিন্দুরূপে কাহারও অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহের কথা। বিভিন্ন বিপৎপাতের পরক্ষণেই হিন্দুসমাজের সংরক্ষকেরা এখান সেখান হইতে টানিয়া বুনিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি বর্ণ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। অস্তিত্বলোপের আশঙ্কার মুখে এই চেষ্টা একেবারে বিফলতা আহরণ করে নাই। ইহার ফলে কখনো কখনো এমন ব্যক্তিরাও সমাজে সম্মানার্হ হইবার সুযোগ পাইয়াছে, যাহাদের সম্মানার্হ হইবার হয়ত কদাচ সুযোগ হইত না। ইহা এই সমাজের এক লুপ্ত বা অজ্ঞাত অধ্যায়ের ইতিহাস। সুতরাং আমরা যখন বলি যে, শূদ্রকেও শ্রেষ্ঠ মন্ত্রে ভগবানকে ডাকিবার অধিকার দিতে হইবে, তখন আমরা জাতিভেদপ্রথার ভাল বা মন্দ, ভূত বা ভবিষ্যৎ নিয়া মোটেই মাথা ঘামাই না।

ব্রহ্মগায়ত্রী জপ

যাহাদের রুচি আছে, সাহস আছে, আগ্রহ আছে, তাহারা ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপ করিও। তবে, ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে সাকার রূপকল্পনা নাই বলিয়া সাকারোপাসক-দের এই মন্ত্রযোগে মনঃসন্নিবেশন অতি দুরূহ ব্যাপার। সম্ভবতঃ এই

গায়ত্রী ও নিরাকার-তত্ত্ব

জন্যই পরবর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যেরা ব্রহ্মগায়ত্রীর স্থলে সংক্ষিপ্ততর মন্ত্রসমূহ দর্শন করিয়া শিষ্যানুশিষ্যক্রমে তাহার উপদেশ করিয়াছিলেন। সে-সকল মন্ত্রের রূপ-কল্পনা আছে, প্রত্যেকটী মন্ত্রের নিজস্ব একটী বিশিষ্ট মূর্ত্তি বা প্রতীকও আছে। সাধারণ সাধকেরা বিভিন্ন মূর্ত্তির প্রতি অনুরাগ-হেতু সেই রূপটীর প্রস্ফুটক নির্দ্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়া সাধন করিয়াছেন এবং এই ভাবেই বেদ-শাসিত ও বৌদ্ধ-নির্জ্জিত হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, রামায়ৎ, বৈষ্ণব প্রভৃতি শত শত সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় বৌদ্ধদের মতন প্রকাশ্যে বেদ-বিরোধ করেন নাই কিন্তু নিজ নিজ সাধক-মণ্ডলীর ভিতরে বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রচলনের চেষ্টা না করিয়া সাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের প্রচলনের চেষ্টা করার ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের প্রভাবকে সঙ্কুচিতই করিয়াছেন এবং বৈদিক পন্থার অনুসন্ধান না করিয়াও অন্যতর পন্থায় লোকহিতসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই মনে হয়, এক

সাকার-উপাসনা-মূলক বীজমন্ত্র

অব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণেরাই কি গায়ত্রী-বঞ্চিত করিয়াছেন?

শ্রেণীর পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, 'চাল-কলা-খেকো' উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণেরা জোর করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রটাকে নিজেদের কোঁচার খুটে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কথাটা যেন সর্ব্বাংশে সত্য নয়। বরঞ্চ, ইহাই অধিকতর সম্ভব যে, সাম্প্রদায়িক সংক্ষিপ্ত মন্ত্রগুলির সাধনার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষীয় অধিকসংখ্যক সাধক নিজ নিজ ধর্ম্ম-প্রচার-চেষ্টাকে একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত করায় ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। নতুবা

এমন মনে হয় না যে, নানক, কবীর, তুকারাম, চৈতন্য প্রভৃতি শক্তিশালী সম্প্রদায়-স্রষ্টারাও যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে নিজ নিজ সম্প্রদায়-মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ও উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে গায়ত্রীমন্ত্র চালাইতে পারিতেন না। আসল কথা হইতেছে, তাঁহারা গায়ত্রীর প্রয়োজন সে ভাবে উপলব্ধি করেন নাই। কিন্তু সম্মুখে এবং অদূরে এক মহাসন্ধিক্ষণ আসিতেছে, যেই সময়ে সম্যক্ অসাম্প্রদায়িকতাকেই সম্প্রদায়-পোষণের প্রধান উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তখন বেদমাতা গায়ত্রী সাধকের সমাজে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসন নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন এবং গায়ত্রী-মন্ত্রকে উপলক্ষ করিয়াই বেদগুহ্য ওঙ্কার-মন্ত্র নিখিল জগদ্বাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতঃ সকলকে ন্যায়ে, ধর্ম্মে, সত্যে এবং প্রেমে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করিবেন।

বিবাহিত নরনারীদের মধ্যে যাহারা গায়ত্রীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিবে না, অথবা উপলব্ধি করিলেও ইহাকে গৌণরূপেই গ্রহণ করিবে, তাহারা মুখ্যরূপে বৈদিক প্রণব-মন্ত্র অথবা তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে পারে। সাকার ব্রহ্মোপাসক "ওঁ হ্রীং" "ওঁ ক্লীং" প্রভৃতি, নিরাকার ব্রহ্মোপাসক "ওঁ ব্রহ্ম", "ওঁ তৎসৎ", "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" প্রভৃতি, মুসলমান "বিস্মিল্লাহের্‌হমানের্‌হিম", লাইলাহাইল্লাল্লাহ্" প্রভৃতি, খ্রীষ্টান "গড্ দি ফাদার, গড্ দি সন্" বা খ্রীষ্টনাম প্রভৃতি রুচি অনুযায়ী মন্ত্র জপ করিবে। যাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারাও নিজ নিজ রুচিমত "সত্যং", "লোককল্যাণং", "পবিত্রতা", "অহং" প্রভৃতি কোনও একটী শব্দকে মন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া জপ করিবেন। অবশ্য, স্বয়ং-নির্ব্বাচিত মন্ত্রের সহিত দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রের

বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন মন্ত্র

সাধনফলে কথঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ, নাম-জপের স্থূল ও সূক্ষ্ম কৌশলসমূহ আবিষ্কার করিয়া লইবার আশা সাধারণ লোকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। যাহারা পবিত্র প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহাদের পক্ষে অন্য কোনও মন্ত্র জপ করা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব

একমাত্র প্রণব (ওঙ্কার) জপেই সর্ব্বমন্ত্রের জপ হইয়া থাকে। জগতের সকল মন্ত্রের সমষ্টি করিলে যাহা হইবে, প্রণবতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি এই যে, একমাত্র প্রণবের ভিতরেই তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিয়াছে। জগতের সকল মন্ত্র একত্র করিয়া জপ করিলে যে ফল হইবে, একমাত্র প্রণবকে একক ভাবে জপ করিলে সেই ফল হইবে। কথিত হইয়াছে, এই প্রণব হইতেই সর্ব্বমন্ত্রের ও সর্ব্বভাষার উৎপত্তি হইয়াছে এবং সর্ব্বমন্ত্র ও সর্ব্বভাষা উপসংহৃত হইয়া এই প্রণবেই মিশিয়া যাইবে। মন্ত্ররাজ ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র আলাদা আলাদা করিয়া জপ করিতে করিতে সাধকের যাহা চরম অনুভূতি হইবে, তাহা প্রণব ব্যতীত আর কিছুই নহে; প্রতি মন্ত্রেরই প্রাণটী যখন সাধকের নিকট আবিষ্কৃত হইবে, তখন সে একমাত্র প্রণবকেই পাইবে। সুতরাং ইহার সেবা করিলে আর অন্য কোনও মন্ত্রের সেবা আবশ্যক হয় না। অপর সকল মন্ত্রেরই আশ্রয়-স্বরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট ভাব আছে, অথবা অপর সকল মন্ত্রই এক একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবের আশ্রয় কিন্তু প্রণব-মন্ত্র সর্ব্বভাবের আশ্রয়, এবং সর্ব্বভাব ইহার আশ্রয়। এই জন্যই ইহা মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ। তথাপি ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মব্যবসায়ীরা এবং তাঁহাদের অনুগত একশ্রেণীর জনতা যে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বংশে জাত পুরুষ ব্যতীত অন্যের প্রণব উচ্চারণে বা সাধনে তীব্র দ্বেষ ও উন্মত্ত বিরোধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা এক প্রকারের ধর্ম্মান্ধতা ব্যতীত আর

কিছুই নহে। পরবর্ত্তী যুগের রচিত কতকগুলি শাস্ত্রবচন ও কপোল-

ধর্ম্মান্ধ বিরোধ গ্রাহ্য করিও না

কল্পিত কতকগুলি অনুষ্টুপের ধমক দিয়া সাধনেচ্ছু জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার ইহা সংস্কারাবিষ্টদের অন্ধ-চেষ্টা মাত্র। প্রকৃত সাধক যেন ইহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও না করে। যুক্তি, বিচার বা তর্কের দ্বারা এই সকল সংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিদের বোধোদয় সম্ভব নহে, কারণ সংরক্ষিত স্বার্থের ইহারা তল্পিদার,—কেহ জানিয়া, কেহ না জানিয়া। অতএব প্রকৃত সাধককে অন্যমতনিরপেক্ষ হইয়া প্রবল বিক্রমে প্রণবের সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একথাও বলিতে হইতেছে যে, যাহারা বৈধপথে প্রণব-সাধনের সঙ্গত অধিকার পাইয়াও সাধন করিতেছে না বা অবহেলায় সুযোগ হারাইতেছে, তাহারা দুর্ভাগা এবং ধর্ম্মতস্কর।

প্রণব বা ওঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী কথার পুনরুক্তি করিলে দোষ হইবে না। ওঙ্কারের উপাসনা নাদের উপাসনা। তোমার বা আমার কল্পিত কোনও নাদ নহে, যে নাদ আপনা আপনি

নাদের উপাসনা

স্ফূরিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুর ভিতরে যে নাদ অবিরাম অবিচ্ছেদ বিনা-প্রযত্নে আপনা আপনি ধ্বনিত হইতেছে, সেই নাদ। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের গমন-পথে নিরন্তর যে নাদের ঝঙ্কার উঠিতেছে, সেই নাদ। তোমার আমার প্রতিজনের প্রতিটি দেহের প্রতি মর্ম্মস্থলে, প্রতি রক্তে, প্রতিটি শোণিতবিন্দুতে, প্রতিটি তন্তুতে, প্রতিটি পেশীতে, প্রতিটি অণুতে কণাতে, নিরন্তর যে নাদ ধ্বনিত, বিধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই নাদ। প্রতিটি

চেতনাময় বস্তু, প্রতিটি জড় পদার্থ নিরন্তর দিকে দিকে সকলের অজ্ঞাতসারে যে অব্যক্ত ধ্বনি-তরঙ্গ দিগ্‌বিদিকে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছে, সেই নাদ। অনন্ত ও অপূর্ব্ব, অপরূপ ও বিচিত্র রূপের বিভা সেই নাদকে আশ্রয় করিয়া চতুঃষু দিক্ষু কেবলই ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেই সুস্পষ্ট, সুন্দর, স্বচ্ছ ও সর্ব্বতোভদ্র স্বয়ম্প্রকাশ নাদ।

এই জন্যই ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রময় এবং সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ। সর্ব্বঋষি এই মন্ত্রেরই উপাসক কিন্তু এই মন্ত্র সর্ব্ব-ঋষি-নিরপেক্ষ। এই মন্ত্রটীকে কোনও নির্দ্দিষ্ট ঋষি জগৎকে উপহার দিয়া নিজেকে ধন্য করিতে পারেন নাই, এই মন্ত্রকে উপলব্ধির জগতে পাইয়া সকল যুগের সকল ঋষিরা ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

ওঙ্কার-তত্ত্ব

তোমার গুরু যদি তোমাকে ওঙ্কার মন্ত্রই দিয়া থাকেন, তবে ত তোমার আর ভাবনার কিছুই নাই। তুমি গুরুর আদেশে মন্ত্র জপ করিবে, তোমার অন্য দায়িত্ব বা দুশ্চিন্তা থাকিতে পারে না। কিন্তু গুরু যদি না করিয়া থাক, তবু তুমি ওঙ্কার-মন্ত্র জপ করিবার অধিকারী। এই জন্য ইহাতে তোমার অধিকার যে, ওঙ্কার গুরুবাদের অপেক্ষা রাখে না। গুরু এবং শিষ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার বহু যুগ পূর্ব্ব হইতে ওঙ্কার ঋষিগণের উপলব্ধির গগনে একচ্ছত্র সূর্য্য। ওঙ্কারের উপলব্ধিই সাধারণ মানুষকে ঋষি করিল, ঋষিকে মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, পরমর্ষি করিল কিন্তু নিজের ব্যাপক মহিমার প্রসারের জন্য প্রচারকের প্রতীক্ষা রাখিল না। এই মন্ত্র জীবের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এই মন্ত্র জীবের কর্ণে স্বতঃশ্রুত, এই মন্ত্র কণ্ঠে নহে, ওষ্ঠে নহে, বাহ্য উচ্চারণে নহে, নিজের নিয়ত গুঞ্জনশীল মহাসঙ্গীতের মধ্য দিয়া অন্তরের অন্তরে সদা প্রতিষ্ঠিত, সদাজাগ্রত। এ মন্ত্র নিজে নিরালম্ব কিন্তু নিখিল জগতের অবলম্বন।

ওঙ্কার নিরপেক্ষ

ওঙ্কার নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কোনও ভক্ত বা প্রচারকের, কোনও শাস্ত্র বা পুরাণের, কোনও দর্শন বা ইতিহাসের প্রতীক্ষা এই মহামন্ত্র করেন না। কোনও সাম্প্রদায়িক মতামতের বা কোনও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের ইনি অপেক্ষা রাখেন না। অনেক সাধনা সাধিয়া, অনেক তপস্যা করিয়া, অধ্যাত্মতত্ত্বে অনেক আস্বাদন পাইবার পরে সাধকেরা, তাপসেরা, যোগব্রতী মহাপুরুষেরা ওঙ্কারের তত্ত্ব নিজ নিজ হৃদয়-গুহায় আপনা আপনি উপলব্ধি করেন।

ওঙ্কার মহামিলনের মন্ত্র

প্রণবমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মন্ত্র। জগতের যত ধ্বনি সব-কিছু একত্র মিলিত হইয়া একের সহিত অপরে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গেলে হয় প্রণব। একটী মন্ত্রও, একটী নামও, একটী শব্দও, একটী তত্ত্বও বা একটী রূপও প্রণবের বাহিরে নহে। সবকিছু ইহার ভিতরে রহিয়াছে,—কখনও রহিয়াছে সম্পুটিত ভাবে, কখনও রহিয়াছে সুপ্রকাশ রূপে, কখনও রহিয়াছে রহস্যময় আলোছায়ার বিচিত্র খেলার ভিতর দিয়া। যাহা প্রণবের ভিতরে নাই, তাহা কোথাও নাই, কোথাও ছিল না, কদাচ কোথাও থাকিবে না। যাহা আছে, যাহা ছিল, যাহা হইবে, সবকিছুই প্রণবের মধ্যে বিদ্যমান।

প্রণব আদি ও অনাদি

ব্রহ্মাকে যেমন বলা হয় লোকসৃষ্টির আদি পিতামহ, প্রণবকে তেমনই জানিতে হইবে সমস্ত মন্ত্র-গোষ্ঠীর আদি পিতামহ। যেদিন বৈদিক ঋষির চক্ষে রূপ-কল্পনার কাজল-রেখা পড়ে নাই, নিসর্গ-শোভার আশ্চর্য্য সমারোহ যেই দিন তাঁহাদের মনে এক একটি অত্যদ্ভুত ভাগবতী চেতনা, দিব্য প্রেরণা ঐশী বোধনাকে জাগ্রত করিয়া

তুলিত, সেই দিন যত দেবতার নাম তাঁহারা সানন্দে করিতেন উচ্চারণ, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাচক একটী মহাধ্বনির আবেশ তাঁহাদের ওষ্ঠ ও রসনায় উচ্চারণ-শক্তির অতীতে থাকিয়া সর্ব্বদেহ-ব্যাপী শিহরণ তুলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে লীলায়িত বীচিবিভঙ্গে খেলিয়া বেড়াইত,—তাহাই ওঙ্কার। বেদ যখন জাগে নাই, তখনো ওঙ্কার ছিলেন, সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী ঋষিদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার প্রতিটি অনুরণনে ওঙ্কার বারংবার ঝঙ্কৃত হইয়া হইয়া তাঁহাদের যাত্রাপথ করিত মসৃণ, কোমল, সুখপ্রদ, সুগম্য ও মধুময়। ওঙ্কারের ভিতর হইতেই সর্ব্বতত্ত্বের ঘটিল বিকাশ, কিন্তু ওঙ্কার স্বয়ং স্বতোবিকাশ অন্য কিছু হইতে ইহার বিকাশ ঘটে নাই। এইজন্যই ওঙ্কার একাধারে আদি ও অনাদি।

প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের পর্য্যবসান

একমাত্র প্রণব হইতেই সকল মন্ত্রের উৎপত্তি, এই প্রণবেই সকল মন্ত্রের পর্য্যবসান। এই কারণেই প্রণব-মন্ত্রের সহিত অন্য কোনও মন্ত্রের তাত্ত্বিক কোনও কলহ নাই। সকল দার্শনিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে অতিক্রম করিয়া সকল মত ও পথের প্রতি সমান উদার দৃষ্টি রাখিয়া নিজ সাধনপথে নির্ম্মৎসর ও নিরসূয় মনে চলিতে হইলে প্রণবের মতন এমন সরল আশ্রয়, এমন সরল শরণ আর কিছু নাই। প্রণব শক্তিমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র, শিবমন্ত্র আদি সকল মন্ত্রেরই অপার আধার, এজন্য শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্থান ইহাতে নাই। ইহাতে সর্ব্বমন্ত্রের পর্য্যবসান ঘটে বলিয়া ইহা সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, সর্ব্বমন্ত্রের সমাহার, সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয় ও সর্ব্বমন্ত্রের সামঞ্জস্য।

প্রণবে সর্ব্বমন্ত্রের সামঞ্জস্য বলিয়াই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের এই যুগে

সর্ব্ববর্ণের সম্প্রীতির এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রণব-মন্ত্রই সকলের সহজ মুক্তিদাতা।

প্রণব সর্ব্বমন্ত্রের সামঞ্জস্য

প্রণবের সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ দেখিতে পাইবে যে, হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, ক্রীং, হুং রাং প্রভৃতি যত মন্ত্র জগতে সমাদৃত হইয়াছেন, সকল মন্ত্রের ধ্বনি, রূপ, বর্ণ, দর্শন, শাস্ত্র ও উপলব্ধি আপনা আপনি তোমার উপলব্ধিতে আসিয়া যাইবে। তখন তুমি এমন স্থানে আসিয়া পৌছিবে যে, সকল মতের আর সকল পথের বিরোধগুলি আর বিরোধ বলিয়া মনে হইবে না, বরং তাহাদের বিচিত্রতা কৌতুক ও আনন্দ সঞ্চারিত করিবে।

প্রণব সর্ব্বস্বীকৃতির মন্ত্র

প্রণবের নিকটে কোনও কিছুই "না" নাই, সব-কিছুতেই "হাঁ"। সে শুধু শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর আদিকেই স্বীকৃতি দেয় না, সে অনার্য্য-পূজাপদ্ধতিকে স্বীকার করিয়া নিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এমন কি ইহুদী ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বা ইস্‌লাম ধর্ম্মকেও সে "হাঁ"ই বলিয়াছে, বলিতেছে, বলিবে, কাহাকেও অসত্য বলিয়া ঘোষণা তাহার স্বভাব নহে। প্রণব নিত্যকালের জন্য "হাঁ", অনন্ত-যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী "হাঁ"। কৃষ্ণ ভজিতে চাহ ত জপ কর ওঁ কৃষ্ণ, কালী ভজিতে চাহ ত জপ কর, ওঁ কালী, দুর্গা পূজিতে চাহ ত জপ কর ওঁ দুর্গা। কেহ যদি খ্রীষ্ট ভজিতে গিয়া জপ করে ওঁ খ্রীষ্ট, আল্লা ভজিতে গিয়া জপ করে ওঁ আল্লাহ্, তবে তাহাতেও প্রণবের জাতি যায় না, প্রণব সর্ব্ব নামের, সর্ব্ব সত্যের, সর্ব্ব তত্ত্বের স্বীকৃতিদাতা মন্ত্র, কোনও পুণ্য নামকেই প্রণব অস্বীকার করে না, অপাংক্তেয় ভাবে না। প্রণবের এই অসাধারণ উদারতার জন্যই ইহা অহিন্দুদের ভিতরে ক্রমশঃ মহাসমাদরের বস্তু হইতে চলিয়াছে।

যদিও বিরোধ অবাঞ্ছনীয়, তথাপি কৃষ্ণমন্ত্রী হয়ত ক্লীং—ক্রীং জপিতে রাজি হইবেন না, শিবমন্ত্রী হয়ত ক্লীং—হুং জপিতে চাহিবেন না, দেবী-ভক্ত হয়ত ক্লীং—হ্রীং জপিতে বা ক্লীং—ক্রীং জপিতে অসম্মত হইবেন। কিন্তু কৃষ্ণভজনকারীর পক্ষে ওঁ কৃষ্ণ বা ওঁ ক্লীং, কালীভজনকারীর পক্ষে ওঁ কালী বা ওঁ ক্রীং জপ করিতে আপত্তি হইবে না। জগতের সকল ধ্বনির কেবল মূল ধ্বনিটিই যে ওঙ্কার, এই জন্য ইহা মহামন্ত্র।

প্রণব অবিরোধী

আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণে আজ বেদসার প্রণবমন্ত্রের সাধনাধিকার, সাধন-রুচি ও সাধন-রীতি প্রসারিত হউক, ইহা যুগধর্ম্মের দাবী। কিন্তু তোমার যদি গুরূপদেশ এইরূপ হইয়া থাকে যে, কদাচ প্রণব-মন্ত্র জপিবে না, তবে গুরুবাক্যই পালন করিবে, গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিও না।

কতক্ষণ নাম জপনীয়

গভীর নিবিষ্ট ভাব না আসা পর্য্যন্ত নামজপ পরিত্যাগ করিবে না। পেট না ভরা পর্য্যন্ত যেমন ভাতের থালা ফেলিয়া কেহ উঠে না, নামজপ করিতে বসিয়া শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দে মনঃপ্রাণ না ভরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তেমন নাম জপ করিয়া যাওয়া উচিত। জপ করিতে বসিয়া হয়ত কত বাজে কথা, কত আজগুবি কল্পনা আসিবে, কখনও বা অবসাদ, কখনও বা বিরক্তি জন্মিবে, কতবার অবিশ্বাস ও অনাস্থার উদ্রেক হইবে, কিন্তু তথাপি ছাড়িবে না। ইক্ষুদণ্ড হইতে যেমন চিবাইয়া রস বাহির করিতে হয়, ভগবানের নাম হইতেও তেমন জপ করিতে করিতে রস নিষ্কাশন করিতে হইবে। নাম জপ করিতে চক্ষু নিমীলিত করিয়া লক্ষ্য ভ্রূমধ্যে রাখিতে পারিলেই ভাল। ভ্রূমধ্যে লক্ষ্য রাখিবার কয়েকটী সদুপায় আছে। প্রথমতঃ ভ্রূমধ্যে একটী শ্বেতচন্দনের ফোঁটা

ভ্রূমধ্যে লক্ষ্য রাখিবার উপায়

দিয়া লও। শ্বেতচন্দনের অভাবে শীতল জলের একটী ফোঁটা দিলেও চলে। তারপরে চিন্তা করিতে থাক যে, চিন্ময় সদ্‌গুরু নিত্যসাথী রূপে তোমার সঙ্গে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার উপবেশনের পবিত্র সিংহাসনটী তোমার ভ্রূমধ্য। গুরুকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া যাঁহারা ভাবেন বা ভাবিতে উপদিষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে ইষ্টের সহিত গুরুকে অভেদ কল্পনা করিয়া ভ্রূমধ্যে তাঁহার নিত্যস্থিতির অনুধ্যান প্রচলিত আছে। আমাদের প্রবর্ত্তিত অখণ্ডধর্ম্মে গুরুকে ঈশ্বর বা অবতার বলিয়া প্রচার করার কোনও প্রশ্রয় নাই কিন্তু জগতের

সদ্‌গুরু তোমার নিত্যসাথী

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক সদ্‌গুরু সাধকের নিত্যসাথী, নিত্য-সঙ্গী, নিত্য-সহচর, নিত্য-বান্ধব, সাধন-প্রয়াসের প্রতিটি স্পন্দনে নিত্যসাক্ষী ও শাশ্বত সুহৃদ্‌ রূপে ভ্রূমধ্যে অবস্থিত বলিয়া ধ্যান জমাইবার অবসর অখণ্ডধর্ম্মে আছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ভ্রূমধ্যে মনকে বাঁধিবার চেষ্টায় এই কৌশল অতীব দ্রুত ফলোপধায়ক। এই ভাবে মনকে ভ্রূমধ্যে বসাইয়া নিয়া নাম জপে আত্মনিয়োগ করিবে। নামে বসিয়াই সঙ্কল্প করিবে যে, সম্যগ্‌রূপে বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত জপ ছাড়া হইবে না। মনে মনে সঙ্কল্প করিবে, দেহ, মন, প্রাণ, সম্পূর্ণরূপে নামের সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ না করিয়া নামজপে ক্ষান্তি দেওয়া হইবে না। প্রত্যেকবার নামোচ্চারণের সাথে সাথে ভাবিতে থাকিবে, যেন তোমার পরমোপাস্য পরমদেবতা তোমার সমীপস্থ হইতেছেন এবং তাঁহার স্নেহমধুময় কোমল পরশে তোমার ইহ-পর-জীবনের, জন্মজন্মান্তরের সর্ব্ববিধ অশান্তি, বিকার ও অসৎ সংস্কার বিদূরিত করিয়া দিতেছেন। জপে বসিয়া আলস্য বা

তন্দ্রালুতা আসিলে কয়েকবার মহামুদ্রা অভ্যাস করিয়া পুনরায় জপে আত্মনিয়োগ করিবে। নামজপ শেষ হইলে শক্তিসাম্যের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীসমূহ অবলম্বনীয়।

স্নান, উপাসনা ও শক্তিসাম্যের পূর্ব্বেই স্বামী ও পত্নীর উভয়ের পক্ষেই দৈহিক ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় নারীর পক্ষে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ মহামুদ্রার অভ্যাসই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কালক্রমে ব্যায়ামের পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। মহামুদ্রা দ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্য অতি সুন্দর রূপে রক্ষিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আততায়ি-মর্দ্দনের জন্য নারীর দেহে যথেষ্ট শক্তিরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। আদর্শ নারী একদিকে যেমন প্রেমের প্রতিমা হইবেন, আর একদিকে তেমনি নৃমুণ্ডমালিনী রণরঙ্গিণীও হইবেন। নারীর মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পুরুষের অভিভাবকত্বই যথেষ্ট নহে, তাঁহার নিজ বাহুতেও শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় নারীর ব্যায়ামের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা কঠিন বলিয়াই যে চেষ্টা করিতেও হইবে না, তাহা নহে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবারে ছোটখাটো রকমের চেষ্টা চলিতে থাকিলে কালক্রমে ইহা দেশব্যাপী হইতে পারিবে। দাক্ষিণাত্যে কুমারী নাজির বাঈ নিজ ভ্রাতার নিকট হইতে ব্যায়াম শিখিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বালিকাদিগের ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্যায়াম

স্বামী ও পত্নী একই স্থানে ব্যায়াম করিও না। স্বামীকে কষ্টসাধ্য নানা প্রকার ব্যায়ামই অভ্যাস করিতে হইবে। পত্নীকে গৃহকর্ম্মের মধ্য দিয়াও দৈহিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে সর্ব্বদা মন রাখিতে হইবে। বাট্‌না বাটিবার

ব্যায়ামের স্থান ও প্রণালী

ও জল টানিবার কালে হাত ও পায়ের মাংস-পেশীগুলির প্রতি মন রাখিলেই ঐ সকল মাংসপেশী পুষ্ট হইতে থাকিবে। অনেকে বলেন, ব্যায়াম করিলে স্ত্রীলোকের লাবণ্য কমিয়া যায়, কিন্তু ইহা একান্তই ভ্রান্ত কথা। ভারতীয় নারী যে তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য হারাইতেছে, তাহার মূল কারণগুলি দূর করিতে হইলে, প্রকাশ্যভাবে না হউক, গুপ্ত ভাবে হইলেও, ব্যায়াম-সাধনার প্রচলন করিতেই হইবে। পত্নীর ব্যায়াম-শিক্ষক স্বয়ং স্বামী হইলেই নিরাপদ। ব্যায়ামাভ্যাসকালে উভয়কেই মনে রাখিতে হইবে যে, মনের শক্তিই শক্তি এবং দেহের শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টার পশ্চাতে মনকে একাগ্র করিতে পারিলেই শক্তিলাভের চেষ্টা সফল হয়। অনেকে আছেন, যাঁহারা নিয়মিতভাবেই ব্যায়ামাভ্যাস করেন, কিন্তু ব্যায়ামের পরিমাণ অনুযায়ী সুফল লাভ করিতে পারেন না। এই সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্যায়াম-অভ্যাসের কালে বল-লাভের প্রতি মন উপযুক্তরূপে একাগ্র হয় নাই। অতএব ব্যায়াম-সময়ে মনকে বিষয়ান্তর হইতে টানিয়া আনিয়া দৈহিক শক্তির ধ্যানেই মগ্ন করিতে হইবে।

ব্যায়াম ও মনোনিবেশ

সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রথম সন্তানটী জন্মিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই দেহগঠনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ। সন্তান জন্মিলে পিতার পক্ষে অধিকতর অর্থোপার্জ্জন ও মাতার পক্ষে শিশুর সর্ব্বতোমুখ তত্ত্বাবধান বাধ্যকর হইয়া পড়ে। ফলে, আত্মগঠনের চেষ্টায় প্রচুর বাধা জন্মে। দীর্ঘকাল পরে পরে সন্তান জন্মিলে স্বামিপত্নীর সকল দিকেই কুশল হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য, ভগবদুপাসনা, ব্যায়াম-সাধনা প্রভৃতি সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ পাইবার বা পালন করিবার পূর্ব্বে যাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে,

তাহারা এখন হইতেই বদ্ধপরিকর হও, যেন দেহমনের উপযুক্ত উৎকর্ষ লাভ হইবার পূর্ব্বে পরবর্ত্তী সন্তান মাতৃগর্ভে প্রবেশ না করে।

জনন-নিরোধ

এইজন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিও না। কারণ, ঔষধাদি দ্বারা জনন-রোধের চেষ্টায় নৈতিক অবনতি ত' আছেই, অধিকন্তু ইহা প্রসূতির পক্ষে অধিকাংশ সময়েই ঘোরতর বিপজ্জনক ও দুরারোগ্য রোগের উৎপাদক। বিশেষতঃ আজ পর্য্যন্ত গর্ভনিরোধের উপায় যত দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটীও নিশ্চিত সাফল্য দেয় না, ফলে ঔষধাদি প্রয়োগ সত্ত্বেও যে সব সন্তানসন্ততি ঔষধাদির গুণকে পরাস্ত করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহারা রুগ্ন দেহ ও রুগ্ন মন লইয়া সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিমাণ-বৃদ্ধিই করে। সুতরাং জনন-রোধের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণজনক এবং নিরুপদ্রব উপায়ই হইতেছে সংযম-সাধনা। হঠাৎ সভ্যেরা এই কথা শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে পারেন কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সমস্যার কোনও সত্য মীমাংসা সম্ভব নহে।

জনন-রোধের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়

যাহাদের সন্তান জন্মিবার পরে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে, তাহারা পরস্পর কিছুকাল বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক উভয়ের দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাসের মধ্যে একটা নৈতিক সঙ্কোচের সুদৃঢ় ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া লইও। আর, যাহারা এখনও পরস্পরের দৈহিক সম্পর্ককে বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারিয়াছ, সেই সকল ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতীরা উভয়ের উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক পূর্ণতা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সযত্নে এই সঙ্কোচটুকু রক্ষা করিও। তোমাদের ঘনিষ্ঠতা মনে প্রাণে বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু যতদিন উভয়েই সন্তান-জননের গূঢ়ার্থ, দায়িত্ব, উপযোগিতা ও পবিত্রতা সম্যক্

উপলব্ধি না করিতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত দৈহিক সম্বন্ধকে বিষধর ভুজঙ্গের ন্যায় ভয় করিয়া চলিও এবং ভগবৎ-সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জনন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় 'সুরুচিপূর্ণ' * গ্রন্থাদি অধ্যয়নের দ্বারা নারী ও পুরুষের পার্থক্য, এই পার্থক্যের পরিণাম ও উদ্দেশ্য, এই পার্থক্যজনিত দায়িত্বের বিভিন্নতা প্রভৃতি উৎকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নবান্ হইও। বিবাহিত নরনারীকে সর্ব্বপ্রথমেই এই একটা বড় কথা বুঝিতে হইবে যে, মৈথুন সাময়িক দৈহিক তৃপ্তি মাত্র নহে, পরন্তু দাম্পত্য যোগের সাধন,—মৈথুনাভ্যাস প্রকারান্তরে দম্পতীর পারস্পরিক যোগাভ্যাস। যোগাভ্যাস বলিয়াই ইহার অনুষ্ঠান গোপনে করিতে হয়, পাপ বা অপরাধ বলিয়া নহে। একই অপরাধ যখন সমাজভরা সকল লোকে করিতেছে, তখন গোপনতার আবশ্যক কি? পরন্তু সমাজভরা সকল লোকেই যখন ইষ্টনাম জপ করে, তখনও গোপনেই করে, নিঃশব্দেই করে, প্রকাশ্যভাবে করে না। কারণ, যোগাভ্যাস করিতে নীরবতা, নিঃস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা একান্ত আবশ্যকীয়। বিবাহিত দম্পতীর মৈথুনও তেমনি যোগ-সাধনা, ইহাকে পাপ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। তবে এই যোগ-সাধনার প্রকৃতি অতিশয়

সঙ্গমের গূঢ়ার্থ

* জনন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা-মুক্ত হইতে পারে না। তথাপি "সুরুচিপূর্ণ" কথাটী ব্যবহার করার তাৎপর্য্য এই যে, অনেক সময় লেখার দোষে এই-বিষয়ক গ্রন্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তির চাঞ্চল্য-বিধায়ক এবং অযথা-মৈথুনাদির প্ররোচক হয়; আবার কাহারও হাতে পড়িয়া লেখার গুণে ঐ একই তত্ত্ব সংযমের উৎসাহবর্দ্ধক ও মনশ্চাঞ্চল্য-প্রশমক হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পুস্তককে কুরুচিপূর্ণ ও অপাঠ্য এবং শেষোক্ত শ্রেণীর পুস্তককে সুরুচিসঙ্গত ও পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। দুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় এই জাতীয় সুরুচিসঙ্গত গ্রন্থ সম্ভবতঃ অধিক নাই।

স্থূল। সূক্ষ্ম যোগ-সাধনার যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা এই স্থূল প্রণালী পরিত্যাগ করেন ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিত উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে অগ্রসর হন। পরন্তু, অধিকাংশ গৃহীর পক্ষেই এই স্থূল সাধনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু যোগাভ্যাস, তাহা স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, বিধিপূর্ব্বক করিতে হয়, অবিধিপূর্ব্বক করিলে যোগভ্রংশ জন্মিবে, তাহাতে পাপ ও অপরাধ হইবে। অবৈধ প্রণালীতে যাহারা মৈথুনরূপ স্থূল যোগ-সাধনা করে, তাহারাই পাপী এবং অপরাধী, মৈথুন-ক্রিয়া তাহাদেরই পক্ষে লজ্জার কারণ। পরন্তু যাহারা বৈধ প্রণালীতে এই স্থূল সাধনা করেন, মৈথুন তাহাদিগকে লজ্জিত করে না, যেহেতু, তাঁহাদের মৈথুন-ক্রিয়ার ফলে জগৎ-পাবন মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন এবং কুলকে পবিত্র ও পুণ্যময় করেন। এই ব্যাপারে পুরুষ কর্ম্মযোগী, নারী ভক্তিযোগী; পুরুষের চাই পুরুষকার, নারীর চাই নির্ভর; পুরুষের সাধনা সঞ্চয়ের ও সংযমের, নারীর সাধনা আনুগত্যের ও অপেক্ষার। এই ব্যাপারে ইহারা ভোগী নহেন, উভয়ই যোগী এবং দেহের ও মনের সম্যক্ পবিত্রতা ব্যতীত যোগাভ্যাস হয় না।

দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যাতেও উপাসনা করিবে। পারিবারিক অধীনতা-হেতু একান্ত অসম্ভব না হইলে এই সময়েও শক্তিসাম্য করিও। কিন্তু

মাধ্যাহ্নিক ও সান্ধ্য উপাসনা

এই দুই সময় পার, না পার, রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে উপাসনা করিতে শক্তিসাম্য অবশ্যই করিবে। নিদ্রিতাবস্থাতেও আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের নানা প্রকার গঠন লাভ হইতে থাকে। সমগ্র দিন মন যে যে কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, নিদ্রাযোগে তাহার অনুরূপ ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে। শয়নের পূর্ব্বে গভীর উপাসনা ও একাগ্র

শক্তিসাম্য হইলে নিদ্রাযোগে মন জীবন-গঠনের অনুকূল ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারে। নতুবা সারাদিনের বৃথা কোলাহলের নিরর্থক স্মৃতি বহন করিয়া সে নিদ্রাযোগে নানা দুর্ব্বলতা, অথবা বিষয়াসক্তি ও উন্নতিবিরোধী জঞ্জাল সঞ্চয় করে।

প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বামিস্ত্রীর সম্মিলিত ভাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ একান্ত আবশ্যক। ইহাতে নানাবিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে একে অন্যের

সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ

মনোভাব ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়, বিশেষতঃ পিতৃগৃহে বালিকা-পত্নী যে সকল উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া আসিতে পারে নাই, স্বামীর সহায়তায় তাহার অভাব পূরণ হয়। স্ত্রী-জাতির শিক্ষা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে মিথ্যা বিশ্বাস দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, পদনখাঘাতে তাহা চূর্ণ করিতে হইবে। শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধ নাই, বরং অনুমোদন ও আদেশ আছে। অপালা, শাশ্বতী, লোপামুদ্রা, আত্রেয়ী বিশ্ববারা, পৌলোমী প্রভৃতি বৈদিক যুগের মহিলারা বেদমন্ত্রের রচয়িত্রী ছিলেন। ঋগ্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে গার্গীর ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর যে সংবাদ

শাস্ত্রে স্ত্রী-শিক্ষা

অবগত হওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা স্ত্রীলোক হইয়াও অতি উচ্চস্তরের ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। ঋগ্বেদে, যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে স্ত্রীলোকের শিক্ষার পূর্ণ সমর্থন দেখা যায়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া দৃঢ়তার সহিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পারস্কর-গৃহ্য-সূত্রে, গোভিল-গৃহ্য-সূত্রে, আপস্তম্ব-শ্রৌত-সূত্রে, আশ্বলায়ন-শ্রৌত-সূত্রে, লাট্টায়ন-সূত্রে পূর্ব্ব-মীমাংসায়, যম-সংহিতায় এবং হারীত-সংহিতায় স্ত্রীলোকের শিক্ষার্জ্জনের সমর্থন আছে। রামায়ণ এবং মহাভারত হইতেও এতদ্বিষয়ক প্রমাণ

মিলিবে। দ্রৌপদী বিদুষী ছিলেন, বনপর্ব্বে শিবা নাম্নী বেদপারগা ব্রাহ্মণীর কথা আছে, শান্তিপর্ব্বে যোগপারগা বেদবেত্রী সুলভার কথা আছে। পরবর্ত্তী যুগে কর্ণাট-রাজ-মহিষীর নিকট কবি কালিদাস এবং মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতীর নিকট শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায় জয়ী হইতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রয়োজন নাই বলিয়া যে এক কুসংস্কার অধিকাংশ সামাজিক মানবের মনের উপরে রাজত্ব করিতেছে, তাহার শাসন মানিয়া কাপুরুষের মত বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিপদের মাঝ-দরিয়ায় হাল ধরিবার ক্ষমতা যে নারীরও আছে এবং সুশিক্ষা পাইলে নারী যে তাহার এই ক্ষমতাকে নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতে পারে, এই কথাটায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া স্বামীদিগকে পত্নীশিক্ষায় মনোযোগী হইতে হইবে। নারী-হৃদয়ে পতিপ্রেম ও সন্তান-স্নেহ থাকিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করি না। পতিপ্রেম ও সন্তানস্নেহের প্রকাশটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুতম প্রণালীতে না হইতে পারিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নারী তাহার পরিপূর্ণ মহিমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করি না।

নারীর সুশিক্ষা ও তাহার স্নেহ-প্রেম

স্বামীকে ভালবাসিয়া যে পত্নী নিয়ত রতিদানেই তৎপরা থাকেন, অথবা সন্তানকে ভালবাসিয়া যে মাতা সন্তানের পাকস্থলীর সামর্থ্যের কথা গণনায় না আনিয়া গ্রাসের পর গ্রাস অন্ন কেবলই মুখে গুজিতে থাকেন, তাঁহাদের প্রেম ও স্নেহের সম্বন্ধে সন্দেহ করি না, কিন্তু যে ভাবে এই প্রেম ও স্নেহ প্রকাশিত হইল, তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে মহিমময়ী মনে করিতে পারি না। সুশিক্ষা পাইলে নারী তাঁহার এই প্রেম ও স্নেহকে উৎকৃষ্টতর ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবেন। অসংযত স্বামীকে

অস্বাস্থ্য ও নৈতিক দুর্গতি হইতে এবং পেটুক সন্তানকে অতিভোজন ও তজ্জনিত পীড়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার ঐ প্রেম ও স্নেহকেই উৎকৃষ্টতর কৌশলে পরিচালিত করিতে পারিবেন। এইজন্যই নারী-জাতির সুশিক্ষার অত্যধিক প্রয়োজন। বনমানুষের পত্নী কি চিরসাথী বনমানুষটাকে ভালবাসে না? ব্যাঘ্রিণী কি তাহার বাচ্চাগুলিকে স্নেহ করে না? কিন্তু সে প্রেমের ও সে স্নেহের দৌড় কতখানি? অতটুকু প্রেম আর অতটুকু স্নেহ দিয়া এবং পাইয়া কি মানুষের চিত্ত তৃপ্ত হইবে? তাই সুশিক্ষার প্রয়োজন। যে স্নেহ-প্রেম নারীর বক্ষজোড়া রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্বটা তিনি যাহাতে গভীরতর ভাবে অনুভব করিতে পারেন এবং তাহার প্রসার যাহাতে স্বামী ও সন্তানের উপরে শ্রেয়োমুখী কল্যাণ বিস্তার করিতে পারে, তাহার জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজন। স্বামী যতখানি জ্ঞান এবং বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছেন, সম্ভব হইলে স্ত্রীর পক্ষেও ততখানি অনুশীলন প্রয়োজন। পিতৃগৃহে বালিকাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা হয় না, সুতরাং ইহার ভার স্বামীদিগকেই লইতে হইবে এবং স্বামীর সর্ব্ববিধ সাধনায়, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যে, সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে সুযোগ্যা সহযোগিনীরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। নারী যে পুরুষের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-মূলক কুচিন্তাগুলিরই কেন্দ্র নহে, নারী যে ইহা অপেক্ষা মহত্তর চিন্তার কেন্দ্র হইতে পারে, তাহা বুঝিবার এবং বুঝাইবার জন্য ধারাবাহিক ভাবে এইরূপ সৎশিক্ষার সুব্যবস্থা দরকার। মৌখিক উপদেশের দ্বারা ফল যাহা হয়, গ্রন্থ-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পঠিত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাহা অপেক্ষা ফল অধিক হয়। সুতরাং মনুষ্যত্ব-বর্দ্ধক সদ্‌গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তকের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত তাহা অধ্যয়ন করা উচিত।

স্বামিগৃহে নারী-শিক্ষার আদর্শ

সম্ভবতঃ রাত্রিতে উপাসনার পূর্ব্বেই গ্রন্থপাঠ অধিকাংশ দম্পতীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

নৈশ উপাসনার পরে আর একটী মুহূর্ত্তও বাক্যব্যয়ে কাটাইবে না। নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া পুনরায় ভগবানের নাম জপ করিতে থাকিবে এবং নিদ্রাকর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত শয়ান হইবে না।

পরস্পর পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিবে। মৈথুন বর্জ্জন করিয়াও যাহারা এক শয্যায় শয়ন করে, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রায়শঃ রক্ষিত হয় না। কারণ,

শয়ন

ইহাতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সত্তাশক্তি অনেক ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্যে ক্ষয়িত হয়। জগতের কল্যাণের প্রয়োজনে তোমাদের দৈহিক মিলনের অধিকার সর্ব্বদাই রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রয়োজনে একমাত্র সন্তানজননের কালটী ব্যতীত অপর সময় যথাসাধ্য পৃথক্ শয্যার ব্যবস্থা করিবে। তবে এই সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণের জন্য সর্ব্বকালের জন্য স্থায়ী বা নির্দ্দিষ্ট কোনও বিধান প্রয়োগ করিতে চাহি না। স্থল-বিশেষে স্বামি-পত্নীর প্রণয়-বর্দ্ধনের জন্য মৈথুন-বর্জ্জিত অবস্থাতেও যে একত্র শয়ন বিহিত না হইতে পারে, তাহা নহে। কিন্তু পাত্র-পাত্রী নিজ নিজ অবস্থা বিবেচনায় তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি স্থির করিয়া লইবেন। যে সকল স্বামি-পত্নী সুদীর্ঘকাল যাবৎ কামবেগ দমন করতঃ সংযত জীবন-যাপন করিতেছেন, শয়নকালে একত্রাবস্থিতি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহাদের হিতকর, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অহিতকর হইতে দেখা যায়। ইহা প্রধানতঃ পতি-পত্নীর মানসিক গঠনের উপরে নির্ভর করে। আদরের ভিতর দিয়া যেই সকল স্ত্রীকে সংযম-পথে ও আধ্যাত্মিক মার্গে আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয়, স্বামীদের পক্ষে সেই সকল স্ত্রীকে শয়নকালে পৃথক্ শয্যায় অপসারিত করা

কার্য্যোদ্ধারের পক্ষে বিঘ্নকর হইতে পারে। কারণ, স্ত্রীরা স্বামীর প্রণয়ের পরিপূর্ণ অধিকারিণী বলিয়া নিজেদিগকে মনে করিতে না শিখিলে কখনই তাঁহাদের সংযম বা সাধনায় বা ধর্ম্মকার্য্যে বা লোক-হিতব্রতে সহায়তা করিতে আগ্রহী হয় না। সুতরাং এই সকল কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে। আর, যখন পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিতে থাকিবে, তখন সেই বিষয় নিয়া পরিজনবর্গ বা বন্ধুবান্ধবগণ বা প্রতিবেশীগণ আন্দোলন-আলোচনা করুক, ইহা যেন বাঞ্ছনীয় না হয়। দম্পতীর সম্ভোগ এবং সংযম উভয়ই দম্পতীর ভিতরেই আবদ্ধ থাকা দরকার, তাহার উপরে বাজে লোকের চপল রসনার অধিকার স্থাপিত হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, উহাতে কখনও কার্য্যসিদ্ধিতে ব্যাঘাত জন্মে, আর কখনও বা চরিত্রমধ্যে ভণ্ডামির প্রশ্রয় আসে। জীবন-গঠন-কামীর পক্ষে ভণ্ডামি বা মিথ্যাচারের মত শত্রু আর নাই।

তোমাদের উভয়ের বিবাহিত জীবনের প্রত্যক্ষ বিস্তার যে সন্তান-লাভে, এই কথাটী উভয়কে অতি উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে সন্তান প্রকৃতই তোমাদের জীবনকে সঙ্কুচিত না করিয়া সন্তানিত অর্থাৎ বিস্তারিত করিবে, তেমন ব্যক্তি যে খেয়ালে খেয়ালে জন্মে না, তাহার জন্য যে কঠোর সঙ্কল্প করিতে হয়, কঠিন সাধনা করিতে হয়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। অন্ততঃ একবৎসরকাল সংযমী ও সদাচারী না থাকিয়া

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

এবং একটীমাত্র আদর্শের অনুসরণে চেষ্টা না করিয়া কিছুতেই সন্তানজননে প্রবৃত্ত হইও না। তোমরা কিরূপ সন্তানের প্রার্থনা কর, ঋতুরক্ষার এক বৎসর পূর্ব্বেই তাহা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত করিয়া লও এবং কঠোর প্রযত্নে তদনুযায়ীভাবে আত্মপ্রস্তুতি ব্রতী থাক। ইহাই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

যদি তোমরা দেশকল্যাণকারী বীর সন্তান চাহ, তবে এই নির্দ্দিষ্ট কালটুকু ব্যাপিয়া প্রাণপণে দেশের সেবা করিতে যত্নবান্ হও এবং দেশের সেবায় জীবন দিয়া যাহারা জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, তেমন বীরাত্মা মহাপুরুষগণের জীবন-প্রণালী অধ্যয়ন ও অনুশীলন কর। চিত্তমধ্যে খোদিত করিয়া রাখ, রাণাপ্রতাপ কেমন করিয়া স্বাধীনতার সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ কেমন করিয়া আত্মধ্যান-পরায়ণ যোগীর সমাজকে যোদ্ধার জাতিতে পরিণত করিয়া মহিমান্বিত স্বধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, চাঁদবিবি কেমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যোয়ান অব আর্ক সামান্যা পশুপালিকা হইয়াও কেমন করিয়া পদানত ফ্রান্সের স্বাধীনতার পতাকা নূতন করিয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন। যদি তোমরা জগৎকল্যাণকারী বীর সন্তান চাহ তবে এই নির্দ্দিষ্ট কালটুকু জগৎ-কল্যাণকারী মহাত্মাদের জীবন-প্রণালী অধ্যয়ন ও অনুশীলন কর। চিত্তমধ্যে খোদিত করিয়া রাখ, কেমন করিয়া শাক্যসিংহ বিশ্বদুঃখ বিদূরণের জন্য রাজৈশ্বর্য্য ও প্রেমময়ী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় ভিক্ষু সাজিয়াছিলেন, একটা সামান্য ছাগশিশুর জীবন রক্ষার জন্য বিনিময়ে নিজ মহামূল্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কেমন করিয়া যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া পরার্থে প্রাণ দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া দধীচি স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য, ত্রিলোকশত্রু বৃত্রাসুরের সংহারের জন্য, সহাস্য আননে তাঁহার চিরশত্রু ইন্দ্রের হস্তে নিজ অস্থি তুলিয়া দিয়াছিলেন। তীব্রভাবে এই সকল মহচ্চিন্তার অনুশীলন কর, নিশ্চিত জানিও, ইচ্ছানুরূপ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সন্তান-সন্ততির জন্মদান

মহচিন্তার চর্চ্চা।

ইচ্ছানুযায়ী পুত্র ও কন্যার জন্মদান

করিয়া তোমরা কৃতার্থ হইতে পারিবে। শুধু তাহাই নহে, তোমাদের সঙ্কল্পের শক্তিই জঠরস্থ সন্তানকে ইচ্ছানুসারে পুত্র বা কন্যাতে পরিণত করিবে।

ইচ্ছানুসারে পুত্রকন্যার উৎপাদন করিবার জন্য বিভিন্ন-পন্থী যোগীরা বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। যথা,—

(ক) স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস থাকাকালীন বীর্য্যাধান হইলে পুত্র জন্মে। ঋতুরক্ষা-কালে উভয়ের শ্বাস ইড়া নাড়ীতে থাকিলে কন্যা জন্মে। * উভয়ের মধ্যে একের ইড়ায় এবং অপরের পিঙ্গলায় থাকিলে স্ত্রীপুরুষ-মধ্যে যাহার শক্তি অধিক, তজ্জাতীয় সন্তান অথবা যমজ পুত্রকন্যা হইবে। উভয়ের শক্তি তুল্য হইলে নপুংসক হইবে।

(খ) পুরুষের শুক্রকোষের দক্ষিণ অংশ হইতে বীর্য্যাধান হইলে পুত্র, বাম অংশ হইতে কন্যা, উভয় অংশ হইতে অসম পরিমাণে পতিত হইলে যে অংশ অধিক, সেই অংশানুরূপ এবং উভয় অংশ হইতে সমপরিমাণ পতিত হইলে নপুংসক জন্মিবে। †

(গ) নারীর ডিম্বাধারের বাম অংশ হইতে ডিম্ব পুরুষবীর্য্যে মিশ্রিত হইলে পুত্র, দক্ষিণ অংশ হইতে কন্যা, ইত্যাদি।

(ঘ) উভয়ের শ্বাসে ও প্রশ্বাসে মিল থাকিলে স্ত্রীর আভ্যন্তর কুম্ভক-কালে ও পুরুষের বাহ্য কুম্ভক-কালে রজোবীর্য্যের মিলন হইলে সন্তান কন্যা এবং স্ত্রীর বাহ্য কুম্ভক-কালে ও পুরুষের আভ্যন্তর কুম্ভক-কালে রজোবীর্য্যের মিলন হইলে সন্তান পুত্র হয়।

এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইলে দাম্পত্য সাধককে এমন যৌগিক সামর্থ্য আয়ত্ত করিতে হয়, যেন, ইচ্ছানুসারে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিকে নির্দ্দিষ্ট নাড়ীতে পরিচালিত করিতে, শুক্রকে ইচ্ছামত দক্ষিণ

* মতভেদও দৃষ্ট হয়।

† বৈজ্ঞানিকেরা এ কথায় দ্বিধা প্রকাশ করেন।

বা বাম শুক্রকোষ হইতে নিঃসারিত করাইতে, নারী-বীর্য্যকে বাম বা দক্ষিণ ডিম্বাধার হইতে বহির্গত করাইয়া জরায়ুতে আনিয়া পুরুষ-বীর্য্যের সহিত মিলাইতে এবং একই সময়ে উভয়ের বিপরীত কুম্ভকের মিল রাখিতে কোনও কষ্ট না হয়। বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে চেষ্টা করিলে চতুর্থ উপায়টী সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু অপরাপরগুলি প্রকৃতই অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আমাদের মতে এই সকল ব্যাপার লইয়া খুব বেশী শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত না করিয়া নিয়মিত ভগবৎ-সাধনার দ্বারা দিনের পর দিন এরূপ আধ্যাত্মিক সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্যই যত্নবান্ হওয়া উচিত, যাহাতে, সন্তান-জননকালে মানসিক প্রশান্ততা কিছুতেই হ্রাস প্রাপ্ত না হয়। মনের প্রশান্ত অবস্থায় শ্বাসবায়ু সুষুম্নায় অর্থাৎ উভয় নাসায় থাকে। শ্বাসের সুষুম্নাবস্থিতিই জগতের সকল কল্যাণ-কর্ম্মের সুসময়। মহামুদ্রা *, কার্কীমুদ্রা, অশ্বিনীমুদ্রা, যোনিমুদ্রা এবং সর্ব্বোপরি প্রাণায়াম ও নামজপের দ্বারা সুষুম্না-দ্বার উন্মোচিত হয়। সুতরাং বর্ষব্যাপী সঙ্কল্প এবং তপঃসাধনের পরে স্বামি-পত্নী এই সকল উপায়ে সুষুম্নাদ্বার উন্মোচিত করিয়া তৎপর চিত্তভাবের মালিন্য-নাশক প্রক্রিয়াবলম্বনে কুলপ্রথাগত পবিত্র নিয়মানুসারে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সন্তান-জনন করিলে সন্তান জগতের কল্যাণকারী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। গর্ভাধান এবং তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য বিধিমত অনুষ্ঠিত হইলে, তৎপর ভ্রূণকে ইচ্ছানুযায়ী পুত্র বা কন্যায় পরিণত করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। জনক-জননীর সঙ্কল্পের শক্তি এই বিষয়ে উপেক্ষণীয় নহে।

কথাটী বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দিক হইতে একটু আলোচনা করিতেছি।

* "সংযম সাধনা" ১০ম সংস্করণ ১২৮ হইতে ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রফেসার চাইল্ড বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ, আলোক, তাপ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবগণের ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন, জলের সহিত অল্পমাত্রায় ম্যাগ্নেসিয়াম্ ক্লোরাইড্ গুলিয়া তাহাতে ডিম ফুটাইলে, মৎস্য-শাবকের ললাটের দুই পার্শ্বে দুইটী চক্ষু না হইয়া মধ্যস্থলে একটি চক্ষু ফোটে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগে জীবগণের দৈহিক উপাদানসমূহের পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়াই এইভাবে অঙ্গবিশেষের বৃদ্ধি, সঙ্কোচ, নবোদ্গম বা বিলোপ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক অ্যালেন (Allen) ও ডয়্সি (Doisy) সাহেবদ্বয় মনুষ্যদেহের "হোরমোন্" (Hormone) নামক রসের অপূর্ব্ব কার্য্য ও গুণ-পর্য্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, ইহারই পরিমাণের তারতম্য দ্বারা জীবদেহে স্ত্রী ও পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নের নির্দ্ধারণ হয়। ভ্রূণ ত' সামান্য কথা, যে সকল প্রক্রিয়ায় দেহের "হোরমোন্"-পদার্থের প্রয়োজনানুরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান সম্ভব, তাহাদের প্রয়োগে পরিণত-দেহ পূর্ণযৌবন প্রাণীর পর্য্যন্ত লিঙ্গান্তর ঘটিতে পারে। এডিনবার্গ সহরের ডাক্তার ক্রু (Dr. Crew) এইভাবে একটী পূর্ণায়তন কুক্কুটীকে কুক্কুটে পরিণত করিয়াছেন। ডাক্তার অস্কার রীড্ল (Dr. Oscar Riddle) নামক বৈজ্ঞানিক একটী পূর্ণযৌবনা কপোতীকে এইভাবে লিঙ্গান্তরিত করিয়াছেন। নানাপ্রকারের "ভাইটামিন" (Vitamin) এবং 'হোরমোন' (Hormone)-পদার্থ জীবদেহে প্রবিষ্ট করাইয়াই তাঁহারা এই সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। এই সকল রাসায়নিক পদার্থের যেমন জীবদেহের উৎপাদনগত পরিবর্ত্তন

লিঙ্গান্তরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত

আনয়ন করার ক্ষমতা আছে, মানুষের চিন্তারও তেমন শক্তি আছে। কল্য তারিখ পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি অর্দ্ধ সের তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া অনায়াসে হজম করিয়াছে, অদ্য মাত্র এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন আহারের ঠিক অব্যবহিত পরে সে একটা মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ শ্রবণ করিল,—তাহার খাদ্য নিশ্চিতই জীর্ণ হইবে না। কারণ, স্বভাবতঃ তাহার খাদ্য জীর্ণ করিবার জন্য যে পরিমাণ পিত্তরস প্রয়োজন হইত, দুশ্চিন্তার ফলে তাহার দেহমধ্যে আণবিক পরিবর্ত্তন সৃষ্ট হওয়াতে সেই পরিমাণ পিত্তরস সৃষ্ট হইতে পারে নাই। অদ্য আহারের পূর্ব্বে যদি সে এই দুঃসংবাদ শুনিত, তাহা হইলে তাহার ক্ষুধা লোপ পাইত। অর্থাৎ দুশ্চিন্তার শক্তি তাহার শরীরে এমন আণবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে যে, যে পরিমাণ পিত্তরস পাকস্থলীতে আসিলে ক্ষুধা-বোধ জন্মে, তাহা আসিতে পারে নাই। পরন্ত এই ব্যক্তি যদি দুশ্চিন্তার কারণ সত্বেও দুশ্চিন্তাকে আমল না দিত, তাহা হইলে ক্ষুধার এই তারতম্য বা হজম-ক্ষমতার এই পরিবর্ত্তন ঘটিত না। ইহা দ্বারা চিন্তার ক্ষমতা প্রমাণিত হইতেছে। অত্যন্ত ভীত হইলে মানুষ কাঁপে, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, আনন্দিত হইলে শরীর উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়, শোক-চিন্তার ফলে চক্ষে অশ্রু জন্মে, এই সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, মনের দ্বারা দেহের ভিতরে পরিবর্ত্তন আনয়ন করা যায়। আমেরিকার এক বহু-সদ্‌গ্রন্থ-লেখিকা ডাক্তার শ্রীমতী উড্‌য়্যালেন (Mrs. Mary Wood Allen, M. D.) তাঁহার একখানা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কয়েক ঘণ্টার জন্য গিয়াছিলেন। বন্ধুবর একটী যন্ত্র দেখাইলেন, যাহা দ্বারা তিনি রোগীর মনের ভাব ধরিতে পারেন। রোগীকে তিনি একটী কাচের নলের মধ্যে প্রশ্বাস ফেলিতে বলেন। তৎপরে শৈত্য-

প্রয়োগ করিয়া সেই নিঃশ্বসিত বাষ্পকে তরল অবস্থায় আনয়ন করতঃ একটী রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই তরল পদার্থের বর্ণ-পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা দ্বারা তিনি নির্ণয় করেন যে, রোগীর মনে এক্ষণে কোন্ চিন্তা চলিতেছিল। এক রকমের বর্ণ হইতে তিনি বুঝিবেন যে, রোগীর মনে এতক্ষণ ক্রোধ ছিল, বর্ণ অন্য রকমের হইলে তিনি বুঝিবেন, রোগীর মনে এতক্ষণ বিষাদ ছিল, বর্ণ তৃতীয় আর এক রকমের হইলে তিনি বুঝিবেন, রোগী পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত। ঐ সকলের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, চিন্তা দ্বারা শরীরে বিষ উৎপাদিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাই একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রোধমূলক চিন্তাকারীর থুথুতে এমন এক প্রকার বিষ পাওয়া যায়, যাহা ক্রোধোদ্রেকের পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির থুথুতে ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, চিন্তাদ্বারা দৈহিক উপাদান-সমূহের পরিবর্ত্তন অবশ্যই সাধিত হয়। রক্ত একবার পরীক্ষিত হইবার পর একজন সুস্থদেহ পবিত্রচিত্ত ব্যক্তি যদি দারুণ কামচিন্তায় নিরত হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহার রক্ত পরীক্ষার পর দেখা যাইবে যে পূর্ব্বপরীক্ষার ফলের সহিত এই পরীক্ষার ফল মিলিতেছে না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, চিন্তাদ্বারা দেহের উপাদানের পরিবর্ত্তন হয়। তেঁতুল দেখিলে জিহ্বা হইতে জল পড়ে,—ইহাও চিন্তারই ক্ষমতা। যে ব্যক্তি তেঁতুলের দিকে দৃষ্টি দিয়াও মনকে অন্য কোনও বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে, তাহার জিহ্বা জলসিক্ত হয় না। তেমনি চিন্তার বলে দেহের "হোরমোন্" জাতীয় পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পাদনও নিশ্চিতই সম্ভব। একরূপ চিন্তা দ্বারা যদি শরীরে বিষ উৎপাদিত

চিন্তার শক্তি ও শরীরের আণবিক পরিবর্ত্তন

আনয়ন করার ক্ষমতা আছে, মানুষের চিন্তারও তেমন শক্তি আছে। কল্য তারিখ পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি অর্দ্ধ সের তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া অনায়াসে হজম করিয়াছে, অদ্য মাত্র এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন আহারের ঠিক অব্যবহিত পরে সে একটা মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ শ্রবণ করিল,—তাহার খাদ্য নিশ্চিতই জীর্ণ হইবে না। কারণ, স্বভাবতঃ তাহার খাদ্য জীর্ণ করিবার জন্য যে পরিমাণ পিত্তরস প্রয়োজন হইত, দুশ্চিন্তার ফলে তাহার দেহমধ্যে আণবিক পরিবর্ত্তন সৃষ্ট হওয়াতে সেই পরিমাণ পিত্তরস সৃষ্ট হইতে পারে নাই। অদ্য আহারের পূর্ব্বে যদি সে এই দুঃসংবাদ শুনিত, তাহা হইলে তাহার ক্ষুধা লোপ পাইত। অর্থাৎ দুশ্চিন্তার শক্তি তাহার শরীরে এমন আণবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে যে, যে পরিমাণ পিত্তরস পাকস্থলীতে আসিলে ক্ষুধা-বোধ জন্মে, তাহা আসিতে পারে নাই। পরন্তু এই ব্যক্তি যদি দুশ্চিন্তার কারণ সত্ত্বেও দুশ্চিন্তাকে আমল না দিত, তাহা হইলে ক্ষুধার এই তারতম্য বা হজম-ক্ষমতার এই পরিবর্ত্তন ঘটিত না। ইহা দ্বারা চিন্তার ক্ষমতা প্রমাণিত হইতেছে। অত্যন্ত ভীত হইলে মানুষ কাঁপে, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, আনন্দিত হইলে শরীর উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়, শোক-চিন্তার ফলে চক্ষে অশ্রু জন্মে, এই সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, মনের দ্বারা দেহের ভিতরে পরিবর্ত্তন আনয়ন করা যায়। আমেরিকার এক বহু-সদ্‌গ্রন্থ-লেখিকা ডাক্তার শ্রীমতী উড্‌য়্যালেন (Mrs. Mary Wood Allen, M. D.) তাঁহার একখানা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কয়েক ঘণ্টার জন্য গিয়াছিলেন। বন্ধুবর একটা যন্ত্র দেখাইলেন, যাহা দ্বারা তিনি রোগীর মনের ভাব ধরিতে পারেন। রোগীকে তিনি একটী কাচের নলের মধ্যে প্রশ্বাস ফেলিতে বলেন। তৎপরে শৈত্য-

প্রয়োগ করিয়া সেই নিঃশ্বসিত বাষ্পকে তরল অবস্থায় আনয়ন করতঃ একটী রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই তরল পদার্থের বর্ণ-পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা দ্বারা তিনি নির্ণয় করেন যে, রোগীর মনে এক্ষণে কোন্ চিন্তা চলিতেছিল। এক রকমের বর্ণ হইতে তিনি বুঝিবেন যে, রোগীর মনে এতক্ষণ ক্রোধ ছিল, বর্ণ অন্য রকমের হইলে তিনি বুঝিবেন, রোগীর মনে এতক্ষণ বিষাদ ছিল, বর্ণ তৃতীয় আর এক রকমের হইলে তিনি বুঝিবেন, রোগী পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত। ঐ সকলের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, চিন্তা দ্বারা শরীরে বিষ উৎপাদিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাই একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রোধমূলক চিন্তাকারীর থুথুতে এমন এক প্রকার বিষ পাওয়া যায়, যাহা ক্রোধোদ্রেকের পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির থুথুতে ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, চিন্তাদ্বারা দৈহিক উপাদান-সমূহের পরিবর্ত্তন অবশ্যই সাধিত হয়। রক্ত একবার পরীক্ষিত হইবার পর একজন সুস্থদেহ পবিত্রচিত্ত ব্যক্তি যদি দারুণ কামচিন্তায় নিরত হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহার রক্ত পরীক্ষার পর দেখা যাইবে যে পূর্ব্বপরীক্ষার ফলের সহিত এই পরীক্ষার ফল মিলিতেছে না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, চিন্তাদ্বারা দেহের উপাদানের পরিবর্ত্তন হয়। তেঁতুল দেখিলে জিহ্বা হইতে জল পড়ে,—ইহাও চিন্তারই ক্ষমতা। যে ব্যক্তি তেঁতুলের দিকে দৃষ্টি দিয়াও মনকে অন্য কোনও বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে, তাহার জিহ্বা জলসিক্ত হয় না। তেমনি চিন্তার বলে দেহের "হোরমোন্" জাতীয় পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পাদনও নিশ্চিতই সম্ভব। একরূপ চিন্তা দ্বারা যদি শরীরে বিষ উৎপাদিত

চিন্তার শক্তি ও শরীরের আণবিক পরিবর্ত্তন

হইতে পারে, তবে অন্যরূপ চিন্তাদ্বারা শরীরে অমৃত কেন উৎপাদিত হইতে পারিবে না? লোভমূলক চিন্তাদ্বারা যদি রসনায় জলসঞ্চার সম্ভব হয়, কামমূলক চিন্তা দ্বারা যদি পুরুষের উপস্থমূলস্থ কামগ্রন্থিতে (Prostate Gland) এবং স্ত্রীলোকের যোনিদ্বারস্থ রতিগ্রন্থিসমূহে (Vestibular Gland) কাম-রস-সঞ্চার সম্ভব হয়, শোকমূলক চিন্তাদ্বারা যদি নয়নে অশ্রু-সঞ্চার সম্ভব হয়, তাহা হইলে সুতীব্র ও ধারাবাহিক পুত্রকামনার ফলে পুত্রোৎপাদন-সহায়ক "হোরমোন" কেন উৎপাদন ও পরিবর্দ্ধন করা যাইবে না?

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটী আধুনিক সিদ্ধান্ত নাকি এই যে, ক্রোমোসোমের তারতম্যের উপরে ভ্রূণের স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব নির্ভর করে। মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট যে সকল প্রাণী ভ্রূণের আকারে মাতৃগর্ভে বিবর্দ্ধিত হয়, তাহারা ভ্রূণাবস্থায় প্রথমেই একমাত্র পুরুষ বা স্ত্রী হয় না,—তাহারা সেই অবস্থায় একই সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই থাকে। নারী বা পুরুষরূপে ভ্রূণের সূচনা হয় না, ভ্রূণ তাহার যাত্রাপথে প্রথম পদার্পণ করে উভয়-লিঙ্গ রূপে। সূচনায় সে একাধারে নর ও নারী এই উভয়ের লিঙ্গ হইয়া বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই বিকাশের ক্রমে যখন সে একেবারে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইয়া যায় তখনও তাহার শরীরে কামাদ্রি বা Clitoris রূপে পুরুষাঙ্গের স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়া যায় এবং যখন সে একেবারে পুরুষ-দেহই প্রাপ্ত হয়, তখনও তাহার শরীরে স্ত্রী-শরীরের বিশেষ চিহ্নসমূহ থাকিয়া যায়,—যেমন পুরুষের দেহে স্তনের চিহ্ন। পুরুষ-দেহে এই স্তন-চিহ্নের কোনও সার্থকতা জানা যায় নাই কিন্তু নারী-দেহে এই পুমঙ্গ-চিহ্নের (কামাদ্রি বা Clitoris এর) অবশ্যই যৌন সার্থকতা আছে। ভ্রূণের সৃষ্টি হয় স্ত্রীদেহস্থিত ডিম্বাশয়-জাত ডিম্ব বা স্ত্রী-জনন-বীজের (Ovum)

সহিত পুরুষদেহবিচ্যুত শুক্র-মধ্যস্থ পুং-জনন-বীজের (Sperm-এর) মিলনে। এতদুভয়ের মিলিত হইবার পরে সেই সম্মিলিত-অবস্থাপ্রাপ্ত মাতৃ-গর্ভস্থ ডিম্বের অভ্যন্তর হইতে একপ্রকারের ক্রোমোসোম বা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম গুণাণু * (—গুণের অণু, গুণ-নির্ণায়ক অণু) এবং সেই সম্মিলিত অবস্থাপ্রাপ্ত পিতৃদেহচ্যুত শুক্রকীট বা পুং-জনন-বীজের অভ্যন্তর হইতে অপর একপ্রকারের ক্রোমোসোম বা গুণাণু বহির্গত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিতে থাকে। এই দ্বিবিধ গুণাণু বা ক্রোমোসোমের মধ্যে একের সংখ্যাধিক্য হইলে ভ্রূণের মুষ্ক পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং ডিম্বাশয় অপুষ্ট থাকিয়া যায়, অপরের সংখ্যাধিক্য হইলে ভ্রূণের ডিম্বাশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং মুষ্ক অপুষ্ট থাকিয়া যায়। মুষ্ক বা অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ভ্রূণ পুরুষ হইয়া যায়, ডিম্বাশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ভ্রূণ স্ত্রীতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যে একই সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই ছিল, সে এইভাবে হয়ত একমাত্র স্ত্রী, নয়ত একমাত্র পুরুষ হইয়া যায়। যাহাদের পক্ষে এইরূপ একতরফা ভাগ্য ঘটে না, তাহারা না-স্ত্রী না-পুরুষ বা যুগপৎ স্ত্রী-পুরুষ বা নপুংসক হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তটী দাঁড়াইল এই যে, শুক্রকোষের ক্রোমোসোম বা গুণাণু সংখ্যায় বেশী হইলে সন্তান পুত্র, ডিম্বকোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা বেশী হইলে সন্তান কন্যা হইবে। কে এই ক্রোমোসোমের বা গুণাণুর সংখ্যাধিক্য বিধান করে?

একাগ্র, উদগ্র, দৃঢ় এবং একনিষ্ঠ চিন্তার দ্বারা ক্রোমোসোমের সংখ্যানিয়ন্ত্রণ যে করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস না করিবার কারণ দেখি না। যোগীরা যে ইচ্ছার শক্তিতে দেহের প্রত্যেকটী অণুপরমাণুর

* "গুণাণু",—ক্রোমোসোমের এই পরিভাষা আমাদেরই সৃষ্ট। দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা কি পরিভাষা করিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই।—গ্রন্থকার।

প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নদীর উপর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, ঊর্ণনাভতন্তু অবলম্বনে শূন্যে বিচরণ করিতে পারেন, সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন করিতে পারেন, বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া বেড়াইতে পারেন, শিলামধ্যে বা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারেন,—এই সকল কথা জড়বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত করিবার উপায় যদি নাও থাকে, তথাপি সঙ্কল্পের শক্তিতে যে ইচ্ছানুযায়ী পুত্র-কন্যা জনন সম্ভব, তাহা অতি সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ইহাকে অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া বিধিমত সঙ্কল্পের সাধনা করিবে।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, সন্তান জরায়ুতে প্রবেশ করার পরে চেষ্টা-উদ্যোগ করার অপেক্ষা সন্তান জরায়ুতে প্রবেশের পূর্ব্বে চেষ্টা-উদ্যোগ করা অধিকতর ফলপ্রসূ এবং বুদ্ধিসঙ্গত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কেহ কেহ বলিতেছেন যে, সন্তানের লিঙ্গ-নির্ণয় সম্পর্কিত ব্যাপারে স্ত্রী-ডিম্বকোষোৎপাদিত স্ত্রী-বীজ Ovum প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই করে না। পুরুষের শুক্রকোষ হইতে আগত শুক্রবিন্দু-মধ্যে আনুমানিক যে বিশ কোটি (২০,০০,০০০০০) পুংবীজ (Spermatozoa) বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটী পুংবীজ বা শুক্রকীট স্ত্রী-বীজে প্রবেশ করিয়া সন্তানের লিঙ্গ-নির্দ্ধারণ করে। একটী স্ত্রী-বীজের যে আয়তন, একটী পুং-বীজের আয়তন তাহার একলক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই পুং-বীজের বা শুক্রকীটের মধ্যে কোনওটীর স্ত্রীত্ব ও কোনওটীর পুংস্ত্ব থাকে। স্ত্রীজাতীয় পুংবীজ যদি জরায়ুতে গিয়া স্ত্রীবীজের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সন্তান স্ত্রী হয়, পুংজাতীয় পুংবীজ যদি জরায়ুতে গিয়া স্ত্রীবীজের সহিত

সন্তানের পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্বের কারণ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত

মিলিত হয়, তাহা হইলে সন্তান পুরুষ হয়। স্ত্রীবীজের লিঙ্গ-নির্ণয়ের কোনও ক্ষমতা নাই, শুক্র হইতে যে জাতীয় পুংবীজ যাইয়া স্ত্রীবীজের সহিত মিলিত হইবে, সন্তানটী সেই লিঙ্গই প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কি কারণে একই পিতামাতার দৈহিক মিলনকালে এই বৎসর একটী পুংজাতীয় পুংবীজ গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্র উৎপাদন করিল এবং পর বৎসর একটী স্ত্রীজাতীয় পুংবীজ গর্ভে প্রবেশ করিয়া কন্যা উৎপাদন করিল, সেই বিষয়ে কোনও উত্তর বৈজ্ঞানিকেরা দিতে সমর্থ হন না। এই বিষয়ে একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীরা প্রদান করিতে পারিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তা স্বামি-স্ত্রীর ইন্দ্রিয়-মিলনকে দৈহিক দিক দিয়া বিচার করেন নাই। স্বামী এবং স্ত্রী যখন দৈহিক মিলনে রত হন, তখন সদ্যোদেহত্যাগী মৃতদের আত্মাসমূহ এই গর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে জড় হয়। বায়স্কোপের টিকিট কিনিবার জন্য বা চন্দ্রনাথের মেলার সময়ে রেলের কামরায় ঢুকিবার জন্য লোকে যেমন ঠেলাঠেলি করে, ব্যাপার কতকটা তদ্রূপ। পিতার শুক্র শুক্রকোষ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাতৃযোনিতে পতিত হইবামাত্র বিশ কোটি পুংবীজ বা শুক্রকীটের প্রত্যেকটীকে এক একটী আত্মা আসিয়া আশ্রয় করে এবং এই নির্দ্দিষ্ট মাতৃগর্ভের পবিত্রতার অনুযায়ী পবিত্রতা যে আত্মার আছে, মাতৃগর্ভস্থ স্ত্রীবীজের আকর্ষণের দ্বারা সে সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়া অপর সকল পুংবীজাশ্রয়ী আত্মাসমূহকে পিছনে ফেলিয়া নিজে সবলে যাইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতঃ স্ত্রীবীজ-মধ্যে মিলিত হয়। কখনও কখনও সমান সুকৃতিসম্পন্ন দুইটী আত্মা সম আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সমযোগে গিয়া মাতৃ-জঠরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাই যমজ সন্তান জন্মিবার রহস্য।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীদের সিদ্ধান্ত

নরক

স্ত্রীবীজ-মধ্যে একটী বা দুইটী শুক্রকীট মিলিত হইবার পরে অবশিষ্ট শুক্রকীটগুলি ব্যর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্ধকারময় যোনিপ্রদেশে এই যে অফুরন্ত ভ্রমণ, শাস্ত্রাদিতে ইহাকেই রূপকের মধ্য দিয়া নরক বলিয়া বর্ণনার চেষ্টা হইয়াছে। একটী শুক্রকীট প্রাণপণে ভ্রমণ করিয়াও এক ঘণ্টায় এক ইঞ্চির অতি নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র অগ্রসর হইতে পারে এবং কখনও কখনও এই অগ্রগমন-কার্য্য সাতদিন ব্যাপিয়া চলে। সুতরাং এই অবস্থাকে নরকবাস বলিয়া বর্ণনা করা অস্বাভাবিক নহে। স্বামী এবং স্ত্রী যদি সম্বৎসরব্যাপী সাধনায় এমন সচ্চিন্তা করেন, যাহা একজন পুরুষ সৃষ্টির অনুকূল, তাহা হইলে তাঁহাদের জননোদ্দেশ্যমূলক সঙ্গমের কালে একটী পুংশুক্রকীটকে আশ্রয় করিয়া পত্নী গর্ভবতী হইবেন, ইহা আশা করা অন্যায় নহে। তবে এই বিষয়ে আরও একটি তথ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সন্তানের লিঙ্গ-নির্ণয়ে স্ত্রীবীজের (Ovum) কিছুমাত্রও করণীয় না থাকিলেও স্ত্রীলোকের যোনি-গাত্র হইতে এক প্রকারের অম্লরস নির্গত হয়, যাহা শুক্রকীটসমূহকে ধ্বংস করিতে পারে। অনেক স্ত্রীলোকের যে শারীরিক কোনও ব্যাধি, রক্তের কোনও দোষ, জননযন্ত্রের কোনও অপূর্ণতা বা জরায়ুর কোনও বিকৃতি না থাকা সত্ত্বেও বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়, তাহার কারণ এই অম্লরসের আধিক্য। কোনিগ্‌স্‌বার্গের (Koenigsberg) প্রফেসার উন্টারবার্জার (Unterberger) বন্ধ্যাত্বের এই কারণ অনুমান করিয়া ক্ষারজাতীয় (Alkaline) ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই অম্লরস উৎপাদন স্থগিত করতঃ বন্ধ্যাকে সন্তানবতী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত অম্লরস সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া গেলে স্ত্রী-পুংবীজ বা পুংজাতীয় পুংবীজ এতদুভয়ের

মধ্যে কে যে আগে গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীবীজের সহিত মিলিত হইবে, তাহা দৈবেরই মাত্র পরিজ্ঞাত। উক্ত অম্লরস আংশিক নিবারিত হইলে স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ হইয়া পুংজাতীয় শুক্রকীটই আগে চলিয়া যাইবে এবং স্ত্রীজাতীয় শুক্রকীট পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, অথবা সামান্য অম্লরসেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। বিজ্ঞান এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিঃশব্দ হইতেছেন। এমতক্ষেত্রে দম্পতীর এইরূপ বিশ্বাসই অন্তরে রাখা সঙ্গত যে, পুংজাতীয় শুক্রকীটের স্বাভাবিক শক্তিবর্দ্ধন করিয়া তাহাকে অগ্রগামী করা অথবা যোনিগাত্র-নিঃসৃত অম্লরসকে পরিমিত করিয়া পুংজাতীয় শুক্রকীটের দ্রুত গমনকে নিরাপদ রাখিয়াও স্ত্রীজাতীয় শুক্রকীটকে অগ্রগামী হইতে না দেওয়া প্রভৃতি কোনও উপায় অবলম্বনের কৃত্রিম চেষ্টা না করিয়া প্রবলভাবে চিন্তার শক্তিকে প্রার্থিত বস্তু লাভের দিকে নিয়োজিত করিলে ঈশ্বরেচ্ছাতেই যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া কুশল হওয়া সঙ্গত, তাহাই হইবে।

ডাঃ ভৈরব ভট্টাচার্য্যের নবাবিষ্কার

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বেলগাছিয়া পশুচিকিৎসা-মহাবিদ্যালয়ের এগারটী মাত্র নম্বরের জন্য অকৃতকার্য্য ছাত্র ভৈরব ভট্টাচার্য্যের যুগান্তকারী নবাবিষ্কারের কথাটি অবশ্যই উল্লেখ-যোগ্য। তিনি নিজেই গল্প করিয়াছেন যে, একটি গ্রাম্য চাষালোক তাহার গাভীর গর্ভাধান করাইবার জন্য বেলগাছিয়া আসিয়াছিল। চাষালোকটি বলিল,—"কর্ত্তা, সূর্য্য অস্ত যাইবার আগে এ কাজটি করাইবেন না, কেননা আমি এঁড়ে বাছুর চাহি না।" ভট্টাচার্য্যের মাথায় চিন্তা ঢুকিল,, তবে ত ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা জন্মানোর চেষ্টা করা উচিত। তিনি গবেষণা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার গবেষণা কর্ত্তৃপক্ষের ভাল লাগিল না এবং শুনা যায় যে, আক্রোশবশে পরীক্ষকরা তাঁহাকে

এগার নম্বর কম দিয়া স্নাতক পরীক্ষায় ফেইল করাইয়া দিলেন। দুরন্ত প্রতিভাধর ভৈরব ভট্টাচার্য্য ছুটিলেন জার্ম্মেণী, সেখান হইতে এই বিদ্যায় ডক্‌টরেট অর্জ্জন করিলেন এবং লোকবিস্ময়কর আবিষ্কারের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন জার্ম্মেণীতে, আমন্ত্রিত হইলেন ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। সংগৃহীত শুক্রকে বাহক তরলপদার্থের সহিত মিশাইয়া প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় এমন করা যায় যে, তাহার একাংশের শুক্রটুকু দ্বারা গর্ভাধান করাইলে পুরুষই হইবে, অপরাংশের শুক্রটুকু দ্বারা গর্ভাধান করাইলে স্ত্রীদেহই জন্মাইবে। কিন্তু ইহা টেষ্ট-টিউবের ব্যাপার, মানুষের দেহে টেষ্ট-টিউব আমদানী করিলে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে অপূরণীয় ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। আর একটী বিষয়ে ডাঃ ভৈরব ভট্টাচার্য্য নিজেই গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা এই যে, সবাই যদি কেবল পুত্রই পায়, তাহা হইলে পৃথিবীতে নারীর সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা যে, পৃথিবীর অধিকাংশ পিতামাতা পুত্রই চাহেন, কন্যা চাহেন না। স্বভাবতই পৃথিবীতে পুরুষের মধ্যে দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যা নারী অপেক্ষা অধিক হয়। তাহার পরে যদি আবার পৃথিবী পুরুষেই কেবল ভরিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে, সীতা-হরণ আর হেলেন-হরণ শুধু হরণের পর্য্যায়েই গিয়া থামিবে না, মানব-সভ্যতার উপরে আরও গুরুতর সঙ্কট ঘনাইয়া আসিবে। অর্থাৎ এত বড় একটা আশ্চর্য্য আবিষ্কার আনিয়া শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে পরস্পর হানাহানিতেই প্রবৃত্ত করিবে।

সুতরাং আমাদের আর্য্যঋষিদের বা যে-কোনও ধর্ম্মের আদিম আচার্য্যদের যে ধ্যান ছিল,—"সৎজীবন যাপন কর এবং পুত্র বা কন্যা

পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে ভূমিষ্ঠ হউক",—তাহাই উত্তম পন্থা, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গর্ভাধানের পর রজোবন্ধ হইলেই স্বামী স্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করিবে, স্ত্রী স্বামীকে সন্তান বা পিতৃবৎ জ্ঞান করিবে। স্বামীর দেহই পত্নীর গর্ভে বাস করিতেছে, পত্নীই স্বামীর দেহকে দশমাস দশ দিন পর প্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং জঠরস্থ সন্তান প্রসূত হইয়া মাতৃস্তন্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত পরস্পরের দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের চিন্তাকেও ধর্ম্মদ্রোহ বলিয়া ভয় করিয়া চলিও। পশুর অধম হিতাহিতবুদ্ধিবর্জ্জিত অপদার্থ জীবন কয়েক পুরুষ ধরিয়াই ত যাপন করিয়া আসা হইতেছে, আজ হইতে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার সম্পর্কে ধর্ম্মবুদ্ধি ও সঙ্গতিবোধকে এখন হইতে একান্ত জাগ্রত রাখিতে হইবে। অবশ্য যৌন-তত্ত্ব সম্পর্কে ইংরাজী পুঁথি পড়িলে অথবা যাহারা না বুঝিয়া শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমাদের সকল কথার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া থাকেন, এতদ্দেশীয় সেই সকল গ্রন্থকারদের গ্রন্থ পড়িলে অনেক স্থানেই ছাপার হরফে এমন কথা দেখিতে পাইবে যে, গর্ভাবস্থায় সহবাস করিলে তাহা দ্বারা ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নাই, যদি অবশ্য সম্ভোগকার্য্য একটু সতর্কতার সহিত করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশেই ইহার বিরুদ্ধমতবাদী পণ্ডিত দেখা যায়, গর্ভবতী হইবার পরে ইতর প্রাণীরাও পুরুষকে নিকটে ঘেঁসিতে দেয় না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গর্ভবতী হইবার পরে সহবাস ভগবানের অভিপ্রেত নহে। ফরাসী দেশীয়

গর্ভাধানের পর স্বামিস্ত্রীর মনোভাব

যৌনতত্ত্ববিশারদ ডাক্তার কস্‌লার (Dr. A. Costler) ও ডাক্তার উইলি (Dr, A, Willy) বলিতেছেন,—"It is a fact nevertheless that coitus (during pregnancy) may be as harmful to the mother as to the child. It is well-known that the mucous membrane of the genital organs becomes much more delicate during gestation and therefore more subject to lesions. Infections and inflammations are, then, a not infrequent result of coitus, * * * From the women's point of view it is not indicated because of the dangers which it presents, miscarriage being one of them." "গর্ভাবস্থায় সহবাস শিশুর পক্ষেও ক্ষতিকর, মায়ের পক্ষেও ক্ষতিকর। সকলেই জানে যে গর্ভাবস্থায় জনন-অঙ্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অত্যধিক কোমল হয় এবং এই জন্যই তাহাতে সহজেই ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় সহবাসে প্রদাহ এবং রোগ-সংক্রমণ প্রায় ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। * * * স্ত্রীর দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহা মোটেই সঙ্গতকার্য্য নহে, যেহেতু ইহা দ্বারা বহুবিধ বিপদ ঘটিতে পারে, অকালে গর্ভপাত ঘটা তাহাদের অন্যতম বিপদ।" সুতরাং গর্ভাবস্থায় স্বামী ও স্ত্রীর ভিতরে সহবাস না থাকিলে তাহাদের সঙ্গম-সুখ-বঞ্চনের দুঃখে আর্ত্ত হইয়া যে সকল ভদ্র-লোকেরা মেদিনী কাঁপাইয়া শোক-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করেন, তাঁহাদের আপাতমধুর কুবাক্যে প্ররোচিত হইও না। তাঁহারা সমাজের শত্রু।

গর্ভাবস্থায় সহবাস

গর্ভাবস্থায় সহবাস করিলে সন্তানের দিক দিয়া যে বিষম ক্ষতি হয়, এই প্রসঙ্গে তাহার কথাও উল্লেখ করিব। পাশ্চাত্য-ভাব বা অতিমাত্রায়

আধুনিকতা যাহাদের মেরু-মজ্জা চুষিয়া খাইতেছে, এই গ্রন্থ যখন তাঁহাদের জন্য লিখিত হয় নাই, তখন সন্তানের আধ্যাত্মিক কুশলের দিক হইতে একটা কথা বলিতে কুণ্ঠার কারণ দেখি না। ভারতীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস তোমাদের মনে এক বদ্ধমূল সংস্কার রাখিয়া দিয়াছে যে, মাতৃগর্ভে বসিয়া সন্তানের আত্মা মাতার বক্ষস্পন্দনের সাথে সাথে ভ্রূণ-বক্ষে স্পন্দন অনুভব করতঃ তার সাথে সাথে একাক্ষর পবিত্র প্রণব-মন্ত্র জপ করে। এই জন্য প্রণবকে আদি পরমহংস মন্ত্র বলা হইয়া থাকে। এই প্রণব জপিতে জপিতে সে বারংবার ভগবানের নিকট তাহার অতীত জন্মে কৃত পাপ-রাশির জন্য অনুতপ্ত-অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পরে সে ভগবৎপ্রদত্ত পবিত্র প্রণব-মন্ত্র নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করে। অবিরাম অবিশ্রাম প্রণব জপিতে জপিতে তাহার অন্তরে প্রণবের মধুময় সুখাস্বাদ অনুভূত হইতে থাকে এবং এই সুখাস্বাদনের আনন্দে সে গর্ভবাসের মহাদুঃখকে তুচ্ছ করিতে থাকে। এই অবস্থায় সহবাসরূপ জরায়ু-বিক্ষেপক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ভূকম্পপীড়িত জনপদবাসীর ন্যায় সে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করে, তাহার মন ভগবানের পরম পবিত্র নাম হইতে চ্যুত হয় এবং তাহার গর্ভবাসের দারুণ দুঃখ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আদর করিবে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বাবস্থায় তাহার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করা কখনও সহৃদয়তার পরিচায়ক বা সমীচীন কার্য্য হইতে পারে না।

গর্ভবাসে ভ্রূণের ইষ্ট-স্মরণ

আর একটী দিক দেখিবার আছে। ভ্রূণের শরীর কতকটা গঠিত হইয়া আসিলে তাহার অন্তঃসংজ্ঞা ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে এবং

সে গর্ভে বাস করিয়াই মাতা এবং পিতার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ অনুভব করিতে থাকে—এইরূপ একটী দৃঢ়মূল সংস্কার ভারতীয় সৌজাত্যতত্ত্বের (Eugenics) একটী বিশিষ্টতা। অষ্টাবক্র ঋষি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গ ও শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অভিমন্যু মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই চক্রব্যূহ ভেদের কৌশল শিখিয়াছিলেন। এই জাতীয় সংস্কার ভারতীয় জীবনে মজ্জাগত বলিতে হইবে। এই জাতীয় সংস্কার পোষণের ফলে আমাদের কোনও ক্ষতি হইয়াছে, বিজ্ঞান এমন কথা প্রমাণ করিতে পারিবে না। সুতরাং গর্ভাবস্থায় সঙ্গম করিলে সন্তান তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইবে, এই কথা ভাবিয়া নিজেরাই লজ্জানুভব করিয়া এই কার্য্য হইতে বিরত হওয়া সঙ্গত। গর্ভস্থ শিশুকে গর্ভাবস্থাতেই বরং স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক আদর করা কর্ত্তব্য। তাহার উদ্দেশ্যে মিষ্ট বচন ও শিষ্ট চিন্তা পরিবেশন করা কর্ত্তব্য। এই সকল চিত্তপ্রসাদ-বর্দ্ধক কার্য্যের ফলে গর্ভাবস্থাতেই তাহার চিত্তে প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি জন্মে। একটা গাছকে কটুকথা নিত্য কহিলে তাহা দ্বারা গাছেও ম্রিয়মাণতা জন্মে। ইহা যে-কোনও ব্যক্তি কিছুদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিলে প্রমাণ পাইবে। গর্ভস্থ শিশু গাছের চেয়ে অধিকতর সংজ্ঞা-সম্পন্ন, ইহা প্রত্যেকের বিশ্বাস করা উচিত।

গর্ভাধানের পর হইতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সর্ব্বদা হৃষ্ট ভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য, অতৃপ্তি, অসন্তোষ, বিরক্তি, বিদ্বেষ ও বিষণ্ণতা সন্তানের মানসিক অবনতি ঘটায়। যে দৃশ্য দর্শনে চিত্ত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শতদল মেলিয়া দেয়, যে বাক্য শ্রবণে পরাণ জুড়িয়া আনন্দ-হিল্লোল সমীরিত হয়, যে সুখময়ী স্মৃতির উদ্দীপনে পবিত্রতার প্রেমমাখা প্রবাহে চিত্ত অবগাহন করে, তাহাই

এই সময়ে গর্ভিণীর নয়নপথে, শ্রবণ-পথে ও মনন-পথে সমারূঢ় হওয়া উচিত।

গর্ভাধানের দিন হইতে সন্তান-প্রসবের দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীকে নিম্নলিখিত নিয়মটী পালন করিয়া চলিতে হইবে। তাহাতে ইচ্ছানুযায়ী পুত্র বা কন্যা লব্ধ হইবার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইবে। এই নিয়মটী ভারতীয় জীবনে বহুকাল যাবৎ আংশিক সফলতার সহিত পালিত হইয়া আসিয়াছে। জাপানের একজন চিকিৎসক নাকি * ইহার অনুরূপ একটী প্রণালী অবলম্বনে ১৯৪২ জন গর্ভ-ধারিণীর মধ্যে ১৯০৮ জনের ইচ্ছানুযায়ী পুত্র বা কন্যা লাভের চেষ্টায় সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন। জাপানী চিকিৎসক অবশ্য খেয়ালে-খেয়ালে তত্ত্বটা আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় গার্হস্থাশ্রমী যোগীরা এই তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন। এই জন্য জাপানী চিকিৎসকের উপদেশের সহিত তুলনায় নিম্নলিখিত উপায়টী সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ। যথা—

গর্ভাধানের পর স্ত্রীর করণীয়

স্বামীর সহিত সম্মিলিত উপাসনা ও শক্তিসাম্য করিয়া আসিয়া মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া বসিয়া জালন্ধর বন্ধ অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্কোচনপূর্ব্বক হৃদয়ে চিবুক সংন্যস্ত করিবে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভ্রূমধ্যের সহিত নাভিমূলের একটা জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি-সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া ভাবনা করিবে। তৎপরে জরায়ু-মধ্যে মনঃসংযোগ করিয়া বার বার সঙ্কল্প করিতে থাকিবে,—"আমার গর্ভে বীর্য্যবান্, তেজস্বী, পরমকর্ম্মী পুত্র উৎপাদিত হউক", অথবা, কন্যা-প্রার্থনা থাকিলে —"বীর্য্যবতী,

* বাংলা ১৩২৯ সালের কোনও সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তেজস্বিনী, পরমকল্যাণময়ী কন্যা উৎপাদিতা হউক।" যতক্ষণ নিদ্রিতা না হও, ততক্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত বার বার এই একমাত্র সঙ্কল্পই করিতে থাক। একদিনও যেন বাদ না যায়, একদিনও যেন ভুল না হয়, একদিনও যেন মনোযোগ না কমে। দিনের পর দিন একই সঙ্কল্পের সাধন করিতে করিতে তোমার ইচ্ছা দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করিবে। বিশ্বাস কর, সাফল্য তোমার অবশ্যম্ভাবী ; তুমি যতই সামান্যা নারী হইয়া থাক না কেন, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিয়মিত অভ্যাস, নিরন্তর উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাসের বলে নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা এই যে, **এই ব্যাপার-সম্পর্কিত কথা বাহিরে সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া চলিতে হইবে।** শুধু এই বিষয়েই নহে, দাম্পত্য জীবনে আত্ম-গঠন-প্রযত্নে গোপনতা সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়। সংসঙ্কল্পের কথা অন্তরের নিভৃত প্রদেশে গোপন যাহারা রাখিতে পারে না, ক্রমশঃ বহিরালোচনার সুযোগে তাহাদের সঙ্কল্পের মূলদেশ শিথিল হয়, দৃঢ়তা কমিয়া যায়। দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়াও ব্রহ্মচর্য্যকে, ইন্দ্রিয়-সংযমকে, নিষ্কলুষ নিষ্কামতাকে অটুট রাখিবার মত ব্রত যাহারা গ্রহণ করিয়া সফলতার সহিত ব্রত-পথে অগ্রসর হইতেছে, এমন বহু দম্পতী মন্ত্রগুপ্তির অভাব-হেতু সঙ্কল্পচ্যুত ও ব্রতভ্রষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রগুপ্তি জীবনের অধিকাংশ সাধনায়ই সিদ্ধিপথের পরমা বান্ধবী।

গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তা

উপসংহার

যত কথা বলিবার ছিল, সব কথা বলিতে পারি নাই। যাহা অকথিত রহিল, তাহা বিবাহিত দম্পতীরা নিজ নিজ সাধন-জীবনের পূর্ণতার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবেন। ভগবানকে জীবনের সিংহাসনে তাঁহারা যতটুকু স্থান দান করিবেন, দাম্পত্য-সাধনার প্রকৃত অর্থ, ব্যাপ্তি ও প্রভাবের পরিচয় ততই তাঁহাদের আচরণে স্ফুটতর হইয়া উঠিতে থাকিবে। ভগবানকে যতই তাঁহারা ভুলিয়া থাকিবেন, ততই তাঁহারা অন্ধকারে ডুবিবেন, কল্যাণ-বঞ্চিত হইবেন, দুঃখের হাহাকারে গগন-পবন প্রপূরিত করিবেন। ইহমুখ স্থূলসত্ত্ব পাশ্চাত্যেরা বিবাহিত-জীবনের মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া মৃত্যু-সঙ্কুল স্বাধীন প্রেমের মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া মরিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইহকালকে অস্বীকার না করিয়াও দাম্পত্য জীবনের মধ্যে পরকালের কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। দেহজ্ঞানী পশ্চিম নারী ও পুরুষের আকর্ষণের মধ্যে ভগবানকে খুঁজিয়া না পাইয়া মদির-পিপাসার পঙ্কাবর্ত্তে ডুবিয়া শুধু বিভ্রাটই ঘটাইয়াছে, শুধু বিপদই আহরণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ দেহের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনকে তাচ্ছিল্য না করিয়াও দেহের মধ্য দিয়াই আত্মার উদ্ধার এবং আত্মার মধ্য দিয়াই দেহের উদ্ধার সাধন করিবে।

নারী পুরুষের জন্য ব্যাকুলা হয়, ইহা কি একমাত্র নারীরই ব্যাকুলতা ? পুরুষ নারীর জন্য অধীর অস্থির হয়, ইহা কি একমাত্র পুরুষেরই অধীরতা ? নারী ও পুরুষের দেহে যে কোটি কোটি অণুপরমাণু

তাহাদের প্রাণসত্তা লইয়া জীবন্ত চঞ্চলতায় বিদ্যমান, এই পিপাসা, এই ক্ষুধা, এই ব্যাকুলতা, এই অধীরতা কি তাহাদেরও নহে ? নারী-পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়া তাহাদেরও কি পূর্ণ তৃপ্তি, পূর্ণ তুষ্টি, সকল স্পৃহার পরিপূর্ণ আস্বাদন প্রয়োজন নহে ? স্বামী এবং স্ত্রীর দৈহিক মিলন কি এই দুইটী প্রাণীরই পিপাসা মিটাইবার চেষ্টা মাত্র ? এই উভয়ের দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছে যে প্রাণময় কোটি কোটি অণুপরমাণু, তাহাদেরও কি পিপাসা মিটাইবার দাবী ইহার ভিতর দিয়াই পূরণ করিতে হইবে না ?—ভারতবর্ষ তৃষ্ণার মরুমরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আপন সাধন-বলে এই নিদারুণ প্রশ্নের মীমাংসা অর্জ্জন করিবে এবং সেই মীমাংসাকে পূর্ণজ্ঞানের অমোঘ আলোকে দর্শন করিয়া তাহার কর্ম্মময় জীবনের প্রতিপাদক্ষেপে তাহাকে জীবনের অঙ্গাঙ্গী অংশে রূপায়িত করিবে। ইহাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছি।

ভারতের ভবিষ্যৎ

হে ভারতের নবীন তাপস এবং তাপসী, হে ভবিষ্যৎ ভারতীয় মহামানব-জাতির জনক এবং জননীবৃন্দ, তোমরা আজ ভুলিও না যে, তোমাদের জীবনের সংযম বা অসংযম জাতির ভবিষ্যৎকে গৌরবোজ্জ্বল অথবা মসীকৃষ্ণ করিয়া দিতে পারে। আমরা আমাদের বর্ত্তমান দেহ পরিত্যাগের কাল আসিলে পুনরায় তোমাদেরই ঔরসে এবং জঠরে নবজন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতীর্থময়ী এই ভারত-ভূমির পুণ্যপীঠে ভূমিষ্ঠ হইতে চাই। যে ঔরস সংযম-রক্ষিত এবং যে জঠর তপস্যাপূত, তেমন ঔরসে তেমন জঠরে স্থান না পাইলে যে আমাদের বিশ্বগ্রাসিনী কল্যাণাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিব না ! সমগ্র জীবনের আপ্রাণ প্রয়াসের দ্বারা যদি সামান্য কিছু সুকৃতির সঞ্চয় করিবার সৌভাগ্য পাই,

ঔরসের দোষে আর জঠরের দুর্ব্বলতায় যে তাহা ম্লান হইয়া পড়িবে বাছারা ! তাই বলি, কৃতাঞ্জলিপুটে বলি, অনুনয়ের সহিত বলি, একান্ত কাতরতার সহিত বলি,—হে বিবাহিত ভারত, হে দাম্পত্য ভারত, নিত্যমুক্তিকামী মহাপুরুষদের অবতরণের জন্য না হউক, আমাদেরই ন্যায় যাহারা মুক্তির প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ, আমাদেরই ন্যায় কোটি কোটি বার জন্ম-মরণের অসহনীয় দুঃখকষ্টকে যাঁহারা যাচিয়া চাহেন, অন্ততঃপক্ষে সেই সকল মানবাত্মার নবদেহে নবসংগ্রামলীলার জয়িষ্ণুতা বর্দ্ধনের জন্য তোমরা সংযত হও, আত্মস্থ হও ; মানুষ হও। আমাদের ন্যায় সামান্য মানবেরাও জগৎকল্যাণের অফুরন্ত প্রার্থনার শক্তি লইয়া নূতন দেহে যেদিন তোমাদের ক্রোড়ে ঠাঁই পাইবেন, সেইদিন তাঁহাদিগকে নিত্যমুক্ত মহাপুরুষদেরই মতন দেখাইবে, সেইদিন তোমাদের আঙ্গিনা নিত্য-কিশোরেরই নয়নানন্দ নৃত্যলীলায় লাঞ্ছিত হইবে। সেদিন তাঁহাদেরও যেমন প্রাণ জুড়াইবে, তোমাদেরও তেমন দগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে। হে গৃহী ভারত, আজ তাহারই জন্য প্রস্তুত হও।

পরিশিষ্ট

("বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থ প্রকাশের ফলে দেশমধ্যে বহু সংখ্যক কৌতূহলী পাঠকের নানা নিগূঢ় বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা গ্রন্থকারকে নানাবিধ প্রশ্ন করেন। ঐ সময়ের কথোপকথন লিখিত ভাবে কতক রক্ষিত হইয়াছিল। সেই কথোপকথন সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রকাশিত হইল।)

কাম ছাড়া জীবসৃষ্টি যে হ'তেই পারে না, একথা সত্য নয়। অন্যান্য জীবের কথা যা-ই হোক্, মানুষের কথা স্বতন্ত্র। সে তার ইচ্ছাশক্তির বলে সবই কত্তে পারে। ইচ্ছা কর্ল্লেই বাপমায়েরা কামগন্ধহীনভাবে সন্তান-সন্ততির জন্ম দিতে পারেন। প্রয়োজন ইচ্ছার, এখানে দৈবের কোনও স্থান নেই।

সহবাস ব্যতীত কখনও সন্তান জন্মাতে পারে না, একথা ঠিক; কিন্তু কামগন্ধহীনভাবে সহবাস হ'তে পারে। সেই সহবাসে ভোগলিপ্সা নেই, আছে কর্ত্তব্যবুদ্ধি। তাতে মত্ততা নেই, আছে মনের গভীর স্থিরতা, আছে হৃদয়ভরা কল্যাণ-প্রেরণা। আছে আত্ম-বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, দেহাতীত তত্ত্বে মনকে ডুবিয়ে রাখার অপার যোগ্যতা।

এ কথা অসম্ভব মনে হবারই কথা। অধিকাংশ মানবেরই জন্ম কাম থেকে হচ্ছে। কাম-সংস্পর্শ-মাত্র-শূন্য হ'য়ে যে দু-একজন মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তাঁদের পিতামাতার মনের ইতিহাস জগৎ কি জান্তে পেরেছে? সাধারণ লোক নিজ নিজ মন দিয়ে সকলের মনকে বিচার কচ্ছে। তাই তাঁরা দেখতে পাচ্ছে যে, কাম ছাড়া জন্ম

অসম্ভব। কিন্তু নিজের মনকে নিয়ে যাঁরা অনেক কসরৎ করেছেন, অনেক খাটুনী খেটেছেন, তাঁরা অনায়াসে বুঝতে পারেন যে, সাধক-গৃহীরা ইচ্ছা কর্‌লে দেহকে এক স্থানে এক কাজে লাগিয়ে মনকে আর এক স্থানে আর এক কাজে রাখতে পারেন।

যার মন অভ্যাসের বলে নিয়মিত হয় নি, চেষ্টা দ্বারা সংযমিত হয় নি, তার মন উপাসনার কালে কলুটোলায় চটিজুতো কিনতে যায়, আহারে ব'সে খেলার মাঠে ঘুরে বেড়ায়। এই রকম অব্যবস্থিত মনের কথা আমি বল্‌ছি না। চেষ্টার দ্বারা, নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা মনকে মানুষ আলাদাভাবে তৈরী ক'রে নিতে পারে। আমার পিতৃদেবের মুখে শুনেছি, দশ-বারোজন সমকক্ষ ওস্তাদ-লোক যদি এক 'সাথে দশটী বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন তালে, বিভিন্ন গান আরম্ভ ক'রে দিতেন, তবে তিনি যে-কোনও নয় জন গায়কের গানে একেবারে বধির থেকে মাত্র একটী গায়কের গান শুনতে পাত্তেন, কাণে এসে সকলেরই গানের আওয়াজ পৌঁচাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন মাত্র একটীকেই গ্রহণ কচ্ছে, বাকী-গুলিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা হ'ল তৈরী-করা মনের কথা। মনকে মানুষ এমন ভাবে তৈরী কত্তে পারে যে, দেহ যখন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, মনটা তখন সেই জ্বালা-যন্ত্রণায় না থেকে দেহ-মনের অতীত কোনও মহত্তর সত্তায় অবস্থান কচ্ছে। আমাদের দেশের যোগী পুরুষদের অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী নাই বল্লাম, এমন কি যুরোপেও দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্মমতের জন্য একজনকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, অথচ তিনি অণুমাত্র কাতরতাও দেখালেন না। দেহের চরম দুরবস্থাতেও দেহের মধ্যে তাঁর মন নেই, তিনি যে-ধর্ম্মের উপাসক, যে আদর্শের ধ্যাতা, সেই ধর্ম্ম ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর মনটিকে তিনি যুক্ত ক'রে

দিয়েছেন এবং সেই যোগ এত গভীর হয়েছে যে, দেহটা যে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, তা তিনি টেরও পাচ্ছেন না। যাঁদের মনের বল এমনিতর, তাঁরা অন্যান্য সময়েও ইচ্ছা করলে মনকে এভাবে অন্যত্র রাখ্‌তে পারেন,—এমন কি ইন্দ্রিয়-চেষ্টার সময়েও।

সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা ইন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, তাঁরা সবাই এক বাক্যে বলেছেন যে, কামই জীবসৃষ্টির মূল। কিন্তু যোগদৃষ্টি যাঁদের ফুটেছে, তাঁরা একথা সর্ব্বত্র মান্‌তে পারেন না। সাধারণ লোকের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সে শুধু লোকের বহিরাচারটুকুই দেখে, অন্তরের খোজ-খবর সে পায় না। যোগীরা অন্তরের খবরাখবর রাখেন। তাই তাঁরা যীশুর জন্মকথাকে আজগুবি গল্প ব'লে উড়িয়েও দেন না, আবার মেরীর গুপ্ত-প্রণয় ব'লেও ব্যাখ্যা করেন না। বিশ্বাসী যীশু-ভক্তেরা এইটুকু মনে ক'রেই নিশ্চিন্ত যে, মেরীর গর্ভে যীশুর যে আবির্ভাব, তাতে ভগবানের ইচ্ছাই যথেষ্ট, কোনও মানুষের পক্ষে বীর্য্যাধান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সে কথা শুন্‌বেন কেন? তাঁরা বল্‌লেন, নিশ্চয় যীশুর কোনও পিতা ছিলেন এবং অবৈধ প্রণয়ের ফলে তাঁরই ঔরসে যীশুর জন্ম হয়েছে, নইলে মেরীর স্বামী যোসেফ কেন জান্‌লেন না? কিন্তু যোগীরা নিজেদের উপমায় এই দুই বিরোধী ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য কত্তে পারেন। কারণ, তাঁরা মনের দিকেই দৃষ্টি দেন এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকেও স্বীকার করেন। তাঁরা বিজ্ঞানের যুক্তিকে তুচ্ছ মনে করেন না, যেহেতু যোগবিদ্যাও একটা বিজ্ঞান, স্থূল বিজ্ঞান নয়—সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। তাই তাঁরা যীশুর জন্মের মধ্যে গর্ভ বা ঔরসের উপরে জোর না দিয়ে জোর দেন সেই দুই মহাশক্তিশালী মনের উপরে যা' যীশুর জননকালে দেহকে দেহের কর্ত্তব্যে নিযুক্ত রেখে

নিজেরা ডুবেছিল অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে। এই জন্যই মেরীর যখন গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন তিনি বল্‌তে পার্লেন না, কে এই গর্ভের আধান-কারী। যোগী কখনো বিশ্বাস কত্তে পারেন না যে, যীশুর যিনি মা, তিনি জেনে শুনেও যীশুর জন্ম-কারণ গোপন কর্ব্বেন। যোগীর সিদ্ধান্ত এই যে, যোগসাধনায় যখন মেরী ও যীশু-জনকের নিজস্বতা ব্রহ্মে অর্পিত হয়েছিল, এমন শুভ ও পবিত্র মুহূর্ত্তে যীশু তাঁর মায়ের স্বামীর ঔরসে মাতৃজঠরে স্থান পেয়েছিলেন। সুতরাং বিশ্বাস কত্তে বাধা হয় না যে, সমাজের দৃষ্টিতে যিনি মেরীর স্বামী ছিলেন, তিনিই স্বয়ং যোগাবস্থায় যীশুর জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু মেরীর ন্যায় তাঁরও জনন-বিষয়ক স্মৃতি বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই তিনি মেরীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশে সন্দিগ্ধ হ'য়েছিলেন। অন্ধ-বিশ্বাসীরা যীশুর জন্ম সম্বন্ধে গাথায় বিশ্বাস ক'রে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেন। আবার জড়দৃষ্টি ব্যক্তিরা যীশুর জন্মকে নিজেদের পঙ্কিল মনের প্রলেপ দিয়ে যা-তা ব'লে ব্যাখ্যা করেন। যোগী তা করেন না। যোগী জানেন, বীর্য্যাধানে জীবোৎপত্তি হয়, কিন্তু বীর্য্যাধান-কালেও মানুষ তার মনকে এমন অপার্থিব অবস্থায় রাখ্‌তে পারে, যার খোঁজ পেতে বৈজ্ঞানিককে আরও অনেক শতাব্দী খাটতে হবে। গৃহস্থ যোগী তাঁর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এবং মনোজগতের রহস্য সম্বন্ধে তাঁর যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তার বলে, পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক এই দুই বিরোধী মতের সামঞ্জস্য ক'রে নেন।

মানুষের মনের শক্তি যে কত অদ্ভুত, তার সম্বন্ধে তোমার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। যে যা প্রত্যক্ষ করেনি, তার পক্ষে তা কখনো ঠিক ঠিক বিশ্বাসে আসে না। অন্ধ বিশ্বাস একটা বিশ্বাসই নয়। সকল বিরুদ্ধ যুক্তি, সকল বিরুদ্ধ তর্ক এবং সকল বিরুদ্ধ সাক্ষ্য যে বিশ্বাসকে

একচুল সরিয়ে দিতে পারে না, তারই নাম আসল বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাস অম্‌নি আসে না। তার জন্য, সম্পূর্ণ না হোক্ অন্ততঃ আংশিক হ'লেও, প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাই। সাধন-ভজন কর, মনকে শাসনাধীনে আন্‌বার জন্য অবিরল ভাবে চেষ্টার পর চেষ্টা চালাও, কালে বুঝতে পাবে এবং বিশ্বাস আস্‌বে। কামাচার আর কামুকতা এক কথা নয়। কামাচার ছাড়াও কামুকতা সম্ভব, আবার কামুকতা ছাড়াও কামাচার সম্ভব। তবে, কামাচার ছাড়া কামুকতা যত অধিক সম্ভব, কামুকতা ছাড়া কামাচার তত অধিক সম্ভব নয়। যোগাসনে ব'সেও কামুকতা সম্ভব, আবার কামচর্চ্চায় থেকেও যোগাভ্যাস সম্ভব। কিন্তু প্রথমটী যত সহজে সম্ভব, দ্বিতীয়টী তত সহজে সম্ভব নয় এবং প্রথমটী যেমনই নিন্দনীয়, দ্বিতীয়টী গৃহীর পক্ষে তেমনই প্রশংসনীয়। সাধারণতঃ গৃহীর জীবন থেকে কামাচারকে নির্ব্বাসিত করার উপায় নেই। নানা প্রয়োজন থেকেই গৃহীকে কামাচারের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে হ'তে পারে। কিন্তু কামাচার থেকে যাতে কামুকতা নির্ব্বাসিত হ'য়ে যায়, তার জন্য যদি ক্রমাগত চেষ্টা কত্তে থাক, তা হ'লে এমন একটা সময় আস্‌বেই, যখন কামাচার থেকে কামটা পৃথক্ হ'য়ে যাবে। মন যদি ভগবানে থাকে, তাহ'লে কাম পালাবার পথ পায় না। কিন্তু সর্ব্বসময়েই যার মন ভগবানে থাকে, কামাচার ব্যাপারটী এমনি ভীষণ যে, তার মনও কামাচারের সময়ে ভগবানে থাক্‌তে চায় না, দেহ-সুখের প্রার্থনাই কর্ত্তে থাকে। কিন্তু হাজার হোক্, সে মন ত'! মনের স্বভাবই হ'ল এই যে, সে শক্তের ভক্ত আর নরমের যম। শক্ত হাতে তার টুঁটি চেপে ধর্‌লে তাকে যে দিকে খুশী সেই দিকে নিতে পার্‌বে। মন যদি দেহের সুখে না থাকে, তবে কামাচারের মধ্যে আর কাম থাক্‌বে কি করে?

যে ভাষা প্রয়োগে, যে ব্যবহারে একের বা অন্যের কামোদ্রেক সম্ভব, হস্ত-পদ-মুখাদির যেরূপ সঞ্চালন কর্ল্লে একের বা অন্যের কামোদ্রেক সম্ভব, তাকেই বলি কামাচার। মনে যদি কাম নাও থাকে, তবু এই আচারকে বল্‌ব কামাচার। সাধন-ভজনের গুণ হচ্ছে এই যে, তাতে কামাচার থেকে কাম দূর হ'য়ে যেতে পারে।

সন্তান-জননরত গৃহীরা সকলেই কামুক নন, কিন্তু কামাচারী প্রত্যেকেই। মনশ্চাঞ্চল্য প্রশমনের জন্য জননকালে তিনি প্রাণায়াম কত্তে পারেন, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি ও লক্ষ্য রেখে দেহের স্পন্দনে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ কত্তে পারেন এবং এইসব কৌশলের মাহাত্ম্যে দেহসুখের প্রার্থনাকে এবং দেহসুখের অনুভূতিকে দূর ক'রে দিয়ে নিষ্কাম হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর যা ব্যবহার, তাকে কামাচারই বল্‌ব। শত শত জনে যা' ক'রে থাকে কামের দায়ে, যোগাভ্যাসী গৃহী তাই ক'রে যাচ্ছেন কামলিপ্সাহীন হয়ে,—এইটুকুমাত্র পার্থক্য। উনি কামাচারী, কিন্তু কামুক নন। কামাচারকালে, কামের অভাব হেতু তাঁর কোন প্রকার দৈহিক কামানুভূতি থাকে না। গৃহস্থ যোগী বলেন, দেহটাকে দেহের কাজে নিযুক্ত ক'রে দিয়ে তিনি এমন এক অপূর্ব্ব অবস্থায় এসে পড়েন যে, দেহ তাঁর আছে কি নেই, সেই খেয়াল পর্য্যন্ত থাকে না। সে সময় কেউ যদি তাঁর পায়ের একটা আঙ্গুল কেটে নিয়ে যায়, তিনি তাও টের পান না।

যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাই যখন লড়াই করে, তখন মন থাকে তার শত্রুনাশে, তাই বুকের মাঝখানে গোলা-গুলি পড়লেও সে টের পায় না। শিক্ষানবীশ যোদ্ধার হয়ত প্রাণভয় থাকে, কিন্তু পাকা যোদ্ধার চিত্ত-চঞ্চলতা থাকে না। গৃহী সাধকেরও তেমন। অবশ্য, এরূপ অবস্থা লাভ কত্তে গৃহী সাধকদের বহুবর্ষব্যাপী সাধন প্রয়োজন। দু-এক বৎসরে বড়

একটা হয় না। প্রথম প্রথম কামাচার থেকে কামটুকুকে পৃথক্ ক'রে নিতে বড় কেউ পারেন না। সাধন-ভজন কত্তে কত্তে এ ক্ষমতা ক্রমশঃ এসে যায়। সাধন-ভজনের অসাধ্য কিছুই নেই।

যে সাধনই কর, দ্বাদশ বর্ষ একাগ্র মনে করা চাই, তবেই সিদ্ধি। এই জন্যই বারো বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে তারপরে গৃহী হবার ব্যবস্থা, আগে নয়। গোঁড়া ওস্তাদরা বলেন, বারো বৎসর সারেগামা না সাধলে সঙ্গীত শিক্ষা করা যায় না। একজন পালোয়ান আমাকে বলেছিলেন, একাদিক্রমে বারো বৎসর কুস্তি না করলে শরীরই ঠিক হয় না।

সন্তান-প্রসবের পর যতদিন পর্য্যন্ত না প্রসূতির দেহ পূর্ণ সুস্থ হচ্ছে, যতদিন না সন্তান মাতৃস্তন ছেড়ে দিচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত পুনরায় সন্তান-জনন অসঙ্গত। মোট কথা, একটী সন্তান তিন বৎসর বয়ঃক্রম না পাওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় সন্তান-জনন-চেষ্টা কর্ত্তব্য নয়।

কিন্তু গৃহীরা যদি এরূপ সংযম রক্ষা ক'রে চলতে না পারে, তার জন্যই সাধন-ভজন দরকার। সাধন-ভজনের বলে কামার্ত্ত মন প্রেমার্ত্ত হয়, দেহলোভী মন পরমাত্মলোভী হয়।

গৃহীদের ও সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনে কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটা মূলগত নয়, শাখাগত, উৎসগত নয়, প্রবাহগত। কি গৃহী, কি প্রব্রজিত, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি কিশোর, কি বৃদ্ধ, মূল সাধন সকলেরই এক। তবে গৃহীদের সুযোগ-অসুযোগে আর সন্ন্যাসীদের সুযোগ-অসুযোগে পার্থক্য আছে। স্ত্রীজাতির সুযোগ-অসুযোগে আর পুরুষদের সুযোগ-অসুযোগে পার্থক্য আছে। কিশোর ও যুবকদের শক্তি-সামর্থ্যে তফাৎ আছে। তাই প্রণালীর তফাৎ। কিন্তু সকল প্রণালীর মূল লক্ষ্য যোগে বা চিত্তস্থৈর্য্যে। ধর্ম্মসাধনায় সন্ন্যাসী

অপেক্ষা গৃহীর অবসর কম, আবার ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে গৃহীর লিপ্ততা অবশ্যম্ভাবী। এই দুই কারণেরই জন্য প্রণালীর পার্থক্য হচ্ছে।

জীবের যত কিছু সাধন-ভজন, সবই দুটীমাত্র শব্দ নিয়ে। একটী হচ্ছে "আমি", অপরটী হচ্ছে "তুমি"। অদ্বৈতবাদী হও, দ্বৈতবাদী হও, আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, এই দুইটী শব্দের মূলধন নিয়েই তোমার সাধন-ভজনের সমুদয় কারবার। হয় তুমি আর আমি অভেদ; নয় তুমি আমার, আমি তোমার; নয় তোমাতে আমি, আমাতে তুমি; নয় তোমা হ'তে আমি, আমা হ'তে তুমি;—এই রকমে "তুমি" আর "আমি" দিয়ে আমরা যার যার রুচিমত প্রকৃতিমত সামর্থ্যমত নানাবিধ সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে পাতিয়ে নিচ্ছি। রুচি-প্রকৃতি বুঝে কারো অভেদ-সম্বন্ধ, কারো ভেদ সম্বন্ধ, কারো বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকেই ডাকাডাকির কৌশলে কোথাও "সোঽহং", কোথাও "হংস"—"অহংস", কোথাও "ওঁ"—কারে পরিণত করা হচ্ছে। এই ব্যাপার নিয়ে যিনি যত অধিক ডুবে যেতে পাচ্ছেন, তাঁর সাধন-প্রণালী তত সূক্ষ্মস্রোতা হ'য়ে আসছে। গৃহীর বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ততা বেশী, বহির্ম্মুখী বিক্ষিপ্ততা অধিক, তাই ডোব্‌বার সুযোগ তার কম। এই জন্যই সন্ন্যাসীদের তুলনায় গৃহীর প্রণালীর স্রোত অনেক সময় একটু স্থূল। অগ্রসর হ'তে হ'তে গৃহী এই স্থূল স্রোত অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্ম স্রোতে যেতে পারেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে কাজটী আংশিকভাবে সোজা। এই জন্যই প্রায়শঃ দেখা যায়, সন্ন্যাসীদের মধ্যে নির্গুণ উপাসক, নিরাকার উপাসক বা অদ্বৈতভাবের সাধকদের সংখ্যা বেশী। জোর-জবরদস্তি করে ত' সাধন হয় না, যার যার অবস্থার অনুকূলভাবেই ধর্ম্মমত ও সাধনপথ গ'ড়ে নিতে হয়। ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্ভাবন-স্থান ত'

বেদ কোরাণ বা বাইবেল নয়, যার যার নিজ প্রকৃতিই যার যার ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথের জন্মভূমি। একজন যে গৃহী হচ্ছে আর একজন যে সন্ন্যাসী হচ্ছে, প্রকৃতি-পার্থক্যই তার আদি কারণ। দৃষ্টান্ত যেমন, গৃহীর ইন্দ্রিয়-জয় আর সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-জয়ের ধারণায় পার্থক্য আছে। এই জন্যই গৃহী ও সন্ন্যাসীর সাধন-প্রণালীর পার্থক্য। ভোগ্য-পরতন্ত্র হবেন না, অথচ ভোগ করবেন, এ হ'ল গৃহীর ইন্দ্রিয়-জয়। আর, গৃহত্যাগীর ইন্দ্রিয়-জয় হচ্ছে, ভোগ্য বিষয়ে অপ্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত ভোগরাহিত্য। ইন্দ্রিয়জয়ী গৃহী সন্তান-জনন কর্ব্বেন। কেন কর্ব্বেন? না, কল্যাণ-সাধনাকে পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রবাহিত রাখ্‌বার জন্যে। কিন্তু সন্তান-জনন ইন্দ্রিয়ভোগ-সাপেক্ষ। সুসন্তান-জননের জন্য জনক ও জননীর সুপুষ্ট দেহ রসনার ভোগ-সাপেক্ষ। পুরুষানুক্রমিক সৌন্দর্য্য-বোধ ও সুষ্ঠুতাবোধ রক্ষাকল্পে জনক-জননীর চক্ষুর ভোগও চাই। তাই গৃহীর ইন্দ্রিয়জয় সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়জয় হ'তে পৃথক্। ভোগ্য-পরতন্ত্র না হ'য়ে যদি ভোগ হয়, এই ভোগ যদি পুণ্য-সঙ্কল্প-মূলক হয় এবং সঙ্কল্প-পূরণার্থ যতটুকু প্রয়োজন, এই অনাসক্ত ভোগ যদি তার অতিরিক্ত না হয়,—তবেই গৃহীর সেরা ইন্দ্রিয়জয় হ'ল। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে ইন্দ্রিয়জয়ের মাপকাটি আলাদা। সর্ত্তও আলাদা। গৃহী ইন্দ্রিয়-জয় ক'রে চলতে অক্ষম হ'লে তার জন্য কঠিন শাসন নাই, সন্ন্যাসী অক্ষম হ'লে তার প্রায়শ্চিত্ত কঠোর। ইন্দ্রিয়ব্যাপারে রুচিমাত্রেই সন্ন্যাসী ব্রতচ্যুত, ক্রিয়ানিষ্পত্তি দূরের কথা, রমণেচ্ছামাত্রেই সে পতিত, সামান্য চিত্তবিভ্রংশেই সে অধম পাপী। কিন্তু গৃহীর? রমণেচ্ছা ছোট কথা, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে রত হ'লেও সব সময়ে তা' ত্রুটী ব'লে বিবেচিত হয় না এবং যখন তা' ত্রুটী ব'লে বিবেচিত হয়, তখনও তার জন্য ক্ষমা আছে। এই সব পার্থক্যের দরুণেই গৃহী আর সন্ন্যাসীর

সাধন-প্রণালীতে তফাৎ হয়। আরও একটা কথা আছে, যাতে গৃহীর সাধন আর সন্ন্যাসীর সাধন নিজে থেকেই দুই দিকে চলেছে। গৃহীর জীবন দ্বৈতের; স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে, স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে জীবন যাপন কচ্ছেন, একজনের অভাবে অপরের চলে না, একজনের প্রতি অপরের ভালবাসা না থাকলে অধর্ম্ম ও অশান্তি হয়, একজনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা ক'রে অপরের চল্‌বে না, এক জনের জন্য আর একজনের দরদ, আকুলতা ও আকর্ষণ স্বাভাবিক। সুতরাং গৃহীর গৃহে ভগবৎ-সাধনার ভঙ্গীটী দ্বৈতবাদেই প্রভাবিত হবে। নিরাকারের উপাসক হ'য়েও ব্রাহ্ম-সমাজের অধিকাংশ জ্ঞানী এই জন্যই অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হন নি। তাঁরা যদি সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ-ধারণাগ্রস্ত না হ'তেন, কালে ঐ সমাজেও অদ্বৈতবাদ স্থান পেত,—প্রধানভাবে না হোক্, অন্ততঃ অপ্রধান ভাবে। আবার দেখ, অবিবাহিত সন্ন্যাসীর দলে অদ্বৈতবাদের প্রভাব বেশী। কারণ, নিঃসঙ্গ-জীবনযাপনকারীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদ কতটা নিঃসঙ্গ গোছেরই হবে। প্রতিদিনকার জীবনে যিনি নিজেকে ব্যতীত আকর্ষণের অন্য কোনও বস্তুর সংস্পর্শে আসেন না, তাঁর পক্ষে অদ্বৈতবাদী না হওয়াই আশ্চর্য্য। স্ত্রী বা স্বামী, যার মত আকর্ষণের বস্তু পুরুষ বা নারীর কাছে জগতে আর নেই, তা যিনি স্বীকার করেন নি, তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে একমাত্র নিজেকেই ত' পাচ্ছেন, নিজেকে নিয়েই তাঁর ঘরকন্না, নিজের প্রতিই তাঁর প্রেম, নিজেকে নিয়েই তাঁর বোঝা পড়া। তাই, তিনি ব'লে থাকেন,—"কোঽহম্?—সোঽহম্। আমি কে? না আমিই ব্রহ্ম।"

আমি গৃহীদের পক্ষে অদ্বৈতবাদের বিরোধী মোটেই নই। তবে পাত্র বুঝে ব্যবস্থা। খাঁটি দ্বৈতবাদ বা খাঁটি অদ্বৈতবাদ ব'লে কোন জিনিষ বোধ হয় নেই। দ্বৈতবাদে অদ্বৈতভাব আছে, অদ্বৈতবাদে

দ্বৈতভাব আছে। কারো পক্ষে অদ্বৈতভাবের আধিক্য, আর কারো পক্ষে দ্বৈতভাবের আধিক্য স্বাভাবিক। জীবনের কর্ম্মের সাথে সাধন-পন্থাকে মিলিয়ে না নিতে পারলে ত' আর ধর্ম্ম হয় না। তাই, চির-কালই জগতে বিভিন্ন আধারের যোগ্যতা বুঝে দ্বৈত ও অদ্বৈতের বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ হ'তে থাক্‌বে। শুধু অদ্বৈতবাদের উপর ঝোক দেওয়া একটা গোঁড়ামা বিশেষ। কারণ, পাত্রবিশেষে 'আমিই ব্রহ্ম'—এই কথাটা যত elevating, যত ennobling (উন্নতি-বিধায়ক), 'আমি তাঁর দাস'—কথাটাও পাত্র-বিশেষে তার চেয়ে কম elevating বা ennobling নয়। যার যার মনের ও মস্তিষ্কের গঠন বুঝে দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদের প্রাবল্য অপ্রাবল্য ঘ'টে থাকে। জোর ক'রে কখনও কারো মাথায় foreign elements (বিরুদ্ধ ভাব) ঢুকিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। যারা দ্বৈতমত ছাড়া সাধন-ভজন তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তাদের কাছে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা কত্তে গিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে দ্বৈতের অনুকূল ভাবে। দ্বৈতবাদীদের পক্ষেও অদ্বৈতবাদীদের ঘাড়ে চাপবার চেষ্টা সঙ্গত নয়। কেউ কারো ঘাড়ে চেপে কখনও সত্যিকার জয় লাভ কর্ত্তে পারে না। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ না হ'য়ে ব্যাপারটি যখন দাঁড়াবে গিয়ে সাধ্যমত সাধন-ভজনে তখন আর বিরোধের হট্টগোল থাক্‌বে না। ভাগবত-পাঠের নাম সাধন ভজন নয়, ভাগবত পাঠ প্রভৃতি সাধনের নিষ্ঠা-প্রবর্ত্তক মাত্র। বৈদান্তিক তর্কবিচারও সাধন নয়, এই সব তর্কবিচারে সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই জন্যই ভাগবত-পাঠ, এই জন্যই ব্রহ্মবিচার। যখন সাধনের পরিপোষক না হবে, তখন ভাগবত পাঠে ধর্ম্ম হয় না, অধর্ম্ম হয়, তখন বেদান্তের বিচারে বন্ধন-মুক্তি ঘটে না, বন্ধন বাড়ে।

(সমাপ্ত)

শুদ্ধি-পত্র

১২ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১০ম লাইনে "অদ্ভুতত্ব" না হইয়া "অদ্ভূতত্ব" হইবে।

৩১ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১২শ লাইনে "আশান্তির" না হইয়া "অশান্তির" হইবে।

৩২ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১০ম লাইনে "সুক্ষ্ম" না হইয়া "সূক্ষ্ম" হইবে।
৪৮ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৩য় লাইনে "সুসন্তান" না হইয়া "সুসন্তান" হইবে।
৪৯ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৭ম লাইনে "তূলিয়া" না হইয়া "তুলিয়া" হইবে।
৫১ পৃষ্ঠার উপর হইতে ২য় লাইনে "সম্বন্ধীয়" না হইয়া "সম্বন্ধীয়" হইবে।

৬৪ পৃষ্ঠার নীচ হইতে পার্শ্ব টিকায় ২য় লাইনে "সর্ব্ব-সমণ্বয়ী" না হইয়া "সর্ব্ব-সমন্বয়ী" হইবে।

৭৭ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৭ম লাইনে "সমন্বিত" না হইয়া "সমণ্বিত" হইবে।

৭৮ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৭ম লাইনে "দ্রষ্টাব্য" না হইয়া "দ্রষ্টব্য" হইবে।

৮১ পৃষ্ঠার নীচ হইতে পার্শ্বটিকার ৫ম লাইনে "বস্থায়" না হইয়া "বস্তায়" হইবে।

৮৯ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৯ম লাইনে "ঝম্ফ" না হইয়া "ঝম্প" হইবে।
৯১ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৫ম লাইনে "পরিশেযে" না হইয়া "পরিশেষে" হইবে।

৯৩ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১২শ লাইনে "ব্যবস্থান্তর" না হইয়া "ব্যবস্থান্তর" হইবে।

৯৪ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৫ম লাইনে "নিদ্ধিষ্ট" না হইয়া "নির্দ্দিষ্ট" হইবে।

১০৬ পৃষ্ঠার ২য় লাইনে "যোযিতাপস্মার" না হইয়া "যোষিতাপস্মার" হইবে।

১১৩ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৩য় লাইনে "উপর্য্যোগী" [illegible] "উপযোগী" হইবে।
[illegible] হইতে ৩য় লাইনে "আবেগ-দ্বিহ্বল" না হইয়া "আবেগ-বিহ্বল" হইবে।

১১৯ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১০ম লাইনে "শিশুমূর্ত্তি" না হইয়া "শিশুমূর্ত্তি" হইবে।

১১৯ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১১শ লইনে "পুরুষকে" না হইয়া "পুরুষকে" হইবে।

১২১ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৩য় লাইনে "দেহন্তরে না হইয়া "দেহান্তরে" হইবে।

১২৫ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৪র্থ লাইনে "সমুজ্জলা" না হইয়া "সমুজ্জ্বলা" হইবে।

১২৬ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৭ম লাইনে "শুক্র কীটু" না হইয়া 'শুক্রকীট' হইবে।

১৪১ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১২র লাইনে মুলাধার না হইয়া "মূলাধার" হইবে।

১৪১ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ২য় লাইনে "উস্তাসিত" না হইয়া "উদ্ভাসিত" হইবে।

১৪৩ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১৩শ লাইনে "ধাবিভ না হইয়া "ধাবিত" হইবে।

১৪৭ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১ম লাইনে "সমন্বয়ী' না হইয়া "সমন্বয়ী" হইবে।

১৪৮ পৃষ্ঠায় উপর হইতে ২য় লাইনে "উদ্ধে" না হইয়া "উর্দ্ধে" হইবে।

১৫০ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৩য় লাইনে "প্রাণবায়ূর না হইয়া "প্রাণবায়ুর" হইবে।

১৫৯ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১০ম লাইনে "বিশেয" না হইয়া "বিশেষ" হইবে।

১৬৭ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৪র্থ লাইনে "আলম্বায়ন" না হইয়া "আলম্বায়ন" হইবে।

১৮৯ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১৩শ লাইনে "তেমোর" না হইয়া 'তোমার' হইবে।

... লাইনে "মহর্ত্তে" না হইয়া "মুহূর্ত্তে" হইবে।

২০৪ পৃষ্ঠায় নীচ হইতে ৪র্থ লাইনে "অন্বেষণ" না হইয়া "অন্বেষণ" হইবে।

২০৫ পৃষ্ঠার নীচ হইভে ৭ম লাইনে "স্থুল" না হইয়া "স্থূল" হইবে।

২০৭ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৪র্থ লাইনে "অমর্য্যদা" না হইয়া "অমর্য্যাদা" হইবে।

২০৮ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৭ম লাইনে "অদ্ভূত" না হইয়া "অদ্ভুত" হইবে।

২০৮ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৯ম লাইনে "সূক্ষ্মত্বের" না হইয়া "সূক্ষ্মত্বের" হইবে।

২১০ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৯ম লাইনে "সর্ব্বাঙ্গীন" না হইয়া "সর্ব্বাঙ্গীণ" হইবে।

২১৩ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১৩শ লাইনে "মুখ্যতর" না হইয়া "মুখ্যতঃ" হইবে।

২১৩ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৪র্থ লাইনে "প্রংসশিত" না হইয়া "প্রশংসিত" হইবে।

২১৫ পৃষ্ঠায় নীচ হইতে ৪র্থ লাইনে "তৃতীযাশ" না হইয়া "তৃতীয়াংশ" হইবে।

২১৬ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৬ষ্ঠ লাইনে "দ্বিগুণ" না হইয়া "দ্বিগুণ" হইবে।

২১৬ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৭ষ্ঠ লাইনে "অনুমাত্র" না হইয়া "অণুমাত্র" হইবে।

২২১ পৃষ্ঠার নীচে ১ম লাইনে "উপলব্ধ" না হইয়া "উপলব্ধি" হইবে।

২৩৩ পৃষ্ঠায় উপর হইতে ৮ম লাইনে "পয়িচায়ক" না হইয়া "পরিচায়ক" হইবে।

২৩৭ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৩য় লাইনে "Phylosoppy না হইয়া "Philosophy" হইবে।

২৩৮ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১১শ লাইনে "স্ফূরণের" না হইয়া "স্ফুরণের হইবে।

২৩৮ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৮ম লাইনে "অকৌলিন্য" না হইয়া "অকৌলীন্য" হইবে।

২৩৯ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১ম লাইনে "প্রণয়ণ" না হইয়া "প্রণয়ন" হইবে।

২৪৬ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১ম লাইনে "বিযয়ের" না হইয়া "বিষয়ের" হইবে।

২৫৩ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৪র্থ লাইনে "জটাজটধারী" না হইয়া "জটাজুটধারী" হইবে।

২৫৪ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১০ম লাইনে "শাস্ত্রজীবেরা" না হইয়া "শাস্ত্রাজীবেরা" হইবে।

২৫৮ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৫ম লাইনে "শেষেক্তটিকেই" না হইয়া "শেষোক্তটিকেই" হইবে।

২৬২ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৫ম লাইনে "শশ্বতী" না হইয়া "শাশ্বতী" হইবে।

২৬৪ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ২য় লাইনে "রসনাছেদনের" না হইয়া "রসনাচ্ছেদনের" হইবে।

২৬৪ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৯ম লাইনে "অত্যদ্ভূত" না হইয়া "অতাদ্ভুত" হইবে।

২৬৬ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ১ম ও ৩য় লাইনে "সরযুপারী" না হইয়া "সরযূপারী" হইবে।

২৭০ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১ম লাইনে 'স্থ ল' না হইয়া "স্থূল" হইবে।

২৭১ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৮ম লাইনে "স্ফ,রিত" না হইয়া "স্ফুরিত" হইবে।

২৭২ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৫ম লাইনে "সুস্পষ্ট" না হইয়া "সুস্পষ্ট" হইবে।

২৮৮ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৬ষ্ঠ লাইনে "অক্ষুন্ন" না হইয়া "অক্ষুণ্ণ" হইবে।

২৮৮ পৃষ্ঠার উপর হইতে ৯ম লাইনে "যোয়ান" না হইয়া "জোয়ান" হইবে।

২৮৮ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ৮ম লাইনে পার্শ্বটীকায় "মহচিন্তার" না হইয়া "মহচ্চিন্তার" হইবে।

৩০৫ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ২য় লাইনে "পরমকন্মী" না হইয়া "পরমকর্ম্মী" হইবে।

৩১৭ পৃষ্ঠার নীচ হইতে ২য় লাইনে "অনুকুলভাবেই" না হইয়া "অনুলভাবেই" হইবে।

সূচীপত্র